শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

প্রিয়বরেষু

সূচী

দূরের বই

দীর্ঘকাল যুগান্তরে যে-সব বিদেশী বইয়ের আলোচনা করেছি তা থেকে কয়েকটি নির্বাচিত রচনা দুই খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে। বর্তমান গ্রন্থ ওই দুটি খণ্ড থেকে নির্বাচিত রচনা ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কতকগুলি নতুন রচনার সংকলন। এই সব আলোচনা বিভিন্ন সময়ের রচনা; রচনাকালের বৈচিত্র্য রচনারীতিতে অনিবার্যরূপেই ছাপ ফেলেছে। পাঠকের সুবিধার জন্য আলোচিত গ্রন্থগুলির একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা গ্রন্থের শেষে দেওয়া হল।

শ্রীসুনীল দাসের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এ বইয়ের প্রকাশ সম্ভব ছিল না। শ্রীযুক্ত বিপুল গুহ-র প্রচ্ছদ গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। শ্রীঅশোক উপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা লাভ করেছি। এঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আধুনিক রাশিয়ান সাহিত্যের ইতিহাসে নানা কারণে বোরিস পাস্তেরনাকের নাম বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর রচনার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ খুবই কম। অনুবাদ ব্যতীত তিনি বারো-তেরোটি মৌলিক গ্রন্থের লেখক। এদের মধ্যে অধিকাংশই কবিতার বই। তাঁর প্রায় দু'লক্ষ শব্দ সম্বলিত সুদীর্ঘ উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো' প্রকাশিত হবার পর য়ুরোপ আমেরিকায় যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তার তুলনা বিরল। বিরল এইজন্য বলছি যে, এ-বইয়ের মৌলিক গুণাবলী অপেক্ষা সমালোচকদের প্রচার নোবেল কমিটিকে হয়ত বেশি করে প্রভাবান্বিত করেছে, এই অভিযোগ একেবারে অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। যাই হোক, পাস্তেরনাক একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসই লিখেছেন; সুতরাং 'ডক্টর জিভাগো' পড়ে ঔপন্যাসিক হিসাবে আমরা তাঁর পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছি। সুইডিশ আকাদেমি পাস্তেরনাককে পুরস্কার দিতে গিয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করেছেন।

১৮৯০ সালের ১০ই ফেব্রুআরি মস্কো শহরে বোরিস লিওনিদোভিচ্ পাস্তেরনাক (Boris Leonidovich Pasternak) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম লিওনিদ, মার নাম রোজা। বাবা ছিলেন রাশিয়ার সুপরিচিত চিত্রশিল্পী। তলস্তয়ের উপন্যাসের ছবিগুলি প্রায় সবই তাঁর আঁকা। এই ছবিগুলি তাঁর খ্যাতির প্রধান কারণ। পাস্তেরনাকের মা-ও ছিলেন শিল্পী। পিয়ানো-বাদিকা হিসাবে তাঁর বেশ নাম ছিল। শিল্পকলার এই পরিবেশ পাস্তেরনাককে অল্প বয়স থেকেই প্রভাবান্বিত করেছে। কয়েক বৎসর তিনি সঙ্গীত চর্চা করেছিলেন।

স্কুলের পড়া শেষ করে পাস্তেরনাক আইন পড়বার জন্য মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত আইনের কূট তর্ক তাঁর বেশি দিন ভালো লাগল না। তাঁর ভাবুক মন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হল। তিনি আইন পড়া বন্ধ করে জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র পড়তে গেলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জার্মানীতেই ছিলেন পাস্তেরনাক।

পাস্তেরনাকের প্রথম কাব্য-সংগ্রহ A Twin in the Clouds প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। কিন্তু তাঁর রচনা সমাদৃত হয় যুদ্ধের পরে। ১৯২২ সালে প্রকাশিত My Sister, Life কাব্যগ্রন্থটি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রাশিয়ার তরুণ কবিদের অন্যতম হিসাবে তিনি শীঘ্রই স্বীকৃতি লাভ করেন। পাস্তেরনাক নিজের জীবনের কয়েকটি ঘটনার কাব্যরূপ দেন Spektorski (1926) নামক গ্রন্থে। The Year 1905 (1926) ও Lieutenant Schmidt (1927) পাস্তেরনাকের দু'টি মহাকাব্য। Themes and Variations (1923), On Early Trains (1942)

এবং The Terrestrial Expanse (1945) তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত The Second Birth নামক কাব্যসঙ্কলনে ককেশাস অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রাধান্য লাভ করেছে। Above the Barriers প্রথমে বেরিয়েছিল ১৯১৬ সালে। পরে এ-বইয়ের নতুন সংস্করণে ১৯১২ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে।

১৯১২ সালে পাস্তেরনাক কিউবো-ফিউচারিস্ট (Cubo-Futurist) শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে সমালোচকরা তাঁকে ফিউচারিস্ট কবি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পাস্তেরনাককে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত কবি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। একথা অবশ্য সত্য যে, সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ফিউচারিজমের আদর্শ তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সিম্বলিজম, ফিউচারিজম প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার প্রভাব পড়েছে তাঁর রচনায়। গদ্য ও কাব্য—এই উভয় প্রকার রচনাতেই ইম্প্রেসা-নিজমের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি।

সাহিত্যে ফিউচারিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন ইতালিয়ান কবি মারিনেত্তি। ১৯১৪ সালে তিনি রাশিয়া ভ্রমণে আসেন। তিনি প্রচার করেন, যুদ্ধই পৃথিবীর স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। অতীত হল আমাদের সমাধি, তার জন্য মায়া করে লাভ নেই। সামনে এগিয়ে যাবার মধ্যেই সংসারের সকল সৌন্দর্য।

রাশিয়ান ফিউচারিস্ট কবিরা যুদ্ধবিরোধী ছিলেন। ছোটখাটো আরো কতকগুলি বিষয়ে মারিনেত্তির আদর্শের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য ছিল। কৃষক-কবি এসেনিন অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে যন্ত্রপাতিকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। অতীতকে অস্বীকার করবার কথাও তাঁর মনে হয়নি। রাশিয়ান ফিউচারিস্ট-গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নেতা ও কবি ছিলেন মায়াকোভস্কি। তাঁর রচনা সমসাময়িক অনেক কবিকে প্রভাবান্বিত করেছে। পাস্তেরনাক ছিলেন তাঁর বন্ধু। মায়াকোভস্কির আত্মহত্যার বিবরণ দিয়ে পাস্তেরনাকের সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু মায়াকোভস্কির রচনা পাস্তেরনাকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

রচনা ও মননের বিশিষ্টতায় পাস্তেরনাক একক। সমসাময়িক কবিরা যখন রাষ্ট্র-বিপ্লব, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদির উপর কাব্য রচনা করেছেন তখন পাস্তেরনাক মানব-জীবনের বৃহত্তর সমস্যা, হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির বিশ্লেষণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রসোপলব্ধি নিয়ে মগ্ন। নতুন দেশ গড়বার উন্মাদনায় প্রত্যেকটি লোক অবিশ্রাম কাজ করে চলেছে; সাহিত্যেও পড়েছে সেই কর্মোন্মাদনার প্রভাব। এই কর্মব্যস্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পাস্তেরনাক অনেকটা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিপ্লবের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না এমন নয়। ১৯০৫ সালের ঘটনাবলী এবং সেবাস্তোপোল বিদ্রোহের আদর্শবাদী নেতা লেফটেন্যান্ট শিমৃতকে নিয়ে তিনি মহাকাব্য রচনাও করেছেন। আত্মজীবনীমূলক কাব্য 'স্পেকটরস্কি'-তে জারের

বিরুদ্ধাচরণ করে যারা প্রাণ দিয়েছে সেই সব বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন মঙ্গলময় হয়ে উঠবে এমন সুদৃঢ় প্রত্যয় পাস্তেরনাকের রচনায় পাওয়া যায় না। প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার মধ্যে কিছুটা কবিত্ব আছে। বিপ্লব ও বিদ্রোহের এই দিক্‌টাই বিশেষ করে পাস্তেরনাককে আকৃষ্ট করেছে। অন্যান্য লেখকদের মতো তিনি বিপ্লবের পূজারী ছিলেন না; বিপ্লবের স্বর্ণসম্ভাবনা সম্বন্ধেও তাঁর কাব্যে প্রত্যয়শীলতা সুস্পষ্ট নয়। এসেনিনের মতো তিনি বলতে পারেননি যে, রাশিয়ানরা হল fishers of the Universe. বর্তমান ধ্বংসের উপরেই যে ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এমন কথাও জোরের সঙ্গে তিনি বলতে পারেননি।

ভবিষ্যৎ সাফল্যের কথা যেখানে উল্লেখ করেছেন সেখানেও পাস্তেরনাক যুদ্ধ ও বিপ্লবের ধ্বংসলীলার কথা ভুলতে পারেননি। 'ট্র্যাজিক টেল' কবিতায় তিনি বলছেন যে, বিধ্বস্ত রাজধানী একদিন নবরূপ নিয়ে গড়ে উঠবে, অনেক অবিচারের প্রতিকার হবে; কিন্তু যে-সব শিশু অনাথ হয়েছে, যে-সব নারী বিধবা হয়েছে, যারা পঙ্গু হয়েছে, তাদের বেদনা দূর করবার কোনো উপায় নেই। এদের বেদনা বৃহত্তম সাফল্যকেও চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করে রাখবে ঃ

And time will see our hopes fulfilled
the witnesses will die at length,
but the image of the crippled children,
will never lose its awful strength.

পাস্তেরনাক ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবি। জনতার সঙ্গে মিলে যাবার মনোবৃত্তি তাঁর কবিতায় বড় নেই। নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেন। এ-ছাড়া, তাঁর আগ্রহ নেই কর্মস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবার। বরং কর্মের পশ্চাদ্বর্তী তত্ত্ব নিয়ে ভাবতে তাঁর ভালো লাগে; বসে বসে দার্শনিকের ভাবনা। তিনি বলেছেন ঃ "in times of quick tempo 'tis best to think slowly." সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা পাস্তেরনাককে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করতে পারেনি। মানুষের চিরন্তন অনুভূতির মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশি। রাজনীতি সম্পর্কিত যে ক'টি রচনা আছে সে-গুলি পাস্তেরনাকের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে গণ্য করা যায় না।

তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পাস্তেরনাকের কবিতা সর্বত্রগামী হতে পারেনি। সমাজের উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবী পাঠকদের মধ্যেই তাঁর কবিতা সমাদৃত হয়েছে। তাঁর কবিতা দুরূহ ও অস্পষ্ট; বারবার পড়ে রসোপলব্ধি করতে হয়। এ-সব বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো কোনো সমালোচক তাঁর কবিতা এলিয়ট ও রিল্‌কের রচনার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

পাস্তেরনাক শক্তিধর কবি, সন্দেহ নেই। সমসাময়িক রাশিয়ান কাব্যসাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেছেন। ভাব ও আঙ্গিক—এই উভয় দিক থেকেই তাঁর

কবিতা সম্বন্ধ। তিখোনভ, কিরসনভ, আন্তোকোলস্কি, জাবোলোতস্কি প্রভৃতি কবির রচনায় পাস্তেরনাকের প্রভাব পড়েছে।

পাস্তেরনাকের কবিতার যে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হল রূপক ও উপমার চমকপ্রদ নতুনত্ব। স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে তুলে নিয়ে নতুন পরিবেশে বস্তু বা দৃশ্যকে স্থাপন করাতেই তাঁর আনন্দ। এর ফলে পরিচিত জিনিস নতুন অর্থ লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 'হাওয়ার দোলায়' কবিতাটি; অনুবাদ করেছেন সি. এম. বাওরা। এই কবিতাটি থেকে পাস্তেরনাকের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

কবি নিজের হৃদয়কে একটি বাগানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দুঃখময় জীবনের লক্ষ লক্ষ নীল অশ্রুবিন্দু এই বাগানের মাটিকে উর্বর করে তুলেছে। আজ শুরু হয়েছে ঝড়-বৃষ্টি। ভিজে পাখির মতো গাছের শাখায় দুলছে নিঃসঙ্গ একটি ফুল। আমার হৃদয়ের শাখায় তুমি দুলছ অমনি করে। স্মৃতির বোঁটায় তোমাকে ধরে রেখেছি। সংসারের ঝড় এই ক্ষীণ বন্ধনটুকু কি একেবারেই ছিন্ন করে দেবে?

সারারাত তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে জানালায় মৃদু আঘাত করেছ। জীবনে কত বাধা, তাই ঘরে আসতে পারোনি। কিন্তু স্মৃতির সাগর পেরিয়ে কী আশ্চর্য সুগন্ধ ভেসে এসে আমাকে পাগল করেছে আজ। এ কি ফোটা ফুলের সুবাস, না তোমার দেহের সুগন্ধ? রুদ্ধ দ্বার তোমাকে ফিরিয়েছে, কিন্তু স্মৃতির সুবাসকে ঠেকাতে পারল কই?

বিপ্লবের পরিবেশে থেকেও সে সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন পাস্তেরনাক। তিনি বিপ্লবের সমর্থনকারীদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন: "What's the millennium, dear folks, outdoors at the moment?" বিপ্লব কোন স্বর্ণযুগের সূচনা করেছে? এই ঔদাসীন্যের জন্য পাস্তেরনাককে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সোভিয়েত সমালোচকদের মতে তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা উদ্দীপ্ত ভাষায় রূপ দিয়ে জাতীয় কবি হতে পারেননি। কবিতার অঙ্গ প্রসাধনের জন্যই তিনি বিশেষরূপে ব্যস্ত, তার ফলে আবেগ পদে পদে বাধা পেয়েছে। সমালোচকদের অভিযোগ, পাস্তেরনাক হলেন "a decadent formalist and an enemy of the people."

পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র সমালোচনা হতে লাগল যে তিনি আতঙ্কিত হয়ে কয়েক বছরের জন্য মৌলিক রচনা প্রকাশ করা বন্ধ করেছিলেন। এই সময়টা তিনি গ্যেটে, শেকসপীয়ার, বেন জনসন, ভার্লেন, সুইনবার্ন, শেলী প্রভৃতির রচনা অনুবাদ করেছেন।

কয়েকটি জর্জিয়ান কবিতার অনুবাদ স্তালিনের ভালো লেগেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমালোচকদের আক্রমণও শিথিল হয়েছিল। এই ভরসায় পাস্তেরনাক দুটি নতুন কাব্যগ্রন্থ—On Early Trains ও The Terrestrial Expanse

প্রকাশ করেন। কিন্তু শীগ্‌গিরই নতুন করে আক্রমণ শুরু হওয়ায় আবার তাঁকে লেখা বন্ধ করতে হয়।

মস্কোর শহরতলীর একটি নিরিবিলি বাড়িতে বসে এবার পাস্তেরনাক উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

"I always dreamt of a novel in which, as in an explosion, I would erupt with all the wonderful things I saw and understood in this world."

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত লিখে উপন্যাস শেষ করলেন। এটি তাঁর একমাত্র উপন্যাস। এর পূর্বে ১৯২৫ সালে Childhood of Luvers নামে তাঁর একটি গল্প-সংকলন বেরিয়েছিল। এ দু'টি ছাড়া তাঁর আর একটি গদ্য রচনা আছে। সেটি হল Safe Conduct (1931),—যৌবনকাল পর্যন্ত লেখকের আত্মজীবনী।

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি স্টেট পাবলিশিং হাউস প্রথম ছাপবার জন্য গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরে দ্বিতীয়বার পাণ্ডুলিপি বিচার করে জানাল, এ বই প্রকাশ করা হবে না। ইতিমধ্যে পাস্তেরনাক মিলানের এক প্রকাশককে বিদেশী ভাষায় অনুবাদের স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছেন। উপর থেকে পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে আনবার জন্য নির্দেশ এল। পাস্তেরনাক ইতালিতে লিখলেন, কিছু সংশোধন প্রয়োজন; পাণ্ডুলিপি ফিরে চাই। কিন্তু প্রকাশক এ-প্রস্তাবে রাজী হল না। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে ইতালিয়ান অনুবাদ বেরিয়েছে। এর পরে বেরিয়েছে ইংরেজী অনুবাদ 'ডক্টর জিভাগো' নামে। মূল বই প্রকাশিত হবার পূর্বেই নানা ভাষায় অনুবাদ হয়ে, 'ডক্টর জিভাগো' ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

ডক্টর জিভাগোর কাহিনী শুরু হয়েছে ১৯০১ সালে এবং সমাপ্ত হয়েছে ১৯৪৩ সালে। কিন্তু ১৯০৩ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার ইতিহাসের ঘটনাবলী এই উপন্যাসের প্রধান পটভূমিকা। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের আবর্তে পড়ে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল লেখক তার ছবি এঁকেছেন। অবশ্য তিনি সমাজের অন্য স্তরের চরিত্রও এনেছেন। এত বড় পটভূমিকাসমন্বিত উপন্যাসে তারা সহজভাবেই এসেছে।

মস্কো শহরের কোটিপতি ব্যবসায়ী জিভাগো। বহু কলকারখানা ও ব্যবসায়ের মালিক। মদ ও জুয়ার পেছনে টাকা উড়িয়ে দিতে দেরি হল না। কুসঙ্গে পড়ে জীবন অসহ্য হয়ে ওঠায় জিভাগো ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করল।

জিভাগোর ছেলে য়ুরি বাবাকে সামান্যই দেখেছে। কারণ সে মা'র সঙ্গে পৃথক্‌ভাবে থাকত। বাবা যে মা'কে ত্যাগ করেছেন সে-কথা য়ুরির তখন জানা ছিল না। য়ুরির বয়স যখন দশ, তখন তার মা'র মৃত্যু হল। য়ুরি আশ্রয় পেল তার মামা নিকোলের কাছে। নিকোলে তলস্তয়ের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি রাশিয়ার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য চেষ্টা করছেন। তিনি আদর্শবাদী ভাবুক।

এমন এক পথের তিনি সন্ধান করছেন যে-পথ দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে।

য়ুরি যে মামার কাছে থেকে পড়াশুনা করবে এমন সুযোগ নেই। সুতরাং মস্কো শহরে অধ্যাপক গ্রোমেকোর বাড়িতে তাকে রাখা হল। য়ুরি সে বাড়িতে মনের মত একজন সঙ্গী পেল। সে অধ্যাপকের মেয়ে তোনিয়া, তারই সমবয়সী। ১৯১২ সালে তোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে বের হল। সে বছরই য়ুরি পাশ করল চিকিৎসাবিদ্যার স্নাতক পরীক্ষা। পাশ করেই চাকরি পেল হাসপাতালে। তারপর থেকে য়ুরি ডক্টর জিভাগো নামে পরিচিত হল। অধ্যাপকের স্ত্রী আন্না মৃত্যুর সময় তোনিয়া ও জিভাগোর হাত এক করে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, তোমরা বিয়ে কোরো। সেই অনুরোধ ওরা রেখেছে। বেশ সুখেই দিন কাটছিল। ডাঃ জিভাগো থাকে হাসপাতাল নিয়ে; তোনিয়ার সময় তার ছেলেকে নিয়ে কি করে যে কেটে যায় তা সে বুঝতেই পারে না।

শুরু হল যুদ্ধ। এল অশান্তি। জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ, হোয়াইট রাশিয়ানদের সঙ্গে কলহ। সীমান্তবর্তী হাসপাতালে আহতের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। দূরের এক হাসপাতালে ডাক পড়ল জিভাগোর। জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হওয়ায় জিভাগোর মস্কো প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হতে লাগল।

মফঃস্বলের হাসপাতালে জিভাগো নতুন করে পরিচিত হবার সুযোগ পেল মস্কোর মেয়ে লারার সঙ্গে। স্কুলে পড়বার সময় তাকে একবার অদ্ভুত পরিবেশে অকস্মাৎ দেখতে পেয়েছিল। লারা কিন্তু তাকে দেখতে পায়নি। ধূর্ত আইনজীবী কোমারোস্কোভ তাদের পরিবারের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিশোরী লারার উপর যে কুৎসিত প্রভাব বিস্তার করেছিল তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। অথচ কোমারোস্কোভ ছিল লারার পিতৃবন্ধু। কোমারোস্কোভ ও লারাকে এক ইঙ্গিতময় পরিবেশে সেই যে ছেলেবেলায় দেখতে পেয়েছিল জিভাগো এখনো তা ভুলতে পারেনি।

লারা বড় হয়ে নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে কোমারোস্কোভকে দূরে সরিয়ে দিল; লেখাপড়া শিখে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিল। তার মতো দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এর পর লারা বিয়ে করল পাশাকে। পাশাও স্কুলের শিক্ষক। একটি মেয়ে হয়েছে তাদের। বেশ সুখের জীবন। কিন্তু হঠাৎ লারাকে কিছু না জানিয়ে পাশা স্বেচ্ছায় সেনাদলে নাম লেখাল। অনেক দিন খবর না পেয়ে লারা উদ্বিগ্ন। লোকের মুখে শুনল, তার স্বামী আর বেঁচে নেই। কিন্তু সেনাদপ্তরে লিখে জবাব পায় না। সঠিক সংবাদ জানবার উদ্দেশ্যে লারা হাসপাতালে নার্স হয়ে এসেছে। হয়ত বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এক দিন পাশার দেখা পাবে অথবা তার সংবাদ পাবে।

সুন্দরী, স্থিতধী, ধীমতী লারাকে দেখে জিভাগো মুগ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্রও আছে। জিভাগো শুনেছে এই কোমারোস্কোভ তার বাবারও উকীল ছিল। বাবাকে সে অসৎ পথে ভুলিয়ে নিয়ে বহু অর্থ আত্মসাৎ করেছে। বাবাকে

আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে কোমারোভস্কি। লারা ও জিভাগোর জীবনের দুঃখের মূল এক। সুতরাং লারার জন্য সে গভীর মমতা বোধ করে।

তখন বিপ্লব চলছে। তবু জিভাগো মস্কো ফেরার সুযোগ পেল। তিন বৎসর পরে ট্রেনে বাড়ি ফিরছে। দু'দিকের দৃশ্যে যুদ্ধ ও বিপ্লবের চিহ্ন সুস্পষ্ট। মস্কো শহরের অবস্থাও ভালো নয়। বন্দুকের লড়াই চলছে বিভিন্ন দলের মধ্যে। খাদ্যের ও জ্বালানির একান্ত অভাব। বন্ধুবান্ধব এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোথায় হারিয়ে গেছে। অক্টোবরের শেষে কাগজে খবর বের হল, রাশিয়ায় সোভিয়েত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জিভাগো নতুন সরকারের কর্মচারী হিসাবে হাসপাতালে কাজ করতে লাগল। শহরে টাইফাস জ্বরের মহামারী লেগেছে। জিভাগোর মুহূর্তের অবসর নেই। কিন্তু কাজ করবার ক্ষমতাই বা কোথায়? পেট ভরে খেতে পায় না। আর আছে সর্বদার সঙ্গী দুশ্চিন্তা। নতুন গভর্নমেণ্ট কখন যে কাকে গ্রেপ্তার করবে, হত্যা করবে—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। জিভাগোর ভবিষ্যৎও আশঙ্কাজনক। স্ত্রী ও শ্বশুরের একান্ত অনুরোধে কিছুকালের জন্য সে লোকচক্ষুর অন্তরালে দূর পল্লীগ্রামে বাস করতে সম্মত হল।

আবার রেল গাড়ি। মস্কো স্টেশনের বর্ণনা পড়ে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত শেয়ালদা স্টেশনের কথা মনে পড়ে। দু'বার এই দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণের জন্য জিভাগোর চোখ দিয়ে আমরা সমসাময়িক রাশিয়ার ছবি দেখতে পাই।

উরাল অঞ্চলের এক অখ্যাত গ্রামে এসে জিভাগো সপরিবারে নতুন জীবন শুরু করল। রবিনসন ক্রুসোর মতো সব কিছুই তাকে নিজের হাতে করতে হয়েছে। একটা নতুন জগৎ সৃষ্টির আনন্দে জিভাগো মশগুল হয়ে ছিল। একদিন মহকুমা শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে সে বন্দী হল একদল বিদ্রোহী কসাকের হাতে। তাদের দলের চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে; জিভাগো সেই পদ পূরণ করবে। তোনিয়া বা অন্য কেউ তা জানতে পারল না। বন্দী অবস্থায় তাকে যেতে হল সাইবেরিয়ায়।

দু'বছর পরে ভিক্ষুকের মতো চেহারা ও পোশাকে ডক্টর জিভাগো উরালের মহকুমা শহরে ফিরে এল। পালিয়ে এসেছে পায়ে হেঁটে। লারা কাজ করে সেই শহরে। তার বাড়িতেই এসে উঠল জিভাগো। এ-অঞ্চল থেকে তোনিয়ারা চলে গেছে। কয়েকদিন পরে পাঁচ মাস ঘোরাঘুরি করে তোনিয়ার চিঠি এসে পেঁছিল। লিখেছে, নতুন সোভিয়েত সরকার মামা নিকোলে এবং কয়েকজন পরিচিত অধ্যাপককে নির্বাসিত করেছে। তোনিয়া তার ছেলেকে নিয়ে প্যারিস চলে যাচ্ছে, বোধ হয় সরকারের নির্দেশে। আর কখনো তাদের দেখা হবে না।

লারা বলল, শুধু ওদের কথা ভেব না। তোমার মাথার উপরও খড়্গ ঝুলছে। তুমি কোটিপতির ছেলে; তোমার স্ত্রী বড় জমিদারের মেয়ে; তুমি কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছ—তোমার বিরুদ্ধে এগুলি অকাট্য অভিযোগ। শহর ছেড়ে কোথাও আত্মগোপন করে থাক।

লারা সঙ্গে যাবে এই শর্তে রাজী হল জিভাগো। লারা স্পষ্ট করেই জানিয়েছিল স্বামীর মতো ভালোবাসতে অন্য কোনো পুরুষকেই সে পারবে না। পাশা যদি ফিরে আসে তাহলে তার সঙ্গেই সে চলে যাবে। তথাপি যতটুকু পেল ততটুকুতেই জিভাগোর জীবন পূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু এ-পূর্ণতা বেশিদিন রইল না। কোমারোস্কোভ ধূমকেতুর মতো এসে উপস্থিত হল তাদের জীবনে। বলল; তোমাদের দু'জনের জীবনই বিপন্ন। একমাত্র আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি, এখনই চলো আমার সঙ্গে।

কোমারোস্কোভের ক্ষমতা আছে। সে এখন পার্টির পদস্থ পরামর্শদাতা। লারা যেতে রাজী আছে যদি জিভাগো যায়। কিন্তু জিভাগো যাবে না। তখন কোমারোস্কোভ জিভাগোকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, কাল লারার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এর পরই ওর পালা। ওকে রক্ষা করা কি তোমার কর্তব্য নয়?

ফন্দী আঁটল জিভাগো। লারাকে বলল, তুমি যাও কোমারোস্কোভের গাড়িতে। আমি ঘোড়া নিয়ে আসছি পেছনে।

এ-প্রস্তাবে খুশি হল লারা। মসৃণ বরফের উপর দাগ কেটে কেটে গাড়ি চলে গেল। লারা গেল অদৃশ্য হয়ে। জিভাগো স্থাণুর মতো বসে রইল। দূরে মাঞ্চুরিয়াগামী গাড়ির এক প্রকোষ্ঠে লারা ও কোমারোস্কোভ। গাড়ি যাত্রা করেছে, নামবার উপায় নেই।

রাত্রিতে এক অতিথি এল। লারার স্বামী। জিভাগোর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত তার কথা হল। সকালবেলা জিভাগো বাড়ির বাইরে পাশার মৃতদেহ আবিষ্কার করল। শাদা বরফের উপর খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

কয়েক বছর পরে মস্কোর রাজপথে হৃদরোগে জিভাগোর মৃত্যু হল। সেদিন লারা মাঞ্চুরিয়া থেকে মস্কো এসেছে। জিভাগোর কাগজপত্র থেকে জানতে পারল পাশা তার খোঁজ করতে এসেছিল। এর পর লারার আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

'ডক্টর জিভাগো'র কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধ নয়। অকারণে নানা ঘটনা ও চরিত্র যোগ করা হয়েছে। এর ফলে মূল কাহিনীর প্রতি পাঠকের আকর্ষণ হ্রাস পায়। উপন্যাসে প্রায় ষাটটি চরিত্র আছে। প্রথম শ' দুই পৃষ্ঠায় নতুন নতুন পাত্র-পাত্রী এসে আবার হারিয়ে যায়। এদের কখনো ডাক নাম কখনো পোশাকী নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার ফলে পাঠকের পক্ষে গল্পের ধারা অনুসরণ করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। কাহিনীর বিন্যাসে এই শিথিলতার কারণ হয়ত এই যে, এটি জীবনীমূলক উপন্যাস। শুধু জীবনীমূলক নয়, লেখকের আত্মজীবনীমূলক কাহিনী। পাস্তেরনাকের বয়স যখন দশ; জিভাগোর বয়সও তখন দশ। এ-ছাড়া আরো অনেক মিল রয়েছে লেখক ও তাঁর নায়কের সঙ্গে।

এতবড় উপন্যাসে এবং এতগুলি চরিত্রের মধ্যে মাত্র জিভাগো ও লারার চরিত্রই মনের উপর ছাপ ফেলতে পারে, অন্য চরিত্রগুলি হারিয়ে যায়। অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীই

স্থির চরিত্র। চরিত্রগুলি মনের উপর যে দাগ ফেলতে পারে না তার প্রধান কারণ এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও লেখক মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে তাদের অন্তর উদ্‌ঘাটিত করবার চেষ্টা করেননি। একমাত্র লারা কোমারোস্কোভের হাতে ক্রীড়নক হবার পর যে মানসিক্ যাতনা অনুভব করেছে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। লারার স্বামী যুদ্ধে চলে গেল। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, লারা স্বামীকে স্ত্রীর মতো ভালো না বেসে মা'র মতো ভালোবাসত বলে অতৃপ্ত হয়ে সে চলে গিয়েছিল। শুধু একটি উক্তি দিয়ে এতবড় একটি কথা পাঠককে জানানো হয়েছে; বিশ্লেষণ করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। লেখক অনেক জায়গায় এমনি সব সুযোগ হারিয়েছেন।

প্রেম যেখানে স্বাভাবিক সেখানেও লেখক প্রেমের ছবি দেননি। তোনিয়া ও জিভাগো একই বাড়িতে মানুষ হল। তথাপি পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ইঙ্গিত নেই। শুধু আন্নার শেষ অনুরোধ রক্ষার জন্যই যেন তারা বিয়ে করেছে। লারা ও পাশার জীবনেও প্রেম নেপথ্যে রয়ে গেছে। উপন্যাসের শেষভাগে জিভাগো ও লারার প্রেমই এই কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ এবং লেখক হিসাবে পাস্তেরনাক এখানেই সাফল্য লাভ করেছেন।

যেখানে পাত্র-পাত্রীদের আশা করা যায় না সেখানে হঠাৎ সবাই মিলিত হয়ে নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে কয়েকবার। এই অতি-নাটকীয়তা এযুগে অচল এবং লেখকের দুর্বলতার পরিচায়ক।

জিভাগো অবসর সময়ে লিখত। তার কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়ে সমাদৃত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে জিভাগোর চব্বিশটি কবিতা পাওয়া যাবে।

'ডক্টর জিভাগো' মহৎ সাহিত্যকর্ম কিনা সে বিষয়ে রসবেত্তা পাঠকের মনে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ আছে। সমালোচনার গতি থেকে মনে হয় বইটি উপন্যাস হলেও তার সাহিত্যমূল্য গৌণ করে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'ডক্টর জিভাগো' যুদ্ধ ও বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত কাহিনী। কাহিনীর অন্তর্গত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উক্তিকে জিভাগোর সমর্থকরা সোভিয়েত বিপ্লবের বিরুদ্ধে উপস্থিত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল:

"It is always a sign of mediocrity in people when they herd together, whether their group loyalty is to Soloyev or to Kant or Marx."

* * * *

"I don't know any teaching more self-centred and further from facts than Marxism."

* * * *

"Revolutionaries who take the law into their own hands are horrifying not as criminals, but as machines that have got out of control, like a run-away train."

উপন্যাসের কোথাও লেখক বিপ্লবের নৃশংস মর্মস্পর্শী ছবি দেননি। এমন ছবি কত বই থেকে পাওয়া যায়। বিপ্লবীদের যে সমালোচনা তিনি করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠোর সমালোচনা সোভিয়েত সরকারের করেছেন দুদিনস্তেভ তাঁর 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন' উপন্যাসে। ডক্টর জিভাগোর কাহিনী শুরু হয়েছে ১৯০১ সালে। বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ছিল জারের শাসন। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটল। জারের আমলে কি সবই ভালো ছিল? সে-আমল সম্বন্ধে পাস্তেরনাক জোরের সংগে কোনো সমালোচনাত্মক মন্তব্য করেননি।

রাশিয়ার বিপ্লবই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের জীবনে দুঃখ এনেছে এমন কথাও বলা যায় না। জিভাগোর বাবা আত্মহত্যা করেছেন; তার মা যক্ষ্মায় মারা গেছেন; কোমারোস্কোভ লারা ও তার মার জীবনে সর্বনাশ এনেছে। এ-সবই বিপ্লবের পূর্বে ঘটেছে এবং বিপ্লবের সমাপ্তি পর্যন্ত তার জের চলেছে। কাহিনীর শেষ শ' তিনেক শব্দে সুস্পষ্টরূপে লেখক আশার কথা শুনিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মনে হচ্ছে রাশিয়ার দুঃখ এতদিনে ঘুচল; মনে হচ্ছে, "freedom of the spirit was there, that...the future had almost become tangible."

তাহলে সোভিয়েত-বিপ্লব রাশিয়ার জীবনকে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করেছে এ অভিযোগ টেঁকে না। পাস্তেরনাকের সমাপ্তি থেকে এই ইংগিতই পাওয়া যায় যে, বিপ্লব অগ্রগতির পথে একটি অত্যাবশ্যক ঐতিহাসিক ধাপ।

অবশ্য জিভাগো তথা পাস্তেরনাক যে বিপ্লবের প্রতি প্রসন্ন নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিশৃংখলতা ও অনিশ্চয়তা কে-ই বা পছন্দ করে? অথচ রাষ্ট্রে ও সমাজে যখন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তখন কোন্ পথ দিয়ে সেই পরিবর্তন আসবে? জিভাগো বলছে ঃ

"I used to be very revolutionary-minded, but now I think that nothing can be gained by violence. People must be drawn to good by goodness."

অহিংসার পথে যদি মঙ্গল আসে, তবে তার চেয়ে বরণীয় উপায় আর কী আছে? কিন্তু অহিংসার অর্থ যে নিষ্ক্রিয়তা নয় এ-কথা পাস্তেরনাক বা জিভাগো কেউ উপলব্ধি করেছেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। উপন্যাসের কোনো পাত্র-পাত্রীকেই রক্তক্ষয়ী বিধ্বংসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেখি না। লারা, জিভাগো ও অন্য সকলে বিপ্লবীদের হয়ে কাজ করেছে। শুধু দু'বার জিভাগো সাইবেরিয়া থেকে পালাবার জন্য মৃদু চেষ্টা করেছিল। বিপ্লবের তাণ্ডব একটু শান্ত হবার পর জিভাগো মস্কো এসে তোনিয়াকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সামান্য একটু উদ্যোগ করেছে। উপন্যাসকার বলেছেন, সে উদ্যোগ ছিল প্রাণহীন। অন্যায়ভাবে নির্বাসিত স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সংগ্রামী মনোবৃত্তির পরিচয় জিভাগোর মধ্যে পাওয়া যায় না। লারা শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্না মহিলা। তথাপি সে কোমারোস্কোভের ফাঁদে পা দিল। ট্রেন থেকে

ঝাঁপিয়ে পড়ল না; যৌবনে একবার কোমারোস্কোভকে যেমন গুলি করে মারতে গিয়েছিল, তা-ও করল না ; এমন কি আত্মহত্যা করে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টাও করল না। বৃদ্ধ লম্পটের হাতে ছেড়ে দিল নিজেকে। এমনি করে দেখা যাবে প্রত্যয়শীল প্রতিবাদের শক্তিতে কোনো চরিত্রই ভাস্বর হয়ে ওঠেনি। নৈতিক শক্তির দীপ্তি নেই কাহিনীতে।

লারা, জিভাগো ও অন্য সকলে বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ শুধু মুখে, কাজে নয়। নিষ্ক্রিয়তা তাদের মজ্জাগত। কথায় বা লেখায় মন্তব্য প্রকাশ করেই তারা দায়িত্ব শেষ করে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক অনুভব করতে পারে না বলেই কোনো কিছুর মধ্যেই সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রেরণা এরা পায় না। এই বুদ্ধিজীবীরা যেন বহিরাগত, জীবনের ঘনিষ্ঠতম বৃত্তের বাইরে এদের স্থান। এই বহিরাগত মনোবৃত্তি জিভাগো ও লারার মধ্যে সুস্পষ্ট।

পাস্তেরনাকের মধ্যেও এই আউটসাইডার বা বহিরাগতের মনোবৃত্তি লক্ষণীয়। তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিকতা এই মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। অল্পবয়সে পাস্তেরনাক পা ভেঙেছিলেন। এজন্য যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবার জন্য তাঁকে নির্বাচিত করা হয়নি। তিনি উরাল অঞ্চলের এক ফ্যাক্টরিতে প্রথম কাজ করেছেন ; তারপর করেছেন শিক্ষা দপ্তরের গ্রন্থাগারে। যুদ্ধ ও বিপ্লবের আবর্তে পড়ে তাদের স্বরূপ উপলব্ধি করবার সুযোগ তাঁর হয়নি।

জিভাগোরও হয়নি। তাকেও যুদ্ধক্ষেত্রে কাজের অনুপযুক্ত ঘোষণা করে বাইরে অন্য কাজে রাখা হয়েছে।

'ডক্টর জিভাগো'-র একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ হল মানুষ ও প্রকৃতির জন্য দরদ। পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সমালোচকদের প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি 'আইভরি টাওয়ারের কবি'। এই উপন্যাস সেই অভিযোগ খণ্ডন করবে। উপন্যাসে যে-সব মানবিক অনুভূতির কথা ছড়িয়ে আছে তা পরিশিষ্টে সংযোজিত চব্বিশটি কবিতার মধ্যে আরো সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। 'ডে-ব্রেক' কবিতায় জিভাগো এই বিশ্ব-সংসারের প্রতি গভীর প্রীতি প্রকাশ করছে ঃ

I feel for each of them
As if I were in their skin,
I melt with the melting snow,
I frown with the morning.
In me are people without names,
Children, stay-at-homes, trees,
I am conquered by them all
And this is my only victory.

নায়কের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা দিয়ে বিচার করলে টমাস মানের সাহিত্যে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রথম যুগের নায়ককে দেখতে পাই জার্মান সংস্কৃতির মানসপুত্ররূপে। জার্মানীর বাইরে বৃহত্তর পৃথিবী সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন; দেশের ঐতিহ্যের সংকীর্ণ আদর্শে নায়ক বন্দী। দ্বিতীয় স্তরে মানের নায়ক জার্মানীর গণ্ডি পার হয়ে য়ুরোপের নাগরিক হতে পেরেছে। য়ুরোপকে বাদ দিয়ে জার্মানীর বাঁচা সম্ভব নয়—এই উপলব্ধি থেকে প্রথম স্তরের পটভূমিকা প্রসারিত করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে দেখতে পাই মান য়ুরোপের বাইরে এসেছেন। জোসেফের কাহিনী বলবার জন্য মিশর ও ওল্ড টেস্টামেণ্টের দেশ আনতে হয়েছে তাঁকে। অবশ্য এই অঞ্চলটা য়ুরোপের নিকটতম। বাইবেলের দেশের সঙ্গে য়ুরোপের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। ধর্ম সেই যোগসূত্র।

জার্মান সংস্কৃতির প্রতি মানের আসক্তি এত গভীর যে অন্য দেশের সংস্কৃতি তাঁকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাঁর মতো দর্শনপ্রিয় লেখক যে ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেননি সেটা একটু আশ্চর্যের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় বিদ্যার চর্চা জার্মানীতে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। মানের সমসাময়িক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক হেরমান হেসের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব গভীর। অন্যান্য লেখকদের মধ্যেও ভারতের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মানের যে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল তেমন প্রমাণ তাঁর রচনা থেকে পাওয়া যায় না।

নাৎসীবাদ প্রবল হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে মান জার্মানী ত্যাগ করে সুইজারল্যাণ্ড আসেন। সেখানে কয়েক বছর থাকবার পর তিনি ১৯৩৮ সালে চলে যান আমেরিকা। প্রিন্সটন শহরে তিনি বসবাস শুরু করেন। এখানে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় হাইনরিক ৎসিমেরের সঙ্গে। ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে ৎসিমেরের ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। ভারতীয় দর্শন ও চিত্রকলার উপর তাঁর দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে। ৎসিমেরও রাজনৈতিক কারণে য়ুরোপ ত্যাগ করে আমেরিকা এসেছিলেন। এঁর কাছ থেকে মানের ভারতীয় সাহিত্যের অনেক গল্প শুনবার সুযোগ হয়েছে। এমনি একটি গল্প অবলম্বন করে ১৯৪০ সালে মান Die Vertauschten Kopfe নামে একটি ছোট উপন্যাস রচনা করেন। পর বৎসর The Transposed Heads : a legend of India—নাম দিয়ে আমেরিকায় এর অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। হাইনরিক ৎসিমেরকে মান বইটি উৎসর্গ করেছেন।

চল্লিশ বছর পূর্বে ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে মান যে-বই রচনা করেছেন সে-বই এদেশে দীর্ঘকাল অপরিচিত ছিল। প্রকাশন-সংক্রান্ত কতকগুলি বিধিনিষেধের ফলে অনুবাদের আমেরিকার সংস্করণটি ভারতে আসা বারণ। ব্রিটিশ সংস্করণ প্রকাশিত

হয়নি বলে ভারতে এ-বইটির প্রচার হয়নি। একটি সামান্য গল্প প্রতিভার স্পর্শে কেমন অসামান্য হয়ে উঠেছে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ-বইটি।

বহুদিন পূর্বে কোশল রাজ্যের অন্তর্গত গোমঙ্গল গ্রামে শ্রীদমন ও নন্দ নামে দুই বন্ধু বাস করত। শ্রীদমনের বয়স একুশ, আর নন্দর আঠারো। শুধু বয়সে নয়, চেহারায় ও প্রকৃতিতেও দু'জনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। শ্রীদমন জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু পূজা ও শাস্ত্রপাঠ নিয়ে ব্রাহ্মণের জীবন যাপন করে না। জীবিকানির্বাহের জন্য সে বাণিজ্য করে। তথাপি ব্যবসা আরম্ভ করবার পূর্বে শ্রীদমন যথারীতি বিদ্যাচর্চা করেছে। পড়েছে ছন্দ, ব্যাকরণ, বেদ ও উপনিষদ। উপযুক্ত শিক্ষালাভের ফলে তার কথায় ও ব্যবহারে রুচি ও সংস্কৃতির পরিচয় সুস্পষ্ট। শ্রীদমনের দেহ কিন্তু তার মন ও বুদ্ধির মতো বিকাশ লাভ করেনি। গায়ের রঙ ফর্সা, টিকলো নাক, সুন্দর মুখশ্রী; কিন্তু দেহের মাংসপেশী শিথিল, এর মধ্যেই চর্বি জমতে শুরু করেছে।

নন্দ আবার অন্য রকম। সে লেখাপড়া শেখেনি; গরু চরায়, আর করে লোহার কামারের কাজ। তার গায়ের রঙ কালো, ঠোঁট পুরু, নাক চ্যাপ্টা; কিন্তু মাংসপেশী সুদৃঢ় এবং দেহের সর্বত্র শক্তির ব্যঞ্জনা। নন্দর রুচি মার্জিত নয়; সে জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। যা প্রত্যক্ষ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শুধু তার প্রতিই নন্দর আকর্ষণ।

এত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। একজন আর একজনের পরিপূরক। শ্রীদমন জীবনের সূক্ষ্ম দিকের প্রতিনিধি, নন্দ প্রতিনিধি স্থূল দিক্‌টার। দু'জনের মিলন এক অখণ্ড পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করে। তাই বিরুদ্ধ প্রকৃতির হলেও তারা অভিন্নহৃদয়। শ্রীদমন ও নন্দকে আলাদা করে দেখা যায় না। এতদ্‌ বৈ তদ্‌।

বসন্ত কাল। আকাশ মেঘমুক্ত; গাছপালার নতুন রূপ চোখ জুড়িয়ে দেয়; হরেক রকম পাখির ডাকে মন উন্মনা হয়ে ওঠে। দুই বন্ধু ভ্রমণে বেরিয়েছে; শুধু বেড়ানো নয়, ব্যবসা-সংক্রান্ত কিছু কাজও করতে হবে। ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে পৌঁছল গঙ্গার তীরবর্তী এক জনহীন মন্দিরে। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছে দু'জনে, হঠাৎ নন্দ শ্রীদমনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটি অপূর্ব সুন্দরী নিরাবরণা তরুণী গঙ্গার জলে স্নান করতে নামছে। শ্রীদমন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান। সুতরাং সে নন্দকে বলল, এভাবে লুকিয়ে দেখা অনুচিত। নন্দর কিন্তু কোনো দ্বিধার বালাই নেই। একটু পরে ভালো করে দেখে নন্দ বলল, এই মেয়েটিকে আমি চিনি, ওর নাম সীতা। সেবার ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম। সীতা গ্রামের সেরা সুন্দরী, আমি সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক। তাই, সূর্যপূজা উপলক্ষে জনতার সম্মুখে সীতাকে আমি সূর্যের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছি, আবার লুফে নিয়েছি এই দুই হাত দিয়ে।

রুচিতে বাধলেও শ্রীদমন চোখ ফেরাতে পারছিল না। যাকে দেবীর মতো দুর্লভ মনে হয় নন্দ তাকে স্পর্শ করেছে জেনে একটু ঈর্ষান্বিত হল সে।

তারপর দুই বন্ধু দু' দিকে চলে গেল নিজের নিজের কাজের সন্ধানে। যাবার আগে স্থির করে গেল কবে কোথায় তাদের আবার দেখা হবে। নির্দিষ্ট দিনে নন্দ এসে অপেক্ষা করতে লাগল; অনেক পরে শ্রীদমন যখন এসে উপস্থিত হল, তাকে দেখে নন্দ চমকে উঠল।

এ কী চেহারা হয়েছে? প্রশ্ন করেও উত্তর পায় না। শ্রীদমন শুধু 'হাঁ', 'না' বলে উত্তর দেবার দায় সারে।

একদিন পথ চলবার পর শ্রীদমন বলল, নন্দ, তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। বন্ধুর কর্তব্য করবার সময় এসেছে। আমাকে চিতা সাজিয়ে দাও। আমার আর বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

অনেক প্রশ্ন করে করে নন্দ জানতে পারল শ্রীদমন সীতাকে একবার দেখেই ভালোবেসেছে। সঙ্গিনী হিসাবে তাকে পাবার কোনো আশা নেই, হতাশ প্রেমের জ্বালায় চিরজীবন তাকে জ্বলতে হবে। তার চেয়ে কিছুক্ষণের আগুনের জ্বালা ভালো। নন্দ প্রাণ খুলে হেসে উঠল। প্রেমের মধ্যে যে সুগভীর বেদনা থাকতে পারে এটা তার ধারণাতীত। এত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান তার বন্ধু; অথচ একটি মেয়ে তাকে পাগল করে তুলেছে, এ কী আশ্চর্য? বেশ তো, ভালোবেসেছ, তাকে জয় করো, নিজের ঘরে নিয়ে এস। মরবে কেন? লেখাপড়া জানা লোকের প্রেম মনের কোন্ জটিল পথে চলে নন্দ তা জানে না। তার সহজ পথে সে চলে। সে বন্ধুকে আশ্বাস দিল, তোমাকে মরতে হবে না, সীতার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

নন্দ গেল সীতাদের বাড়ি। শ্রীদমনের বাবাকেও নিয়ে গেল। বন্ধুর অনেক গুণকীর্তন করে বিয়ে ঠিক করল। বিয়ের উৎসবে সে ভৃত্যের মতো সারাদিন খেটেছে; রাত্রিতে বাসরঘর থেকে সকলের শেষে বেরিয়ে এল নন্দ। নন্দ রয়েছে সর্বত্র; হাসিমুখে ছুটে ছুটে কাজ করছে। বন্ধুর বিয়েতে সে সুখী।

দেখতে দেখতে ছ'মাস পার হয়ে গেল। বিয়ের পরে সীতা মা-বাবাকে দেখতে যায়নি। শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্মতি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে চলল বাবার বাড়ি। নন্দও তাদের সঙ্গী। গাড়ি চালাবে সে। গোরুর গাড়ি। নন্দ গাড়ির সামনে বসে লাগামের দড়ি ধরে আছে। তার পেছনে সীতা আর শ্রীদমন। সীতা নববধূসুলভ সঙ্কোচে কোলের উপর চোখ নিবদ্ধ করে বসে আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে সে চোখ তুলে নন্দর দিকে তাকায়, আবার তৎক্ষণাৎ ত্রস্ত হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। নন্দর তৈল-চিক্কণ উন্মুক্ত পিঠের পেশীগুলি গাড়ি ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে নেচে ওঠে; যৌবনশক্তির সেই নৃত্য মুগ্ধ করেছে সীতাকে। শ্রীদমন সবই লক্ষ্য করে, বুঝতে পারে সীতার মনের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কিছুই বলে না। নন্দর স্ত্রী হলে সে হয়ত সীতাকে দু'ঘা বসিয়ে দিত। শ্রীদমন শিক্ষিত ও রুচিবান, তার বেদনা বাইরে প্রকাশ পায় না, অন্তরের কোন অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে চলে।

দিনের বেলা প্রখর রোদ, অসহ্য গরম। গাড়ি থামিয়ে গাছের ছায়ায় ওরা বিশ্রাম

করে। সারা রাত গাড়ি চলে, সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। এক অন্ধকার রাত্রিতে গাড়ি বিপথে চলে গেল। নন্দ পথ ভুল করে ফেলেছে। সকাল বেলা গাড়ি এসে প্রবেশ করল এক বনের মধ্যে। সেই নির্জন বনে কালীর মন্দির দেখতে পেয়ে শ্রীদমন বলল, তোমরা গাড়িতে অপেক্ষা করো, আমি দেবীকে প্রণাম করে আসছি।

অতি প্রত্যূষে প্রায়ান্ধকার মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রীদমনের কি এক ভাবান্তর উপস্থিত হল। বলিপ্রদত্ত ছাগল ও মহিষের মাথা বেদীর উপরে সাজানো রয়েছে। মন্দিরের মেঝের উপর রক্তের ধারা শুকিয়ে আছে। রক্তকলঙ্কিত তীক্ষ্ণধার খড়্গটা পড়ে আছে দেবীর পায়ের সামনে। যিনি জীবন ও মৃত্যুর উৎস, সেই দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীদমন অভিভূত হয়ে পড়ল। বলির সারি সারি সাজানো ছিন্নমুণ্ডগুলি থেকে কাচের মতো চোখগুলি তাকে সম্মোহিত করে যেন তাদের জগতে যাবার জন্য আহ্বান করছে। সীতাকে কেন্দ্র করে তার মনে যে গোপন বেদনা জমে উঠছিল, এই পরিবেশে দাঁড়িয়ে তা তীব্র হয়ে উঠল। বেঁচে থেকে কি লাভ? জীবনের প্রধান আকর্ষণ যে প্রেম, তা যে কত চপল সে প্রমাণ তো নিজের জীবনেই পেয়েছে। খড়্গটা তুলে নিয়ে এক কোপে সে নিজের মাথা কেটে দেবীকে আত্মদান করল।

অনেকক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করে নন্দ মন্দিরে এল বন্ধুর সন্ধানে। শ্রীদমনকে সে প্রকৃতই ভালোবাসত। তার অবস্থা দেখে নন্দ শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল। তার মনে জাগল আর এক চিন্তা। সীতাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলে লোকে বলবে সুন্দরী বন্ধুপত্নীর লোভে সে-ই শ্রীদমনকে হত্যা করেছে। এই অপবাদ থেকে মুক্তি পাবার মতো কোনো প্রমাণ নেই। মিথ্যা অপবাদ সহ্য করে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শ্রীদমনের মৃতদেহের পাশে নন্দর ছিন্নমুণ্ডও গড়িয়ে পড়ল।

ধৈর্য হারিয়ে সীতা নেমে এল গাড়ি থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দিরের অভ্যন্তরে বীভৎস দৃশ্যের সামনে সে এসে দাঁড়াল। কি ঘটেছে তা ভালো করে উপলব্ধি করবার পূর্বেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল সীতা। যখন জ্ঞান ফিরে পেল তখন ভাবতে বসল নিজের অবস্থা। খড়্গটা নন্দর হাতে। তাহলে তো শ্রীদমনকে সে-ই হত্যা করেছে। বোধ হয় দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো কারণে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। এই বিরোধের কারণ কি সে? বিদ্যুৎরেখার মতো এই সন্দেহ তার মনে ভেসে উঠল। এ-ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে? ধিক্কারে তার মন পূর্ণ হয়ে গেল। বিধবার দুর্বিষহ জীবনের আতঙ্কও ভীত করেছে তাকে। মুহূর্তের মধ্যে সীতা স্থির করল সে-ও মন্দিরে আত্মদান করে সকল জ্বালা জুড়াবে।

খড়্গটা বেশ ভারী। সেটা তুলে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছিল একটা বড় ডুমুর গাছ। মোটা মোটা লতা ঝুলে পড়েছে গাছ থেকে। তারই একটায় ফাঁস লাগিয়ে সীতা গলায় পরতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় দৈববাণী শোনা গেল। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডেকে বললেন, বোকা মেয়ে, তোর গর্ভে সন্তান এসেছে, আর তুই আত্মহত্যা করবি?

দেবীর কণ্ঠে একটু সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে সীতার হৃদয় আর বাঁধ মানল না। নিভৃত মনের গোপন দ্বন্দ্বের জ্বালা প্রকাশ করে বলল দেবীকে। সীতা সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে। নন্দর মতো একজন সাধারণ যুবককে স্বামী হিসাবে পাবে, এই ছিল তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন। সীতার জীবনে নন্দই এসেছিল প্রথম অনাত্মীয় পুরুষ। নন্দ তাকে লোহার মতো কঠিন দুই বাহু দিয়ে সূর্য লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছে, আবার লুফে নিয়েছে। সেই প্রথম পুরুষ-স্পর্শের শিহরণ এখনো বেঁচে আছে তার অবচেতন মনে। কি রকম লোক এই নন্দ? সে নিজে উদ্যোগী হয়ে সীতাকে তুলে দিল বন্ধুর হাতে! শ্রীদমন বিদ্বান্ ও সুপুরুষ, তার চরিত্র মধুর। কিন্তু কিশোরী সীতা স্বামীর যে স্বপ্ন দেখেছে তার সঙ্গে শ্রীদমনের মিল নেই, মিল আছে নন্দর সঙ্গে। নন্দ সর্বদা কাছে কাছে থাকে। না হলে তাকে হয়ত ভুলে যাওয়া সম্ভব হত। শ্রীদমন তার দেহকে জাগিয়ে তোলে, জানে না শান্ত করে ঘুম পাড়াতে। কেবল মনে হয়, হয়ত নন্দ পারে। স্বামীর বুকে থেকেও ভাবতে থাকে অমন প্রশস্ত বক্ষ ও দৃঢ় বাহুর অধিকারী নন্দ কিভাবে প্রেম নিবেদন করত? যাকে স্বপ্ন দেখেছে, জীবনে পায়নি, তার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিলিয়ে ছবি দেখতে ভালো লাগে সীতার। নন্দ যে তার মনোভাব বুঝতে পারে না, তা নয়। কিন্তু বন্ধুকে সে ঠকাবে না, তাই ব্যবধান রেখে চলে। যাকে পেয়েছে তাকে নিয়ে তৃপ্তি নেই। যাকে পায়নি, যে কাছে থেকেও অনন্ত দূরে আছে, তার জন্য উদগ্র কামনা নিরন্তর সীতাকে ক্ষতবিক্ষত করছে।

দেবী সব শুনে বললেন, এ-সব তো ভালো নয়। আমার বরে শ্রীদমন ও নন্দ বেঁচে উঠবে। তুমি ওদের ছিন্নমুণ্ড ধড়ের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে দুর্গা নাম জপ করলে ওরা প্রাণ ফিরে পাবে। অন্যায় চিন্তা ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে সুখে ঘর করো।

সীতা ছুটে মন্দিরে প্রবেশ করল। তার আর তর সয় না। দেবীর নির্দেশ মতো মাথা জুড়ে দিয়ে দুর্গা নাম জপ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দু'জন হাই তুলে উঠে দাঁড়াল; যেন এই মাত্র ঘুম ভেঙেছে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত আনন্দের আবেগে সীতা অন্ধ হয়ে ছিল। তারপরে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কী সর্বনাশ করেছে সে! তাড়াতাড়িতে নন্দর মাথা লাগিয়েছে শ্রীদমনের ধড়ে, আর শ্রীদমনের মাথা নন্দর ধড়ে। এরা একেবারে নতুন মানুষ, পূর্বের নন্দ ও শ্রীদমনের সঙ্গে মিল নেই। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সীতাকে নিয়ে। তার স্বামী কে? শ্রীদমনের মাথা ও নন্দর দেহ যার সে, না নন্দর মাথা ও শ্রীদমনের দেহ যার সে সীতার স্বামী? ভূতপূর্ব নন্দ কখনো সীতার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করেনি। এখন দু'জনেই সীতাকে পাবার জন্য ব্যগ্র। নন্দর মাথা শ্রীদমনের দেহে যুক্ত হয়েছে। এই দেহের সঙ্গে সীতার অন্তরঙ্গ যোগাযোগ; তাই হয়ত নতুন নন্দ সীতার উপর দাবি ত্যাগ করতে নারাজ।

দণ্ডকারণ্যে এক বিজ্ঞ মুনি আছেন। ঠিক হল, সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করবে। তিনি যে বিধান দেবেন তা সবাই মেনে নেবে বিনা প্রতিবাদে।

তিন দিন ক্রমাগত পথ চলে ওরা তিনজন এসে পৌঁছল কামদমন ঋষির আশ্রমে। তিনি সব শুনে বললেন, বিয়েতে দেহই প্রধান, সুতরাং স্বামীর দেহ যে পেয়েছে সীতা তারই স্ত্রী।

শ্রীদমনের দেহ ও নন্দর মাথা যে পেয়েছে সে কামদমনের কথা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। মুনি থামিয়ে বললেন, আরে বাপু, একটু থামো। শাস্ত্রে বলে, দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ মাথা। সুতরাং স্বামীর মাথা যে পেয়েছে তার সঙ্গেই সীতা ঘর করবে।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কামদমনের বিধান মেনে নিল শ্রীদমন, নন্দ ও সীতা। শ্রীদমনের মাথা ও নন্দর দেহ যে পেয়েছে সীতা তার সঙ্গে সানন্দে চলে গেল। শ্রীদমনের দেহ ও নন্দর মাথা নিয়ে যে নতুন নন্দ বেঁচে উঠেছে সে আর বাড়ি ফিরল না। গভীর দুঃখে সে বনবাসী হল।

স্বর্গসুখ আর কাকে বলে? কিছুদিন আনন্দের সুরায় মত্ত হয়ে রইল সীতা। নন্দ আর শ্রীদমনকে সে পেয়েছে এক স্বামীর মধ্যে। জীবনের সূক্ষ্ম ও স্থূল অংশের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের সুষ্ঠু মিলনের এমন দৃষ্টান্ত কেউ দেখেনি। আদর্শ পুরুষকে স্বামী হিসাবে পেয়েছে সীতা।

সুখ যত গভীর তার পরমায়ু তত ক্ষীণ। সীতারও এত বড় সৌভাগ্য বেশী দিন রইল না। দেহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মাথা। শ্রীদমনের মাথার প্রভাবে নন্দর দেহ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে লাগল। শ্রীদমন দেহ চালনা করে না, সরষের তেল মাখে না সুতরাং তার মাংসপেশী কোমল হচ্ছে দিনে দিনে; সীতা উপলব্ধি করে স্বামীর আলিঙ্গন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। সেই উদ্দাম আকর্ষণ আর নেই।

সীতার এর মধ্যে একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে সীতার মনে পড়ে যায় সেই দেহের কথা যে দেহ এই সন্তানের জন্ম দিয়েছে। নন্দর মাথার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখন সেই দেহের কেমন রূপান্তর ঘটেছে কে জানে! নন্দ সরষের তেল মেখে এবং নানাভাবে পরিচর্যা করে শ্রীদমনের কোমল দেহটাকে ভূতপূর্ব নন্দের দেহের মতো লোভনীয় করে তুলেছে। সেই দেহের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধ। সীতার প্রতি দেহকোষ সারাক্ষণ শ্রীদমনের ভূতপূর্ব দেহের জন্য প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে।

একদিন স্বামীর সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সীতা বেরিয়ে পড়ল দণ্ডকারণ্যের পথে। শ্রীদমন বাড়ি ফিরে বুঝতে পারল স্ত্রী কোথায় গেছে। সীতার মনের দ্বন্দ্বের কথা তার অজানা ছিল না।

তখনো সূর্যোদয় হয়নি; গাছের নীচে অন্ধকার রয়েছে তখনো। শ্রীদমন এসে বসল নন্দর কুটীরের সামনে। সীতা এসেছে একদিন আগে। রাতটা সে নন্দর সঙ্গেই কাটিয়েছে এ-কথা জেনেও শ্রীদমন ক্রুদ্ধ হল না, কারণ যে দেহের আকর্ষণে সীতা সবকিছু ত্যাগ করে চলে এসেছে, সে দেহ তো প্রকৃতপক্ষে তারই। শ্রীদমনেরও মমতা আছে তার প্রতি।

সূর্য উঠেছে। সীতা ও নন্দ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। শ্রীদমন এগিয়ে এল। বলল, নন্দ, আমি একটুও রাগ করিনি তোমাদের উপরে। যদি জানতাম তোমার সঙ্গে থাকলে সীতা সুখী হবে, তার অতৃপ্তি ঘুচবে, তাহলে আমি বাড়ি ফিরে যেতাম নিশ্চিন্ত মনে। কিন্তু সীতা তৃপ্তি লাভ করবে না। যখন আমার কাছে থাকবে তখন তোমার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলবে আর তোমার কাছে থেকে আমার জন্য কাঁদবে। এর জন্য সীতার দোষ নেই। কারণ আমাদের কারো মধ্যেই সে শ্রীদমন বা নন্দকে সম্পূর্ণরূপে পায় না। মাথা বদলের ফলে আমরা দু'জনেই নন্দ ও শ্রীদমনের মিশ্রণ। তাই সীতার আমাদের একজনকে পেয়ে তৃপ্তি নেই। এই সমস্যা সমাধানের একটি মাত্র উপায় আছে।

—কি ?

—মৃত্যু। আমাদের তিন জনের মৃত্যু।

নন্দ ও সীতা ভেবে দেখল। সত্যি, দ্বন্দ্ব নিরসনের এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। নেই তাদের সভ্য সমাজে। আদিম সমাজে একাধিক স্বামী গ্রহণ করে এই সমস্যা সমাধান করা চলত নারীর পক্ষে। এখন আর তা সম্ভব নয়।

এই টানাপোড়েন থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ যে মৃত্যু তা সীতা এবং নন্দও স্বীকার করল। দুই বন্ধু মৃত্যুবরণ করল পরস্পরের বুকে যুগপৎ তরবারির আঘাত করে। সীতার চোখ দিয়ে জল পড়ল না। বড় করে চিতা সাজানো হল। এক পাশে নন্দ আর এক পাশে শ্রীদমন। মাঝখানে বসল সীতা। চিতা জ্বলে উঠল।

মান তাঁর কাহিনীর পরিচয় দিয়ে শুধু বলেছেন, "a legend of India". কোন উপকথার উপর ভিত্তি করে তিনি গল্প রচনা করেছেন সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই। এটি যে বেতাল পঞ্চবিংশতির একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত তা নিশ্চিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনূদিত বেতাল পঞ্চবিংশতির ষষ্ঠ উপাখ্যানে এই কাহিনীর মূল কাঠামোটি পাওয়া যাবে। বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্পে দীনদাস, তার পরমা সুন্দরী স্ত্রী এবং দীনদাসের বন্ধুর কাহিনী পাই। বন্ধুর উদ্যোগে দীনদাস সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছে। তিনজন বেড়াতে বেরিয়ে কাত্যায়নীর মন্দিরে দুই বন্ধু একে একে প্রাণ দিল। দেবীর বর পেয়ে দীনদাসের স্ত্রী আনন্দের আতিশয্যে স্বামীর মাথা বন্ধুর ধড়ে এবং বন্ধুর মাথা স্বামীর ধড়ে লাগিয়ে বাঁচিয়ে তুলল ওদের দু'জনকে। মাথা দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ এই যুক্তিতে স্বামীর মাথা ও বন্ধুর দেহ নিয়ে যে বেঁচে উঠেছে, স্ত্রী তাকেই দ্বিধাহীন চিত্তে স্বামী বলে গ্রহণ করল। জম্ভল দত্তের সংস্করণে এই গল্পটির একটু রূপভেদ আছে। জম্ভল দত্তের বেতাল পঞ্চবিংশতির ইংরেজী অনুবাদ আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি প্রকাশ করেছেন। মান এই সংস্করণের সাহায্য গ্রহণ করেননি। তিনি শিবদাসের বেতাল পঞ্চবিংশতির জার্মান অনুবাদ থেকে গল্পটি পেয়েছেন।

মান তাঁর কাহিনীটি সম্বন্ধে বলেছেন যে এটি হল একটি "metaphysical jest." আপাত দার্শনিক পরিহাসের অন্তরালে জীবন সম্বন্ধে একটি গভীর তত্ত্ব মান পাঠকের

নিকট উপস্থিত করেছেন। কিন্তু এই তত্ত্বের সংগে ভারতীয় দর্শনের কোনো যোগ নেই; মান তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার সাহায্যে কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিয়েছেন। গল্পের কাঠামোটি ছাড়া আর কিছুই ভারতীয় নয়।

প্রথম থেকেই মান ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। নন্দ ও শ্রীদমনের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্যের জন্য সীতার মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তার বিশ্লেষণ করে পাঠকের মন তৈরি করে নিয়েছেন লেখক। ছিন্নমুণ্ড অদল-বদল করবার জন্য সীতার ব্যস্ততা বা আনন্দকে মান দায়ী করেননি। সীতার অবচেতন মনে নন্দর জন্য যে-অভিলাষ গোপন ছিল সেই অভিলাষের প্রেরণায় অর্ধ-চেতন অবস্থায় সে স্বামীর মাথা নন্দর দেহে লাগিয়েছিল। নন্দ দেহে সরষের তেল মালিশ করত। তাই প্রথম পুরুষ স্পর্শের সংগে সীতার কাছে সরষের তেলের গন্ধটা অবিচ্ছেদ্য হয়ে রইল। শ্রীদমন সরষের তেল মাখে না, কিন্তু সর্বদা চোখের সামনে দেখত নন্দর উন্মুক্ত দেহ সরষের তেলে সিক্ত হয়ে চকচক করছে। সরষের তেলের গন্ধও কখনো কখনো নাকে আসত। এই কারণে নন্দর প্রতি সীতার আকর্ষণ এত গভীর হতে পেরেছিল। মানের বিশ্লেষণ ফ্রয়েডীয় ব্যাকরণসম্মত।

শ্রীদমন ও নন্দ জীবনের দুটি অংশের প্রতিভূ। শ্রীদমনের মধ্যে পাই সূক্ষ্ম অংশ আর নন্দর মধ্যে স্থূল অংশ। একজন আত্মা, আর একজন দেহ। মানের সাহিত্যে জীবনের এই দুটি বিভাগের দ্বন্দ্ব সর্বত্রই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেই সমস্যা এখানেও উপস্থিত। মানের শিল্পী, লেখক, বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান চরিত্রগুলি স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করতে অক্ষম। সেই অক্ষমতার প্রধান কারণ তাদের শারীরিক দুর্বলতা। অথচ স্বাভাবিক জীবনের জন্য এদের মধ্যে ব্যাকুলতার অন্ত নেই। দেবী যখন জানলেন নন্দর প্রতি সীতা আকৃষ্ট তখন তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, নন্দর মতো একজন সাধারণ যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণ কি? তার মতো অসংখ্য লোক আছে সংসারে। কিন্তু শ্রীদমনের মতো লোক বিরল।

সীতা ও শ্রীদমনের মিলন যে সার্থক হয়নি তা দেখাবার জন্য মান সীতার ছেলেকে গল্পের মধ্যে এনেছেন। মানের তত্ত্বকে সুপরিস্ফুট করতে সাহায্য করা ছাড়া ছেলের কাহিনীর মধ্যে কোন স্থান নেই। সীতার ছেলে পড়াশুনায় ভালো, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো নয়, চোখে ভালো দেখতে পায় না। অপূর্ণ মিলনের প্রতীক তাদের সন্তান। যে-মিলনে দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় সেই মিলনই আদর্শ মিলন। কিন্তু তেমন আদর্শ মিলন সংসারে দুর্লভ। যে মিলনে দেহের প্রাধান্য সেখানে আত্মার জন্য ব্যাকুলতা জাগে; আর যে মিলনে দেহকে গৌণ করা হয় সেখানে অতি সাধারণ স্থূল উপভোগের জন্য মন লালায়িত হয়ে ওঠে। কোনো এক দিক থেকে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটলেই অতৃপ্তি দেখা দেয়। আদিম সমাজে একাধিক নারী কিংবা একাধিক পুরুষের সাহচর্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হত; তাই তখন জীবনে আজকের মতো এত অতৃপ্তি ছিল না। সমাধানের এই উপায় বর্তমান সমাজে চলে না। সীতার সমাজেও

তা অচল ছিল। তাই সে আদর্শ মিলনের উপায় হিসাবে শ্রীদমনের মাথা (শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আত্মার প্রতীক) এবং নন্দর দেহ মিলিত করে মনের মতো স্বামী পেতে চেয়েছিল। দু'জনের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা একত্রিত করলে পরিপূর্ণ মিলন হবে, এই ছিল তার আশা। কিন্তু সীতার পদ্ধতি এতই অস্বাভাবিক যে মিলনের সামঞ্জস্য এবং তৃপ্তি দু'দিনেই শেষ হয়ে গেল। মান মৃত্যু-বিলাসী ; তাই সীতার অতৃপ্তির সমাপ্তি দেখাতে চেয়েছেন মৃত্যুর মধ্যে। যে অতৃপ্তি সর্বজনীন তা নিরসনের অন্য কোন পথ নেই বলেই মান মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

মান এই কাহিনী রচনায় গল্পকার হিসাবে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পাঠকের কৌতূহলকে শেষ পর্যন্ত জাগ্রত রাখবার মতো এমন গল্প তিনি আর লেখেননি। সীতার সমস্যা সর্বকালের নর-নারীর সমস্যা। সুতরাং মানের অন্যান্য রচনার তুলনায় সাধারণ পাঠকের নিকট আলোচ্য কাহিনীর আবেদন অনেক গভীর ও ব্যাপক।

কালো হাঁস

টমাস মানের বড় উপন্যাসের চেয়ে ছোট উপন্যাস বা বড় গল্পই আমার পছন্দ। তাঁর নবতম গ্রন্থ 'দি ব্ল্যাক সোয়ান' এই ধারণাকে দৃঢ় করবার সুযোগ দিয়েছে। বিস্মিতও করেছে। মানের আশি বৎসর বয়সে রচিত একশ আটাশ পৃষ্ঠার এই কাহিনীর মধ্যে কোথাও বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। বরং তাঁর পূর্বের অনেক রচনা অপেক্ষা এর আবেদন গভীরতর। তাছাড়া মানের কতকগুলি স্বাভাবিক মুদ্রাদোষ থেকে মুক্ত হওয়ায় গল্পটি সাবলীল ও সুখপাঠ্য হয়েছে। 'ব্ল্যাক সোয়ানের' পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাস 'ডক্টর ফস্টাস' ও 'হোলি সিনার' আকারে অনেক বড়। জার্মান দর্শন ও পুরাণের উপর তাদের ভিত্তি। 'ডক্টর ফস্টাসে'র সিফিলিস রোগগ্রস্ত নায়ক এবং 'হোলি সিনারে'র ঈডিপাস-জাতীয় অবৈধ প্রেম উপন্যাসের কাহিনীর পক্ষে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হলেও 'ব্ল্যাক সোয়ানে'র গল্পের মতো তা অন্তরঙ্গ ও মর্মস্পর্শী হতে পারে না। বাইবেল, পুরাণ ও দর্শনলোক থেকে মান নেমে এসেছেন ঘরোয়া অন্তরঙ্গ পরিবেশে। বেঁচে থেকেও একটি নারীর ফুরিয়ে যাবার বেদনা, তার দুরাকাঙ্ক্ষা এবং মর্মান্তিক পরিণতি 'ব্ল্যাক সোয়ান'-এর পাঠকদের মনে সহজেই সাড়া জাগাতে পারবে।

একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে নিয়ে রোজালি বিধবা হয়েছে। তার বয়স হলো প্রায় পঞ্চাশ। মেয়ের বয়স তিরিশের কাছাকাছি। ছেলে মেয়ের চেয়ে বারো বছরের ছোট। জার্মানীর একটি ছোট শহরে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেশ শান্তিতেই দিন কাটছে রোজালির। মেয়ের এখনো বিয়ে হয়নি। হবে এমন সম্ভাবনাও নেই। প্রথম যৌবনে একটি তরুণকে দেখে অ্যানা ভুলেছিল। কিন্তু তার মন পায়নি, পেয়েছে বেদনা। তারপর থেকে অ্যানা মন গুটিয়ে নিয়েছে, প্রেমের স্বপ্ন সে-মনকে আর স্পর্শ করতে পারে না। জন্ম থেকেই অ্যানার একটি পা একটু বিকৃত, চলে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। সংসারের উপর অভিমান করে সে দূরে সরে গেল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ অনুভূতির মোহ অপেক্ষা স্পর্শাতীত সৌন্দর্যের সাধনা তার ভালো লাগে। অ্যানা ছবি আঁকে। তার ছবিতে হৃদয়াবেগের ছোঁয়া নেই। সে কিউবিস্ট। রোজালি অনেক সময় মেয়ের ছবির মধ্যে জ্যামিতির রেখা ছাড়া কিছু দেখতে পায় না।

পঞ্চাশ বছর বয়সেও রোজালির জীবনের উপর গভীর আসক্তি। মাথার চুল তামাটে হয়ে উঠলেও দেহের বাঁধুনি এখনও অটুট আছে। এখনো তুচ্ছ আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠবার ক্ষমতা আছে তার। জীবনকে উপভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি। তাই জীবনের সবকিছু সম্বন্ধে কৌতূহলের শেষ নেই। কিন্তু যত গভীর-ভাবেই রোজালি জীবনকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করুক, প্রকৃতির নিয়মকে তো অস্বীকার করা চলে না। রোজালি অত্যন্ত বেদনার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করছে, সে ফুরিয়ে যাচ্ছে। প্রাণের অঙ্কুর লালন করে পৃথিবীকে নতুন নাগরিক উপহার দেওয়া নারীজীবনের

প্রধান ধর্ম। কিছুদিনের মধ্যেই রোজালি নারীদেহের এই বিশেষ লক্ষণটি হারাবে। এখনই দেহে কিছু কিছু পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। তার পরও বেঁচে থেকে লাভ কি? তখন তো সে নারীত্বের মর্যাদা পাবে না; নারীর খোলস হবে। ধান থেকে চাল চলে যাবে, পড়ে থাকবে শুধু তুষ। রোজালির মন আশায়, আনন্দে, স্বপ্নে মশগুল; কিন্তু দেহ শুকিয়ে যাচ্ছে। মুমূর্ষু দেহ আশ্রয় করে এমন সজীব মন থাকবে কি করে? তাই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এই দ্বন্দ্ব কিছুদিন ধরে বিপর্যস্ত করে তুলেছে রোজালির জীবন। মন যতদিন বেঁচে আছে দেহকেও ততদিন সে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সে ফুরিয়ে যাবে না, ইন্দ্রিয়শিখা নিভে যেতে দেবে না।

অ্যানা স্বেচ্ছায় দেহকে অস্বীকার করতে শিখেছে। মা ও মেয়ের মন বিপরীতধর্মী, তবু দু-জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। রোজালি অ্যানাকে খুলে বলেছে তার দ্বন্দ্বের কথা। অ্যানা তাকে বোঝাতে চেয়েছে: দেহের সঙ্গে-সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন ঘটে। তা না হলে শরীর ও মনের দ্বন্দ্ব সারাক্ষণ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ ছাড়া স্বাভাবিকভাবে সন্তানধারণের ক্ষমতা লোপ পাওয়ায় দুঃখ করবার কিছু নেই। মাতৃত্বের গৌরব থেকে তো সে বঞ্চিত হবেনা! কিন্তু রোজালি এতে সান্ত্বনা পায় না। নারী সৃষ্টি করে বলেই তো মা হতে পারে। সৃষ্টির ক্ষমতাটাই বড় কথা। সেটা হারালে আর কী বাকি থাকে?

রোজালির মনে যখন এই দ্বন্দ্ব চলছে তখন তাদের পরিবারে এসে উপস্থিত হলো চব্বিশ বছরের আমেরিকান তরুণ কেন্ কীটন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উপলক্ষ্যে সে য়ুরোপে এসেছিল। দেশে ফিরে যায়নি। রোজালিদের শহরে বাড়িতে বাড়িতে ইংরেজী শেখায় এখন। এডওয়ার্ড মাকে ধরল সে-ও ইংরেজী শিখবে। এখানকার পড়া শেষ করে ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকা পড়তে যাবার ইচ্ছা তার। ইংরেজী কিছু জানা থাকলে সুবিধা হবে। রোজালি সম্মত হলো। কেন্ কীটন সপ্তাহে তিন দিন পড়াতে আসে এডওয়ার্ডকে। রোজালি মাঝে-মাঝে গিয়ে বসে পড়ানো শুনতে; কেন্-এর সঙ্গে ধীরে-ধীরে আলাপ জমে যায়। বিদ্যা-বুদ্ধিতে কেন্ সাধারণ। তার সহজ ব্যবহার বেশ ভালো লাগে। আদব-কায়দার সচেতনতায় সে কখনও আড়ষ্ট নয়। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের সঙ্গে সে অন্তরঙ্গ হতে পারে। কেন্-এর সুগঠিত দেহে প্রাণের বন্যা যেন বাঁধা পড়ে আছে। জীবনবিলাসী রোজালিকে তার এই বৈশিষ্ট্য প্রথমেই আকৃষ্ট করল। রোজালি শুনেছে শহরের মেয়ে মহলে কেন্-এর প্রতিষ্ঠা বেড়ে চলেছে। কেন্ মেয়েদের সম্বন্ধে একটুও উদাসীন নয়। বরং কোনো-কোনো মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে অনেক মুখরোচক কাহিনী রোজালির কানে এসেছে।

নিজের দিকে চেয়ে-চেয়ে রোজালি ভাবে, না, তার দেহ এখনো বাতিল হয়ে যায়নি। এখনো আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আছে। যে-সব মেয়েরা কেন্-কে ভুলিয়েছে তাদের তুলনায় সে উপেক্ষার পাত্রী নয়। একটা গোপন, কুটিল আশা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়! কেন্-এর প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকে ডিনারের! ডিনার শেষ হয়, গল্প শেষ হয় না। কেন্-

এর সামনে এলে আজকাল রোজালির ভাবান্তর ঘটে। কথাবার্তায় চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পায়, মুখে রক্তের আভা ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে নাকের ডগা টুকটুকে হয়ে ওঠে। অ্যানার চোখ থেকে এ-সব কিছুই এড়ায় না। মা-র জীবনে ঋতুপরিবর্তনের বেদনা যে দ্বন্দ্ব এনেছে তাকে সে সহানুভূতির চোখে দেখে।

সেদিন খেতে বসে এডওয়ার্ড গরম লাগছে বলে কোট খুলে রাখল। কেনও অনুসরণ করল ছাত্রের দৃষ্টান্ত। কেন্-এর দুটি সুডৌল নগ্ন বাহুর দৃশ্য রোজালির রক্ত উত্তাল করে তুলল। অ্যানা লক্ষ্য করছে তার মা বার-বার চুরি করে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাচ্ছে কেন্-এর নগ্ন বাহু দুটির দিকে। একটা অস্থির দৃষ্টি রোজালির চোখে ; ঐ দুটি হাত যেন তাকে পিষে মারছে। রোজালি যেন আর সইতে পারছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে, কি করে বসবে হঠাৎ, ঠিক নেই। অ্যানা মাকে বাঁচাল। ভাইকে লক্ষ্য করে বলল, 'ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে ; তোমরা কোট পরো না !'

রোজালি বুঝতে পারল অ্যানার কাছে কিছু গোপন নেই। খাবার টেবিল থেকে বিদায় নিয়ে সে ছুটে গেল নিজের ঘরে। মুখ গুঁজল বালিশে। কী লজ্জা! আর কী আনন্দ! ভালোবাসার আনন্দ। আজ এই প্রথম নিজের কাছেই স্বীকার করল সে কেন্-কে ভালোবেসেছে। সকল অন্তর দিয়ে কেন্-কে যেমন ভাবে কামনা করেছে এমন আর কাউকে কখনো করেনি। অ্যানার বাবা তাকে চেয়েছিল, সে সম্মতি দিয়েছে। সক্রিয় কামনার রূপ এর আগে দেখেনি। বিবাহিত জীবনে স্বামীর কামনার বন্যায় বাঁধনছেঁড়া নৌকোর মতো তার দেহ ভাসিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে, সেটাই প্রেম। কিন্তু জীবনের প্রান্তসীমায় এসে একটি পুরুষকে দাবি করবার দুঃসাহস এলো কোথা থেকে? রোজালি ভাবে, এটা প্রকৃতির আহ্বান। নীতির দোহাই দিয়ে এই আহ্বানকে সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। কুমারীর হৃদয়ের মতো তার হৃদয় নতুন করে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এত বড় একটা কথা কাউকে বলা যায় না। ছেলে-মেয়েকে নয়, কেন্-কেও নয়। কে জানে, কেন্ হয়তো হঠাৎ চমকে পালিয়ে যাবে। কত তরুণী তার জন্য সাধনা করছে।

অ্যানা কিছু বলে না। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে মা-র রূপান্তর লক্ষ্য করছে। এডওয়ার্ডও কিছুটা বুঝতে পারে। একদিন মাকে এসে বলল, 'এবার মাস্টার তুলে দাও ; ইংরেজী আর পড়ব না।'

রোজালি প্রতিবাদ করে, 'না, তা-ও কি হয়! কেন্ যখন ঘরের লোক হয়ে গেছে তাকে আসতে নিষেধ করা যায় না। আর সে না এলে তোমাদেরও খারাপ লাগবে।'

শুধু বাড়িতে নয়, অন্য বাড়ির পার্টিতেও কেন্-এর সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়। পার্টিতে রোজালিকে দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে যায়। কী আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে তার! ঠিক বিশ বছরের যুবতীর মতো দেখায় তাকে। কেন্-ও আকৃষ্ট হয়েছে। ওর আকার ইঙ্গিত থেকে রোজালি বুঝতে পারে। প্রেম যে কায়কল্প রসায়নের কাজ করেছে তার জীবনে সে-কথা কাউকে বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছে

রোজালি। শেষ পর্যন্ত অ্যানাকে বলতে হলো। না বলে পারল না। অ্যানা তো শুধু তার মেয়ে নয়, বন্ধুও।

অ্যানা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে শুনল মা-র কথা। বলল, 'মা, হৃদয়ের যে আকাঙ্ক্ষা বিচার ও যুক্তির সমর্থন লাভ করে তাকেই বলি সত্য। তোমার এ প্রেম তো সত্য নয়, এটা শুধুই মোহ। কেন্-কে তুমি ছেলের মতো ভালোবাস, তোমার মোহ দূর হবে; তুমি বাঁচবে।'

রোজালি তা পারবে না। অ্যানা অনেক জানে; কিন্তু জানে না যে যুক্তি ও বিচারের বন্ধনে প্রেমকে বন্দী করা যায় না। অ্যানার জীবনে একবারের জন্য যখন প্রেম এসেছিল তখন সে-ও তো যুক্তিকে ভাসিয়ে দিয়েছিল! প্রকৃতি তাকে ডাক দিয়েছে। এ-আহ্বান অগ্রাহ্য করা অসাধ্য তার পক্ষে। কেন্‌কে সে ছাড়তে পারবে না।

একদিন সকালে মা-র ঘরে ডাক পড়ল অ্যানার। রোজালি তাঁকে বিস্ময়কর সংবাদ দিল। এতদিন পরে প্রকৃতি আবার ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে নারীত্বের মর্যাদা; সহজ স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার সন্তানধারণের ক্ষমতার চিহ্ন। প্রেম সঞ্জীবিত করেছে দেহকে। প্রেমের পরিপূর্ণ সার্থকতার পথে আর বাধা নেই। কেন্‌কে বিয়ে করবে? কিংবা মিলন হবে বিয়ের গণ্ডির বাইরে? কিন্তু গোপন থাকবে না। এডওয়ার্ডকে কেউ যদি এ নিয়ে ঠাট্টা করে তাহলে সে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচলিত নীতিবোধের মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে তার সমাধানের পথ খুঁজে পায় না রোজালি।

কিছুদিন পরেই রোজালির মধ্যে আর একবার পরিবর্তন দেখা দিল। চোখ-মুখ থেকে তারুণ্যের দীপ্তি ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শরীরের এখানে-ওখানে মাঝে-মাঝে ব্যথা দেখা দেয়। রোজালি কোনো অসুখ হয়েছে বলে স্বীকার করে না। বিশেষ করে কেন্-এর কাছ থেকে বার্ধক্যের পুনরাগমন সযত্নে গোপন করে চলে।

এক রবিবার রোজালি, অ্যানা, এডওয়ার্ড ও কেন্ বেড়াতে গেছে একটা পুরনো দুর্গে। আরো অনেক দর্শক এসেছে। গাইড সব দেখাচ্ছে। এখানে সকলকে এড়িয়ে রোজালি কেন্-কে প্রেম নিবেদনের সুযোগ পেল। আজ রাত্রিতেই সে তার কাছে যাবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন্-এর নিকট থেকে মুক্তি পেল রোজালি। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারল না। অ্যানা সে-রাত্রিতে রোজালিকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেল। বিছানা রক্তে লাল হয়ে গেছে। তক্ষুণি হাসপাতালে পাঠানো হলো। অস্ত্র করতেও বিলম্ব হলো না। ডাক্তার বলল, গর্ভাশয়ের ক্যান্সার। পেটের অন্যান্য অংশেও ক্ষত ছড়িয়ে পড়েছে। রোজালিকে বাঁচানো গেল না।

ক্যানসারের ক্ষত থেকে নির্গত রক্তধারাকে রোজালি নারীত্বের পুনরুজ্জীবন মনে করে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। জীবনদেবতার এই মর্মান্তিক পরিহাসই 'ব্ল্যাক সোয়ানে'র ট্র্যাজেডি। যক্ষ্মা এবং সিফিলিসের রোগীদের মধ্যে দেখা যায় যে রোগে আক্রান্ত হবার

পর কখনো-কখনো তাদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়। 'ডক্টর ফস্‌টাসে'র নায়ক সিফিলিস রোগগ্রস্ত হয়েও আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। রোজালির গর্ভাশয়ে ক্যানসার বীজাণু প্রবেশ করে প্রথম যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তারই ফলে ক্ষণস্থায়ী যৌবনের আভাস ফুটে উঠেছিল। রোজালি একে স্বাভাবিক ভেবে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তখন ভাবতেও পারেনি কত বড় ফাঁকি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

ট্র্যাজেডি ও আয়রনি সৃষ্টির এই টেক্‌নিক মানের রচনায় নতুন নয়। তাঁর হাতে এরকম পরিণতিই স্বাভাবিক। কিন্তু মানের সাহিত্যে রোজালির চরিত্র একটু নতুন ধরনের। সাধারণতঃ তাঁর নায়ক-নায়িকারা শিল্পী, দার্শনিক অথবা জার্মান পুরাণ-কাহিনীর চরিত্র। ধর্ম, শিল্প ও দর্শনের সঙ্গে জীবনের সংঘাত দেখা দেয়, তার ফলে আসে ট্র্যাজেডি। 'ব্ল্যাক সোয়ান' পড়বার পর মানের আর একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। 'ডেথ ইন্‌ ভেনিস'-এর (১৯১২) নায়ক একজন বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক। ভেনিস বেড়াতে গিয়ে একটি পোলিশ কিশোরের মধ্যে দেখতে পেলেন শিল্পী ও সাহিত্যিক যে আদর্শ সৌন্দর্যের সাধনা করে তার জীবন্ত রূপায়ণ। তিনি মুগ্ধ হলেন, সবকিছু ত্যাগ করে কিশোরের জন্য ভেনিসেই থেকে গেলেন। কিন্তু রোজালির কেন্‌-এর প্রতি আকর্ষণটা স্থূল ও সাধারণ। এই আকর্ষণের মূলে ধর্ম, দর্শন বা শিল্পের প্রেরণা নেই। সেজন্যই রোজালিকে আমাদের কাছের মানুষ বলে মনে হয়।

মহারানী

ইংরেজ আমলে দেশীয় রাজ্যগুলি ছিল রূপকথার দেশ। এদের ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার কাহিনী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হয়েছে; কিন্তু এই ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার মধ্যে যারা মানুষ, তাদের জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যেতে পারে এমন বই বেশী নেই। কপূর্রতলার মহারানী বৃন্দা এমনি একটি বই লিখেছেন। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত Maharani তাঁর আত্মচরিত। এখানে ভারতের একটি প্রসিদ্ধ দেশীয় রাজ্যের মহারানী তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখের যে অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন তা আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। গ্রন্থের ভাষা অবশ্য বৃন্দার নয়। তিনি যে কাহিনী বলেছেন শ্রীমতী উইলিয়ামস তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

হিমালয়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র রাজ্য জম্বল; এখানকার শাসকেরা রাজপুত। এই রাজবংশে বৃন্দার জন্ম হয়। জম্বলের রাজা বৃন্দার জ্যেঠামশাই। এক বৃহৎ একান্নবর্তী রাজপরিবারে বৃন্দার জীবন আরম্ভ হলো। বৃন্দার বাবা ছিলেন কপূর্রতলার মহারাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বৃন্দার অসামান্য রূপ দেখে মহারাজা প্রস্তাব করলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র টিকা রাজের (যুবরাজের) সংগে বিয়ে দেবার। বৃন্দার বাবা কথা দিলেন; কিন্তু বৃন্দার মা বেঁকে বসলেন। কপূর্রতলার রাজপরিবার শিখ; রাজপুত হয়ে কি করে সেখানে মেয়ে দেবেন। কথা দেওয়া হয়ে গেছে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই আপত্তি টিকল না।

ঘরে আনবার পূর্বে পুত্রবধূকে শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করলেন মহারাজা। বৃন্দাকে বাড়ি থেকে এনে রাখা হলো এক ইংরেজ গভর্নেসের তত্ত্বাবধানে। তারপর এলো এক ফরাসী গভর্নেস! ফরাসী গভর্নেসের ঐকান্তিক আগ্রহে বৃন্দাকে পাঠানো হলো প্যারিস। সে যুগে এটা খুব দুঃসাহসের কাজ ছিল। কপূর্রতলা ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে তখনো পর্দাপ্রথার কঠোরতা ছিল। য়ুরোপে শিক্ষিতা মেয়েকে ঘরে আনলে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে,—এই গর্ববোধ থেকেই কপূর্রতলার মহারাজা বৃন্দাকে প্যারিস পাঠাতে সম্মত হয়েছিলেন।

বৃন্দা দু'দিনেই ভারতকে ভুলে প্যারিসের সমাজে ডুবে গেলেন। তাঁর কিশোর মনে প্যারিস যে প্রভাব বিস্তার করল, তার ফলে তিনি চিরদিনের জন্য ভারতের সমাজ ও জীবনযাত্রার আদর্শ থেকে দূরে চলে গেলেন। ষোল বৎসর পর্যন্ত বৃন্দার প্যারিসের স্কুলে, থিয়েটারে ও নাচের আসরে কাটল। কপূর্রতলার ভবিষ্যৎ যুবরানী বলে সর্বত্রই তাঁর সমাদর। একবার এক ফরাসী যুবক তাঁকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করল। বৃন্দাও তাকে ভালোবেসেছেন মনে মনে। টিকা রাজের সংগে বিয়ের কথা স্থির হয়েছে; কিন্তু তখনো ভালোবাসার মতো পরিচয় হয়নি। বৃন্দার প্রেমিক ফরাসী গল্প

শোনায়। সে বলে, পৃথিবীতে জন্ম হবার পূর্বে ভগবান জীবাত্মাকে দু'ভাগে ভাগ করেন; পৃথিবীতে এসে এক ভাগ দিয়ে সৃষ্টি হয় পুরুষ, অন্য ভাগ দিয়ে নারী। বিভক্ত জীবাত্মা এক হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কোন্ পুরুষের মধ্যে কোন্ নারীর মধ্যে সে ছড়িয়ে আছে তার সন্ধান করতে থাকে। এই এক হবার ব্যাকুলতাই প্রেম; দুই অর্ধাংশ এক হলেই মিলন হলো পরিপূর্ণ। বৃন্দা, তোমার মধ্যে আমি দেখা পেয়েছি আমার অর্ধাংশের। চলো, আমরা পালিয়ে যাই।

বৃন্দা প্রলুব্ধ হলেন। কিন্তু সেই বালিকার মধ্যে যে চিরন্তনী ভারতীয় নারী ছিল, সে তাঁকে রক্ষা করল। তিনি ফিরে এলেন কপূরতলায়। কিন্তু কেউ কাউকে ভুলতে পারেননি। প্রথম মহাযুদ্ধে এই যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়। তার পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল বৃন্দার দেওয়া উপহার।

যে কিশোরী প্যারিসের থিয়েটারে ও নাচের আসরে ঘুরে এসেছে, তাকে প্রবেশ করতে হলো অন্দরমহলে, পর্দার অন্তরালে। এশিয়া ও য়ুরোপের দুই জগতের মধ্যে বৃন্দার জীবন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল।

বিয়ের আয়োজন আরম্ভ হলো। বিশেষ জাহাজ করে ফ্রান্স থেকে একশ' এবং ইংলন্ড ও আমেরিকা থেকে প্রায় তিনশ' বিদেশী অতিথি এসে পৌঁছল। ভারতের দেশীয় নৃপতিরা এলেন একে একে; আর এলেন মহামান্য আগা খাঁ। ভিখারী, সাধু-সন্ন্যাসী ও প্রজার দল রবাহুত হয়ে এসে শহরের অলি-গলি ভরে ফেলল। শহরের বাইরে মাঠে গড়ে তুলতে হলো শিবির নগরী। বিয়ের জমকালো অনুষ্ঠানের বিবরণ চিত্তাকর্ষক। কনের পোশাক খাঁটি সোনার সুতা ও রেশমের সুতা দিয়ে হাতে তৈরি করা হয়েছে; সময় লেগেছে দু'বছর। মাথার ঘোমটার কাপড় শুধুই সোনার সুতা দিয়ে তৈরি। মুকুট থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত মণি-মুক্তা, হীরা-জহরতে মোড়া।

বিয়ের পর বৃন্দা আবিষ্কার করলেন তাঁর স্বামী দুর্বলচিত্ত ও বিষণ্ণ প্রকৃতির। প্যারিসে শিক্ষিতা মেয়ের উপযুক্ত সংগী টিকা রাজ নয়। যুবরাজ ও যুবরানী দু'জনের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সারা দিন রাত্রিতে কোনো কাজ নেই, শুধু চুপ করে বসে থাকা। কাজ পেলে জীবন হয়তো আনন্দময় হয়ে উঠবে। শ্বশুরের কাছে গিয়ে দু'জনের জন্য কাজ প্রার্থনা করলেন। মহারাজা বললেন, আমি যতদিন আছি, ততদিন শাসনকার্যে হস্তক্ষেপের দরকার নেই; এবং সমাজসেবার নাম করে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে, তা-ও আমি চাই না। এখন তোমাদের স্ফূর্তির সময়, স্ফূর্তি করো।

বারবার আবেদন জানিয়েও যখন কাজের অনুমতি পাওয়া গেল না, তখন ভারতের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এবং ইতালী, ফ্রান্স, ইংলন্ড, আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বৃন্দা। দেশের চেয়ে ভালো লাগে বিদেশ। শ্বশুরের কানে নানা গুজব আসে। তিনি পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অপচেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে মহারাজাকে হতাশ করে বৃন্দা পর পর তিনটি কন্যা উপহার দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ বংশধর উপহার না দিলে টিকা রাজকে আবার বিয়ে দেওয়া হবে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল,

বৃন্দার আর সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই। অস্ত্রোপচার করলে হয়তো ফল হতে পারে, কিন্তু তাতে জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা আছে। এই আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে বৃন্দা অস্ত্রোপচারে সম্মত হলেন। এতেও যখন ফল হলো না, তখন টিকা রাজ একটি অশিক্ষিত রাজপুত মেয়েকে বিয়ে করে আনলেন। বংশধর চাই। মেয়েদের মুখ চেয়ে বৃন্দা এই অপমান সহ্য করলেন। ভেনিস, প্যারিস, লন্ডন ও হলিউডে তাঁর সময় কাটে। মেয়েদের দেখতে মাঝে মাঝে আসতে হয় কপূরতলা। বৃদ্ধ মহারাজার মৃত্যুর পর স্বামী গদি পাওয়ায় তিনি মহারানী হলেন।

বই শেষ করে বৃন্দার প্রতি পাঠকের মনে সহানুভূতি জাগে। যদিও তিনি দেশের টাকা বিদেশে নিয়ে অপব্যয় করেছেন এবং ভারতের উপর দরদের কোনো লক্ষণ দেখাননি, তথাপি ছেলেবেলা থেকে তাঁর জীবন যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছিল; সে জন্য তাঁর দায়িত্ব ছিল না। বৃন্দার জীবনের দুঃখ তাঁর নিজের সৃষ্ট ততটা নয়, যতটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দায়ী। দেশীয় রাজ্যের শাসকদের বিলাস ও দম্ভের সুন্দর ছবি এঁকেছেন বৃন্দা। বরোদার মহারাজা দেড়শ' লোককে ভোজ দিলেন; সেই ভোজে যত বাসন, থালা ইত্যাদি ব্যবহৃত হলো সবই সোনার। হায়দরাবাদের হীরা-জহরতের অভাব নেই। নিজামের আড়াইশ' স্ত্রী এবং মাত্র আশিটি ছেলে ও ষাটটি মেয়ে। এমনি অনেক ছবি আছে দেশীয় রাজ্যের শাসকদের বিলাসিতার। বিদেশে স্পেনের রাজা আলফান্সো, সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী এবং আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। পাঞ্জাবের কুখ্যাত গভর্নর ও'ডায়ার সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটু নতুন আলোকপাত করেছেন। একদিন সিমলায় লেডি হার্ডিঞ্জের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন। পরদিন এক চিঠি পেলেন ও'ডায়ারের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন, আমার স্ত্রীও থিয়েটারে ছিলেন; কিন্তু তাঁর পদমর্যাদা অগ্রাহ্য করে আপনি তাঁর পূর্বেই থিয়েটার ত্যাগ করেছেন। এটা খুবই দুঃখের কথা। ও'ডায়ার তাঁর পেছনে এমন লাগলেন যে, বৃন্দার নামে একটি মস্ত বড় ফাইল তৈরি করে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

দেশের মাটির সঙ্গে যে বৃন্দার যোগ নেই তা স্পষ্ট দেখা যায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা তিনি বলেননি, অথচ য়ুরোপের উপর গত দুটো যুদ্ধের প্রভাব তিনি ভুলতে পারেননি। গান্ধীজী ও নেহেরুর নাম একবার উল্লেখ করেছেন শুধু প্রসঙ্গক্রমে। অধিকাংশ দেশীয় নৃপতিরই দেশের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না; সুতরাং বৃন্দার একার দোষ নয় এটা।

ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর; নিজের ও বংশের সম্মানহানির ভয় না করে অনেক কথা খোলাখুলি বলেছেন মহারানী।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্যে ৩৪৭ বৎসরের ব্যবধান। ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের এই দীর্ঘ সাড়ে তিনশ' বছরের যোগাযোগের ইতিহাসের মধ্যে কত বিচিত্র নর-নারী, কত আশ্চর্য ঘটনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এর মধ্যে উপন্যাসের অনেক উপাদানও খুঁজে পাওয়া যাবে। বহু লেখক এখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে উপন্যাস লিখেছেন; এঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সাড়ে তিনশ' বছরের কাহিনীকে উপন্যাসের মারফৎ ফুটিয়ে তোলবার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা কেউ করেননি। একজন নতুন লেখক পঁয়ত্রিশখানি উপন্যাস লিখে সাড়ে তিনশ' বছরের একটি ধারাবাহিক ছবি দেবেন বলে স্থির করেছেন, এবং ইতিমধ্যেই তাঁর চারখানা বই প্রকাশিত হয়েছে।

জন মাস্টার্স নতুন লেখক হলেও বয়সে নবীন নন। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। এখন আছেন আমেরিকায়। সংবাদপত্রের এক রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ করতে করতে তিনি একদিন বললেন যে, ভারত সম্বন্ধে আমেরিকার কাগজে যে সব প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয় সেগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ এবং নেহাৎ বাজে লেখা। রিপোর্টার আমন্ত্রণ জানাল; বলল, আপনি ভালো করে লিখুন না? মাস্টার্স পরদিনই দশ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন এবং তার পরিবর্তে কিছু দক্ষিণাও পেলেন। পেন্সনের টাকা যথেষ্ট ছিল না; উপার্জন করা প্রয়োজন। আকস্মিকভাবে লেখা থেকে অর্থাগমের সুযোগ দেখতে পেলেন মাস্টার্স।

ব্রিটেনের স্যাভেজ পরিবারের যে সব লোক ভারতে কার্যোপলক্ষে এসেছিল তাদের নিয়ে পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস লিখবেন বলে মাস্টার্স পরিকল্পনা করেছেন। এই পঁয়ত্রিশটি উপন্যাসে ৩৪৭ বছরের কাহিনী থাকবে। মাস্টার্স-এর নিজের পরিবারও ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নরূপে ১৬০ বছর যাবৎ যুক্ত ছিল। এ পর্যন্ত মাস্টার্স চারখানা উপন্যাস লিখেছেন; কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি পরিকল্পনানুযায়ী কালানুসারী নয়। প্রথম উপন্যাস 'নাইট রানার্স অব বেঙ্গল' ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ কেন্দ্র করে লেখা। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস Bhowani Junction ভারতে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা নিয়ে রচিত। সিরিজ পূর্ণ করবার জন্য মাস্টার্স এই পরিণত বয়সে নতুন লেখা আরম্ভ করে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তা বিস্ময়কর। প্রত্যেক বৎসর একখানি উপন্যাস সম্পূর্ণ করবেন, এই তাঁর সংকল্প।

'ভবানী জংশন' ব্রিটেন ও আমেরিকায় ১৯৫৩ সালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত হয়েছে। ভবানী মধ্য-ভারতের একটি কাল্পনিক রেলওয়ে জংশন। এই জংশনের প্রধান রেলপথ দিল্লী-ডেকান রেলওয়ে। রেললাইন, ইঞ্জিন, সিগন্যাল এবং

প্লাটফর্ম শুধু গল্পের পটভূমিকাই নয়, অনেক সময় এদের কাহিনীর জীবন্ত চরিত্র বলে মনে হয়।

গল্পের শুরু ১৯৪৬ সালের মে মাসে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধ উপলক্ষে যে সব ব্রিটিশ সৈন্য এসেছিল তারা একে একে ভারত ত্যাগ করে যাচ্ছে। ভারত তখনো স্বাধীনতা লাভ করেনি সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনিবার্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভবানী জংশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে যেমন বহু দূর থেকে ইঞ্জিন ছুটে আসতে দেখা যায়, তেমনি উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী প্রত্যেকে অনুভব করছে স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবীরূপে এগিয়ে আসছে; আর বেশী দেরী নেই। এই অনুভূতির মধ্যেই কাহিনীর জন্ম। ভিক্টোরিয়া ও টেলর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের প্রতিনিধি, রণজিৎ, সারাভাই ও কে, পি, রায় ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করবার জন্য ব্যগ্র; রোডনি স্যাভেজ ব্রিটিশ-শক্তির প্রতিভূ; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গোবিন্দস্বামী ব্যুরোক্রাটিক সরকারের অঙ্গ হিসাবে রোডনির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ঠেকিয়ে রাখতে। ভবানী জংশনের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা পুরুষানুক্রমে রেলে চাকরি করছে; ভারতীয়দের চেয়ে তারা সকল বিষয়ে অধিকতর সুবিধা পায় এবং এটা তাদের প্রাপ্য বলে মনে করে। ইংরেজেরা তাদের স্বীকার না করলেও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা মনে করে তারা ইংরেজদের সগোত্র। ব্রিটেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকাই এদের স্বভাব; ভারতীয়দের এত অবজ্ঞা করে যে একদিন এরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে একথা তাদের পক্ষে বিশ্বাস করাও কঠিন। ভিক্টোরিয়া জোন্স এই সমাজে বড় হয়েছে। তার বাবা ইঞ্জিন ড্রাইভার; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অধিকাংশই কাজ করে রেলে; থাকে রেলের কোয়ার্টারে। ভিক্টোরিয়া যুদ্ধের ক'বছর ডব্লু, এ, সি-তে চাকরি করেছে। চাকরি এবার শেষ হবে। শেষ হবার আগে কয়েক মাসের ছুটি পেয়ে বাড়ি এসেছে।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের বন্ধ আবহাওয়ায় ভিক্টোরিয়া নিয়ে এল নতুন জীবনের ইঙ্গিত। যুদ্ধ-বিভাগের কাজ করতে গিয়ে সে বৃহত্তর জীবনকে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। ব্রিটিশ অফিসারদের দেখেছে ঘনিষ্ঠরূপে; চিনতে পেরেছে ভারত-বাসীকে। সৈন্য-বিভাগে থাকতেই সে উপলব্ধি করে এসেছে ভারতের স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে উপলব্ধি করেছে তাদের সমাজের অসহায়তাকে। এতদিন তারা ইংরেজদের মুখ চেয়ে ছিল, ব্রিটেনকে বলত 'হোম', এদেশকে ভাবত বিদেশ। এখন ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে পরিচয়ের পর বুঝতে পেরেছে তারা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের স্বীকৃতি দেয় না, বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ব্রিটিশ-শক্তির বশংবদ ভৃত্য হয়ে চিরদিন ভারতীয়দের বিরুদ্ধাচারণ করে এসেছে; সুতরাং ভারত স্বাধীন হবার পর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অবস্থা কি হবে? তাদের গৃহ নেই, দেশ নেই; যাদের মুরুব্বী কল্পনা করে এতদিন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা উদ্ধত ব্যবহার করবার জোর পেয়েছে আজ তারাও চলে যাবে। ভিক্টোরিয়া স্থির করে এসেছে সে ভারতের মেয়ে, ভারতের সঙ্গেই সে তার ভাগ্য যুক্ত করবে এখন থেকে।

প্যাট্রিক টেলর ভিক্টোরিয়ার ছেলেবেলার বন্ধু। যৌবনে সে বন্ধুত্ব অন্তরঙ্গতায় পরিণত হলো। যদিও মৌখিক বাগদান হয়নি তবু ওরা দু'জন এবং পরিবারের অন্য সকলেই জানে একদিন ওদের বিয়ে হবে। ভিক্টোরিয়া অনেক দিন পরে বাড়ি এসে টেলরকে নতুন চোখে দেখল। টেলর যেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সকল দোষ, সকল সংকীর্ণতার প্রতীক। তার গায়ের রঙ ততটা ফর্সা নয়; পাছে তাকে কেউ 'নেটিভ' বলে ভুল করে তাই সে সর্বদা টুপি পরে থাকে,—রাত্রিতেও। কথায় কথায় 'ব্লাডি' ব্যবহার করে, ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞার শেষ নেই; অকারণে তার রুক্ষ মেজাজ আত্মপ্রকাশ করে; এবং চারিত্রিক উচ্ছৃংখলতার জন্য ভিক্টোরিয়ার অনুপস্থিতিতে তার বোনের সংগে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

বেশিদিন ছুটি ভোগ করা হলো না ভিক্টোরিয়ার। কর্নেল রোডনি স্যাভেজ এক গুর্খা বাহিনী নিয়ে ভবানীতে উপস্থিত হলো। তখন নিখিল ভারত রেল ধর্মঘট সমাসন্ন। ব্রিটিশ সৈন্য বোঝাই স্পেশাল ট্রেণ ভবানী জংশন হয়ে যাবে বোম্বাই; বোম্বাই থেকে তারা দেশে ফিরবে। গভর্নমেন্টের আশংকা রেল ধর্মঘটের সুযোগে বার্মায় সুভাষচন্দ্রের ভূতপূর্ব সহকর্মী পলাতক কম্যুনিস্ট কে, পি, রায় সৈন্য বোঝাই ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা করবে। তাই কর্নেল স্যাভেজ এসেছে রেল লাইনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে। ভিক্টোরিয়ার প্রতি হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এলো ছুটি বাতিল করে কর্নেল স্যাভেজের দপ্তরে হাজির হতে। ভিক্টোরিয়া হলো স্যাভেজের ব্যক্তিগত সহকারী; তার প্রধান কাজ রেল-দপ্তর ও সেনা-দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। প্যাট্রিক টেলর ভবানী জংশনের ট্র্যাফিক অফিসার। সুতরাং প্রায়ই যেতে হয় তার আপিসে। টেলর প্রথম থেকেই স্যাভেজকে সুনজরে দেখতে পারেনি। সুতরাং দুই-পুরুষ ও এক-নারীর চিরন্তন সমস্যা শুরু হলো। ধীরে ধীরে আর একজন ভিক্টোরিয়ার জীবনে প্রবেশ করে গল্পের ধারায় নতুন বাঁক সৃষ্টি করল; সে রণজিৎ কাসেল, টেলরের সহকারী। ভিক্টোরিয়া দেখল ব্রিটিশ কিংবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যত পুরুষের সংগে তার পরিচয় হয়েছে রণজিৎ তাদের কারো মতো নয়। একটু পরিচয় হবার পরই তারা ভিক্টোরিয়ার দেহের উপর দাবী জানাতে চায়। সম্প্রতি এমনি এক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সে হেডকোয়ার্টার থেকে ফিরেছে। একজন ব্রিটিশ অফিসার প্রেমের লোভ দেখিয়ে তাকে প্রতারিত করেছে, কিছুই কেড়ে নিতে বাকি রাখেনি। সেই প্রতারিত হবার জ্বালা, সর্বস্ব খোয়াবার বেদনা, ব্রিটিশ জাতির উপর ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। শান্তি খুঁজল নিজেদের সমাজে। কিন্তু এখানেও দেহ-সর্বস্ব আকর্ষণ, প্রেম নেই। যৌনানুভূতির উগ্রতা তাদের রক্তে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের আদি জননী যে দুর্বল মুহূর্তে বিদেশীর নিকট আত্মদান করেছিল, সে মুহূর্তটি এখনো তাদের রক্তে জাগ্রত হয়ে আছে। কর্নেল স্যাভেজ ভিক্টোরিয়ার রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সে আকর্ষণ অশোভন হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। অফিসার সুলভ কাঠিন্যের বর্ম দিয়ে নিজেকে সে গোপন করে রেখেছে। কিন্তু তার সহকর্মী মেকলের মধ্যে পশু প্রবৃত্তি জেগে উঠল, ভিক্টোরিয়াকে

অপমানিত করবার চেষ্টাও করল। এদের সকলের থেকে পৃথক এই শিখ যুবক রণজিৎ। সে ভিক্টোরিয়াকে মানুষ হিসাবেই দেখে, শুধু মেয়ে বলে দেখে না। এই সম্মানটুকু পেয়ে ভিক্টোরিয়া রণজিৎ-এর প্রতি আকৃষ্ট হলো। রণজিৎ কংগ্রেসপন্থী; সে স্বপ্ন দেখে ভারত শীঘ্রই স্বাধীনতা লাভ করবে, স্বাধীনতা পেলে এ দেশ ফুলের মতো ফুটে উঠবে। ভিক্টোরিয়াও এই স্বপ্নের অংশভাগী হতে চায়। স্বাধীন ভারতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে কোন সম্প্রদায় থাকবে না, সব 'ইন্ডিয়ান' হবে, এই হলো ভিক্টোরিয়ার কামনা।

রেলের ধর্মঘট আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই ও করাচীর নৌ-বিদ্রোহের গুজব ছড়াচ্ছে লোকের মুখে মুখে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা রেল ধর্মঘটে যোগ দেয়নি, তারা কাজ করছে এবং সে জন্যই খুব জরুরী কয়েকটা গাড়ী চলাচল সম্ভব হচ্ছে। সৈন্য মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল এবং এগুলো যে ভবানীতে বসে কে, পি, রায়ই করাচ্ছে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। শোভাযাত্রা, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, স্থানীয় কংগ্রেস সভাপতির সদলবলে রেল লাইনের উপর শুয়ে গাড়ী চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা জনতা কর্তৃক জেল আক্রমণ প্রভৃতি নানা ঘটনায় ভবানী জংশন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কর্নেল স্যাভেজ-এর আশঙ্কা হতো ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের বুঝি পুনরভিনয় হবে। এই ভবানীর নিকটেই আছে তার এক পূর্বপুরুষের সমাধি; ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে সে মারা গিয়েছিল।

অনেক রাত হয়েছে; স্টেশন, রেল লাইন সব নির্জন, চারদিকে একটা থমথমে ভাব। ভিক্টোরিয়া কাজ সেরে বাড়ি যাবে,—মেকলে সংগে এলো এগিয়ে দিতে। এক অন্ধকার কোণে মেকলে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করল: কুমতলব বুঝতে পেরে ভিক্টোরিয়া রেল লাইন থেকে একটা লোহার ডাণ্ডা তুলে মেকলের মাথায় উন্মত্তের মতো আঘাত করতে লাগল। মেকলের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ভিক্টোরিয়ার পোশাক রক্তে লাল, এক মুহূর্তের বিপর্যয়ে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ঠিক সে সময় রণজিৎ এসে দাঁড়াল তার পাশে। তাকে নিয়ে গেল তার মার কাছে। রণজিৎ-এর মা কে, পি, রায়ের সমর্থক, রাজনীতিতে চরমপন্থী। একজন ব্রিটিশকে মেরেছে বলে সে সুখী হলো, এমন ব্যবস্থা করল যে খুনের সকল প্রমাণ লোপ পেয়ে গেল। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে রণজিৎ-এর উপর বেড়ে গেল তার আকর্ষণ। প্রায়ই তাদের বাড়ি বেড়াতে যায়। ক্রমে সে গাউন ছেড়ে শাড়ী পরতে আরম্ভ করল; রণজিৎকে বিয়ে করবে তাও ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের আগে দু'জনে গেল গুরুর কাছে শিখ ধর্মে দীক্ষিত হতে। কিন্তু ভিক্টোরিয়াকে যখন নিজের নাম বদলে নতুন নাম গ্রহণ করতে বলা হলো তখন হঠাৎ কি এক ভাবান্তর ঘটল তার মধ্যে; সে যেন বিভীষিকার সম্মুখ থেকে ছুটে এলো পাগলের মতো, ধরা দিল কর্নেল স্যাভেজের বাহুবন্ধনে। স্যাভেজও এতদিনের গাম্ভীর্যের মুখোশ ত্যাগ করে তাকে গ্রহণ করল। তাদের অন্তরঙ্গতা কেন্দ্র করে টেলরের ঈর্ষা নতুন করে জেগে উঠল; যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজ রণজিৎকে বিয়ে

করবে বলে তাকে একঘরে করেছিল, তারাই এখন ভিক্টোরিয়ার সৌভাগ্য কল্পনা করে চঞ্চল হয়ে উঠল। স্যাভেজ হয়তো তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে বিলেতে। এমন সৌভাগ্য ক'জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ের হয়? স্যাভেজ কিন্তু ক'দিন পরেই অনুভব করল ভিক্টোরিয়া শুধুই মেয়ে, নারী হয়ে বিকশিত হবার সম্ভাবনা তার নেই। তাই ভিক্টোরিয়াকে শেষ পর্যন্ত অনেক ঘোরালো পথ অতিক্রম করে ফিরে আসতে হলো টেলরের কাছেই। ভিক্টোরিয়া নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু রক্তের ইতিহাসকে অস্বীকার করে আদি জননীর ঐতিহ্যের ঊর্ধ্বে উঠতে পারল না। এখানেই তার ট্যাজেডি।)

আলবার্তো মোরাভিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন খুব কম লেখকের ভাগ্যেই তা ঘটে। কোনো কোনো সমালোচকের মতে মোরাভিয়ার জনপ্রিয়তার মূলে আছে তাঁর রচনায় যৌনচিত্রের আধিক্য। এই অভিযোগের মধ্যে প্রকৃত কারণের ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া যাবে। যৌনচিত্রকে মূলধন করে এক ধরনের পাঠক আকৃষ্ট করবার কৌশল কোনো কোনো লেখক আয়ত্ত করেছেন। এ সব লেখকের রচনা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। মোরাভিয়ার রচনায় যৌনচিত্রের আধিক্য থাকলেও এটাই তাঁর একমাত্র সম্বল নয়। তাঁর রচনার প্রধান গুণ গল্প বলবার সাবলীল ভঙ্গি। ভাষা স্বচ্ছ ও সরল; রচনারীতিকে বৈশিষ্ট্য দান করবার জন্য ভাষার কান মুচড়ে তাকে অস্বাভাবিক করেননি মোরাভিয়া। এজন্যই গল্পপিপাসু সাধারণ পাঠকের নিকট মোরাভিয়া সহজেই সমাদর লাভ করতে পেরেছেন।

মোরাভিয়ার জন্ম হয়েছে রোমনগরীতে ১৯০৭ সালে। রোমের জীবনই তাঁর সকল কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। যৌবনের স্বপ্ন, বারবনিতার প্রেম ও হতাশা, ঈর্ষাপরায়ণ স্বামী, দাম্পত্য কলহ, ব্যর্থ লেখকের বেদনা, ইত্যাদি তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। এদের বাস্তবানুগ চিত্র এঁকেছেন মোরাভিয়া। জীবনের বাস্তব ছবি আঁকতে গিয়ে স্বাভাবিক-ভাবেই যৌনচিত্র এসে গেছে। মনোরঞ্জনের সস্তা উপায় হিসাবে যৌনচিত্র আনা হয়নি।

মোরাভিয়ার নবতম উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে A Ghost at Noon নামে। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝার বিয়োগান্ত কাহিনী বলা হয়েছে এই উপন্যাসে। রোমের তরুণ নাট্যকার রিকার্ডো মলটেনি বিয়ে করেছে এমিলিয়াকে। রিকার্ডোর আয়ের কোনো নিশ্চিত পথ নেই; অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটে। ছোট্ট একটি ঘরে স্বামী-স্ত্রী নানা দুঃখের মধ্যে বাস করে। কিন্তু বিয়ের প্রথম দু'বৎসর এসব কষ্ট তাদের একটুও গায়ে লাগেনি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছিল নিবিড় নিখাদ প্রেম। অর্থাভাবজনিত দুঃখ কষ্ট সে প্রেমে ফাটল ধরাতে পারেনি। হঠাৎ রিকার্ডোর অর্থো-পার্জনের একটা সুযোগ এসে গেল। বাত্তিস্তা নামক একজন ধুরন্ধর ফিল্ম প্রযোজক রিকার্ডোকে ফিল্মের কাহিনী লেখবার জন্য নিযুক্ত করল। এমিলিয়ার একান্ত আগ্রহ একটি সুন্দর সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে সংসার পাতবার। কিছু অগ্রিম টাকা পেয়ে রিকার্ডো একটি ফ্ল্যাট লীজ নিয়ে এমিলিয়ার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করল। কিন্তু রিকার্ডো বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করল যে, নতুন বাড়িতে এসে এবং আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে থেকেও এমিলিয়ার প্রেম যেন ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে। রিকার্ডোর মনে সন্দেহ জাগল। এমিলিয়া তাকে পূর্বের মতো আর কেন ভালবাসে না? বাত্তিস্তার সঙ্গে এমিলিয়ার পরিচয় হয়েছে। কে জানে, তার অজ্ঞাতে সে পরিচয় কতদূর

এগিয়েছে! হয়তো ঐ জন্যই এমিলিয়া তাকে অবহেলা করে। কিন্তু কারণটা না জানা পর্যন্ত রিকার্ডোর মনে স্বস্তি নেই। বারবার প্রশ্ন করে একদিন এমিলিয়ার মুখ থেকেই শুনতে পেল সে তাকে অবজ্ঞা করে; কিন্তু কারণটা কিছুতেই বলল না। রিকার্ডো তবু বার বার পুরনো দিনের নিবিড় প্রেম দাবি করে। এমিলিয়ার বিরক্তির শেষ নেই; প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনে লাভ কি? এর চেয়ে ভালো বিবাহ-বিচ্ছেদ।

এই সংকটমুহূর্তে বাত্তিস্তা প্রস্তাব করল ক্যাপ্রির মনোরম শান্ত পরিবেশে রিকার্ডো স্ক্রিপ্ট তৈরি করলে সুবিধা হবে। রোমের কোলাহলে এ কাজ ভালো হতে পারে না। ক্যাপ্রিতে বাত্তিস্তার বাড়ি আছে। এমিলিয়া সংগে যেতে পারে; বাত্তিস্তাও যাবে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে। আর যাবে প্রস্তাবিত ফিল্মের ডিরেক্টার। রিকার্ডো ভাবল, মন্দ নয়, নতুন পরিবেশে হয়তো এমিলিয়া বদলাবে। কিন্তু ক্যাপ্রিতে এসে নিশ্চিত প্রমাণ পেল বাত্তিস্তা এমিলিয়ার প্রতি আকৃষ্ট। হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রিকার্ডো দেখল এমিলিয়া বাত্তিস্তার মোটরে রোম ফিরে গেছে। রিকার্ডোর জন্য রেখে গেছে ছোট্ট একটি চিঠি; লিখেছে, রোমে ফিরে এমিলিয়া স্বাধীনভাবে থাকবে। তবে বাত্তিস্তার সংগে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা শুনতে পেলেও যেন বিস্মিত না হয়।

রিকার্ডো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নৌকো ভাড়া করে সমুদ্রে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ সে দেখল এমিলিয়াও সেই নৌকায় বসে আছে। শুধু তাই নয়, রিকার্ডো যেন আবার ফিরে পেয়েছে সেই প্রেমময়ী এমিলিয়াকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই স্বপ্ন ভেংগে গেল। এমিলিয়া কোথাও নেই, ছিলও না, নৌকোয় শুধু রিকার্ডো। পরে রিকার্ডো সংবাদ পেল যে সময় সে এমিলিয়াকে নৌকায় দেখেছিল, প্রায় সে সময়ই রোম যাত্রার পথে এক দুর্ঘটনায় এমিলিয়া মারা গেছে।

কাহিনীর প্রথম অংশে প্রেমমুগ্ধ রিকার্ডোর সন্দেহ, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, জোর করে ভালোবাসা আদায়ের হাস্যকর চেষ্টা এবং তার বেদনা সুন্দর ফুটেছে। পাঠকের মনে কখনো রিকার্ডোর প্রতি সহানুভূতি, কখনো বা বিতৃষ্ণা জাগে। অত্যন্ত কৌশলের সংগে লেখক দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্বের ছবি এঁকেছেন। অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস Conjugal Love-এর সংগে এই ছবির অনেক স্থানে সাদৃশ্য দেখা যাবে।

এমিলিয়ার আকস্মিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত করবার কৌশলটাও নাটকীয় মনে হয়। দু'বছর গভীরভাবে ভালবাসবার পর হঠাৎ এমিলিয়া স্বামীকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করল কেন, সে বিষয়ে লেখক কিছু না বলায় নায়িকার চরিত্র অস্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু মোরাভিয়া এই দ্বন্দ্বের কারণ সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত দিয়েছেন। সেই ইংগিত থেকে এমিলিয়ার চরিত্র বোঝা যেতে পারে। বাত্তিস্তার নতুন ফিল্ম হবে ইউলিসিসের কাহিনী নিয়ে। রিকার্ডো তার স্ক্রিপ্ট লিখছে। ছবির জার্মান ডিরেক্টার ইউলিসিসের কাহিনীর এক নতুন ব্যাখ্যা দিল রিকার্ডোকে। ইউলিসিস হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক; পেনিলোপ আদিম মনোবৃত্তির মূর্তিমতী রূপ। বিয়ের পরও সুন্দরী পেনিলোপের প্রণয়-প্রার্থীর সংখ্যা কম ছিল না।

তারা নানা উপহার নিয়ে আসত ; গ্রীসের তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে সে-সব উপহার গ্রহণ করতে হতো। ইউলিসিস প্রণয়প্রার্থীদের উপেক্ষা করত, হয়তো বা একটু করুণাও। ভাবত, পেনিলোপ আমাকে ভালোবাসে, সে সাধ্বী স্ত্রী, আমার কোন ভয় নেই। যে বেচারারা ওর ভালোবাসা পেল না তারা যদি দু'টো কথা বলে, কিছু উপহার দিয়ে, একটু আনন্দ পায়, তা পাক না। কিন্তু পেনিলোপ স্বামীর এই উদারতায় ক্ষুব্ধ হয়। আদিম মানবসমাজের ঐতিহ্য তার রক্তে। সে দেখতে চায় স্বামী তার প্রণয়প্রার্থীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠবে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে তাদের হত্যা করবে। সেই রক্তে তৃপ্ত হবে পেনিলোপ। আর এটাই তো পুরুষের মতো কাজ, স্বামীর কর্তব্য। নারীর প্রেম এ রকম বীর্যবান পুরুষদেরই প্রাপ্য। কিন্তু ইউলিসিস অচঞ্চল, শান্ত, ভদ্র। সুতরাং পেনিলোপের মনের গভীর তলদেশে স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণার বীজ উপ্ত হলো। ক্রমে ক্রমে সেই বিতৃষ্ণা অবজ্ঞায় পরিণত হলো, স্বামীর প্রতি প্রেম রইলো না বিন্দুমাত্রও। ইউলিসিস বুঝল না কেন সে স্ত্রীর ভালোবাসা হারিয়েছে ; প্রেমহীন সংসারে নিরানন্দ পরিবেশ দুঃসহ হয়ে উঠল। তাই সে চলে গেল ট্রয়ের যুদ্ধে। যুদ্ধ শেষ হবার পর সবাই বাড়ি ফিরবার জন্য ব্যস্ত ; কিন্তু ইউলিসিসের ব্যস্ততা নেই। যে স্ত্রী ভালোবাসে না, অবজ্ঞা করে, তার সাহচর্যে জীবন কাটানোর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কি আছে ? ইউলিসিস অনেক ঘুরে, দীর্ঘকাল পরে বাড়ি ফিরল। হয়তো আশা ছিল, পেনিলোপ তার বিলম্ব দেখে অন্য কাউকে বিয়ে করবে। কিন্তু পেনিলোপ পাণিপ্রার্থীদের কাউকে গ্রহণ করেনি। ইউলিসিসকে ভালোবাসে বলে নয়, স্ত্রী হিসাবে নিজের ধর্ম রক্ষার জন্যই দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রেমহীন জীবন এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইউলিসিসের চরিত্র অনেকটা পরিবর্তিত করেছে। এবার সে স্ত্রীর প্রণয়প্রার্থীদের হত্যা করতে দ্বিধা করল না। তার ফলে সে ফিরে পেল স্ত্রীর ভালোবাসা ; ফিরে পেল প্রৌঢ়া পেনিলোপের মধ্যে তরুণী নববধূকে।

পেনিলোপের মতো এমিলিয়ার মনেও গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল যে বাত্তিস্তার তার প্রতি অশোভন মনোযোগের বিরুদ্ধে রিকার্ডো প্রতিবাদ করবে, প্রয়োজন হলে তাকে হত্যা করে পৌরুষের পরিচয় দেবে। রিকার্ডো তাকে এগিয়ে দিয়েছে বাত্তিস্তার হাতে। এমিলিয়া তাই স্বামীকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছিল। অবশ্য এই ব্যাখ্যাটা শুধু ইঙ্গিতেই বলা হয়েছে।

এদেশের পাঠকদের কাছে হেরমান হেসের নাম সুপরিচিত। আর এই পরিচয় স্থাপিত হয়েছে প্রধানতঃ ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর অনবদ্য উপন্যাস 'সিদ্ধার্থে'র সাহায্যে। 'সিদ্ধার্থ' এবং তাঁর অন্যান্য প্রধান উপন্যাসগুলি দার্শনিক ভিত্তির উপর রচিত। কিন্তু Gertrude এর ব্যতিক্রম। 'গারট্রুড'-এ কোন দার্শনিক মতবাদ গল্পকে ছাপিয়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি। কয়েকটি নর-নারীর প্রেম ও বেদনার কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় এখানে বলা হয়েছে।

কুন্ স্কুলে পড়বার সময় থেকেই বেহালা বাজানো শিখছে ওস্তাদ রেখে। স্কুলের পড়া শেষ করে সে সংগীত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে স্থির করেছে। সংগীতকে জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করবে। কুনের বাবার ইচ্ছা নয় একমাত্র ছেলে শিল্পী-জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যে যাক। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুনের আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিতে হলো। কুন্ বড় শহরে এসে সংগীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। শিক্ষকের নির্দিষ্ট পাঠ অনুসরণ করে বেহালা বাজায় কুন্; সে বাজনায় ব্যাকরণ নির্ভুল, কিন্তু প্রতিভার স্পর্শ নেই।

একদিন বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী শহরের বাইরে একটা পাহাড়ে বেড়াতে গেল। লিডি এবং কুন্ সারাদিন ঘুরল কাছাকাছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এবার ফিরতে হবে। পূর্ণযৌবনা লিডির চোখের কোণে কি ইঙ্গিত ঝলসে উঠল। বলল, 'চলো, আমরা পাহাড়ের এই নির্জন ধারটা দিয়ে নেমে যাই।' খাড়া পাহাড়; বরফে ঢাকা; গাছের নিচে অন্ধকার জমে উঠেছে; কুন্ একটু দ্বিধা করল, কিন্তু লিডির আগ্রহ অগ্রাহ্য করতে পারল না। নামতে গিয়ে ওরা দু'জনে পড়ে গেল। লিডির কিছু হলো না, কুনের পা ভাঙল। অনেক দিন পরে কুন্ যখন বিছানা থেকে নামল তখন তার নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াবার শক্তি নেই। লাঠি নিয়ে চলতে হয়। একটি পা চিরদিনের জন্য অশক্ত হয়ে পড়েছে। এই একটি ঘটনা কুনের জীবন দু'ভাগে ভাগ করে দিল। ভবিষ্যৎ জীবনের সকল আশা ও স্বপ্ন হঠাৎ চলে গেল দুস্তর সমুদ্রের পরপারে। যে মন ছড়িয়ে দিয়েছিল সংসারের শতমুখী রসধারায়, তা বেত্রাহত কুকুরের মতো ফিরে এলো নিজের মধ্যে।

এতদিন কুনের সংগীত চর্চায় যে ফাঁকটুকু ছিল, গভীর বেদনা তা পূর্ণ করে দিল। কুন্ একটি গান রচনা করে তাতে নিজেই সুর দিয়েছে। কিন্তু ঠিক সংগীত শাস্ত্রানুযায়ী হয়নি। তাই সংগীত শিক্ষক তার রচনা সাদরে গ্রহণ করতে পারলেন না; কিন্তু এমন একটি নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া গেল যাকে কিছু নয় বলে উপেক্ষা করাও অসম্ভব। শহরের শ্রেষ্ঠ গায়ক হেনরিক কুনের রচনায় উৎসাহ প্রকাশ করল। নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে কুনের গান গেয়ে শোনাল। অদ্ভুত মানুষ এই হেনরিক। চমৎকার

দেখতে ; তার মতো ভালো গান ও-অঞ্চলে কেউ গাইতে পারে না। বয়সে কুনের চেয়ে বড় ; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কুনকে আপন করে নিল। হেনরিকের সহায়তায় সংগীত জগতে কুন্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ; একটি অপেরা হাউসে বেহালা বাজানোর কাজও সংগ্রহ করে দিয়েছে হেনরিক।

শহরের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ইম্থরের সঙ্গেও পরিচয় হলো। ইম্থর গানবাজনার ভক্ত। মাঝে মাঝে সে শিল্পীদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনে ; গান শোনে, বাজনা উপভোগ করে। দক্ষিণা দেয় মোটা টাকা। একদিন নিমন্ত্রণ হলো কুনের। কুন্ গিয়ে দেখল ইম্থরের মেয়ে গারট্রুড তার কথা ও সুরকে রূপ দিয়েছে কণ্ঠের মাধুর্য দিয়ে। নিভৃত মনের আনন্দ-বেদনা দিয়ে যে সুর সৃষ্টি সে করেছে, একটি অপরিচিতা তরুণী তাকে মূর্ত করে তুলেছে দেখে কুনের খুব আনন্দ হলো। সে গারট্রুডের কাছে কৃতজ্ঞ। তাই ইম্থর যখন সেদিনকার বাজনার জন্য পারিশ্রমিক দিতে এলো কুন্ তা গ্রহণ করতে পারল না।

এর পর থেকে কুন্ প্রায়ই যায় গারট্রুডের বাড়ি। জলসা ঘরের এক কোণে বসে কুন্ বেহালা বাজায় আর এক কোণে পিয়ানো বাজিয়ে গারট্রুড গান করে। সুরের অদৃশ্য সোনালী সুতো ওদের দুজনকে বেঁধেছে। অন্তরাল থেকে কে যেন সেই সুতো টানছে, সুতো ছোট হচ্ছে, ওরা পরস্পরের নিকটে আসছে। সুরের জগতে নিবিড় বন্ধুত্ব ওদের। বাস্তব জীবনেও সেই বন্ধুত্ব টেনে আনতে চাইলো কুন্।

সেখানেই কুন্ ভুল করল। অথচ এমন ভুল এতদিন সে করেনি। মেয়েদের সে এড়িয়ে চলেছে ; সে জানত মেয়েদের চোখে প্রেমিকের যোগ্যতা নেই তার। তারা সহানুভূতি দেখায়, ভালোবাসতে পারে না। কুন্ আশাও করেনি, সহজ ভাবেই তা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে এই গারট্রুড। আশ্চর্য তার ক্ষমতা। কুন্ নিজেকে ভুলে গেল। আত্ম-বিস্মৃত হয়ে ভালোবাসল ওকে। শুধু তাই নয়, গারট্রুডের কাছ থেকে প্রতিদানও চাইলো। গারট্রুড প্রত্যাখ্যান করল না। বলল, এখনও সময় হয়নি, অপেক্ষা করো।

কুন্ একটা বড় কাজে হাত দিয়েছে। একটি অপেরা রচনা করবে। অনেক গান, তাদের সুর দিতে হবে। গারট্রুড গেয়ে শোনায়, কুন্ পরীক্ষা করে কোন্ সুরটা ভালো। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবার পর হেনরিক এলো। হেনরিক অপেরায় গান গাইবে। সুতরাং রিহার্সালটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। গানের মহড়া গারট্রুডদের বাড়িতে। হেনরিকের সঙ্গে গারট্রুডের আলাপ হলো। সে আলাপ প্রেমে পরিণত হতে দেরি হলো না। কুন্ নিরুপায় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া আর কি করবে ? জীবনের মধুরতম স্বপ্ন ভেঙে গেল ; কিন্তু এর চেয়ে বড় দুঃখ তাকে ভাবিয়ে তুলল। হেনরিক কোন মেয়েকে সুখী করতে পারেনি। কুন্ ওর জীবনের এদিকটার ইতিহাস জানে। মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু কিছুদিন পরেই আঘাত পেয়ে ফিরে যায়। সে আঘাত গারট্রুডও পাবে ; কুনকে এই আশঙ্কা ভাবিয়ে তুলেছে। হেনরিকের বিরুদ্ধে

কিছু বলতে গেলে গারট্রুড ভাববে এটা ওর ঈর্ষা। তাই নীরবে চলে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ওদের বিয়ে উপলক্ষে কুন্ নতুন গান লিখে সুর দিল। সে গান বিয়ের দিন গির্জায় গাওয়া হলো।

হেনরিক ও গারট্রুডের দাম্পত্য জীবন বেশিদিন সুখে কাটল না। দু'জনেই পরস্পরকে ভালোবাসে, অথচ কি একটা দুর্বোধ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা এক হতে পারল না। গারট্রুড ভাঙা মন ও ভাঙা দেহ নিয়ে ফিরে এলো বাবার বাড়ি। হেনরিক তাকে ভুল বুঝে আত্মহত্যা করল। গারট্রুডের এত বড় দুঃখের দিনে কুন্ গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। ক্রমে শোক ফিকে হলো, দেহ সারল, মাঝে মাঝে গানও গাইতে আরম্ভ করল গারট্রুড। কখনো কখনো কুনের মনে নিরুদ্ধ বাসনা জেগে ওঠে।

কুনের বাবা বলতেন, যৌবনে আত্মহত্যা করা সহজ। কারণ, যৌবনে আমরা নিজেদেরই ভালোবাসি। বয়স যত বাড়ে, আত্মহত্যা তত কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা, তখন জীবনের শিকড় নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের আকর্ষণ বড় গভীর। আমার মৃত্যু কার মনে দুঃখ দেবে, আমার অভাবে কে অসহায় হয়ে পড়বে, এ সব চিন্তা মরতে দেয় না। কুনেরও এই অভিজ্ঞতা আছে। গারট্রুড যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে হেনরিককে গ্রহণ করল তখন কুন্ আত্মহত্যা করবে স্থির করেছিল। কিন্তু বাধা দিল মার টেলিগ্রাম : বাবা মৃত্যু শয্যায়, শীঘ্র এসো। মা একা, অসহায়। তাঁকে ফেলে স্বার্থপরের মতো মরতে পারল না।

গারট্রুড ছাড়া কুনের এখন অন্য কোন বন্ধন নেই। গারট্রুড কখনো তার প্রেয়সী হবে না, সে শুধুই বান্ধবী। তবু কুন্ তাকে ভালোবাসে। গারট্রুড কুন্‌কে ভালো না বাসলেও বন্ধু বলে স্বীকার করে ; তার নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনে কুন্‌ই একমাত্র সঙ্গী। গারট্রুডের কথা ভেবেই কুনের পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব হয় না। সে গারট্রুডকে বেহালা বাজিয়ে শোনায়, গান করে, গল্প বলে, তাকে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হয়। এর মধ্যেই কুন্ তার জীবনের তৃপ্তি ও শান্তি খুঁজে পেয়েছে। নিজের জন্য নয়, যাকে ভালোবেসে প্রতিদান পায়নি শুধু তার জন্য বেঁচে থাকা, এইটুকু তার জীবনের সার্থকতা।

আমেরিকার সূত্র থেকে জানা গিয়েছিল ১৯২৯ সালে হালডোর কিলিয়ান ল্যাক্সনেস কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এ সংবাদ যথার্থ নয় বলে মনে হয়। তাঁর রচনার যতটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে তার মধ্যে কম্যুনিজম বা অন্য কোনো রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে শিল্পবোধকে ক্ষুণ্ণ করেনি। ল্যাক্সনেস স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, তিনি কম্যুনিস্ট দলভুক্ত নন্ এবং অন্য কোনো রাজনৈতিক দলেও তিনি যোগ দেননি। তিনি লেখক, এইটে তাঁর পরিচয়। তবে, কম্যুনিজমের প্রতি ল্যাক্সনেসের অহেতুক বিদ্বেষও নেই। রাশিয়ার যা-কিছু ভালো তার প্রশংসা তিনি করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। ল্যাক্সনেসের দরিদ্রদের জন্য গভীর দরদ। রাশিয়া এদের ভাগ্যোন্নতির জন্য যে বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে ল্যাক্সনেসকে তা আকৃষ্ট করে। কিন্তু প্রয়োজন হলে রাশিয়ার তীব্র সমালোচনা করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না।

এদেশের এবং বিদেশের অনেক কাগজে ল্যাক্সনেস সম্বন্ধে আর একটি খবর বেরিয়েছে যার সমর্থন নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। স্ট্যালিন পুরস্কার-প্রাপ্তি সংবাদটা যথার্থ বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৫৩ সালে। এই প্রতিষ্ঠান কম্যুনিস্ট প্রভাবান্বিত বলে সহজেই একে রাশিয়ার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয় এবং বোধ হয় ভুল করে এই পুরস্কারকেই স্ট্যালিন পুরস্কার বলা হয়েছে। ১৯৫৩ সালের স্ট্যালিন শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন মেজর জেনারেল শোখে, হাওয়ার্ড ফাস্ট, লিও ক্রুসৎস্-কভস্কি ও পাবলো নেরুদা।

১৯৫৩ সালে 'সোভিয়েট লিটারেচারে'র দ্বাদশ সংখ্যায় ল্যাক্সনেস সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে ল্যাক্সনেস কম্যুনিস্ট এবং তিনি স্ট্যালিন পুরস্কার পেয়েছেন এমন কথা উল্লেখ করা হয়নি। সত্য হলে 'সোভিয়েট লিটারেচার' নিশ্চয়ই এ খবর আমাদের দিতেন।

দরিদ্রের প্রতি গভীর মমতা ল্যাক্সনেসকে ধনিক সম্প্রদায়ের উপর নিষ্ঠুর করেছে। পুঁজিপতির দেশ আমেরিকা। আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আছে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ল্যাক্সনেস আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন। সেখানে আপ্টন সিনক্লেয়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সিনক্লেয়ারের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ল্যাক্সনেসের জীবন-দর্শনকে প্রভাবান্বিত করেছে। আমেরিকায় বেকারদের শোচনীয় অবস্থা দেখে ধনী ও দরিদ্রের প্রতি তুলনাটা বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। ল্যাক্সনেস্ তাই ধনতান্ত্রিক আমেরিকাকে কখনো ক্ষমা করতে পারেননি।

ল্যাক্সনেসের একটিমাত্র বইয়ের অনুবাদ এখন পাওয়া যায়। সেটি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট পীপল'। এই উপন্যাসটির কথা আলোচনা করলেই ল্যাক্সনেসের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

উপলব্ধি করা যেতে পারে। 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপল' -এর আকার বৃহৎ; পটভূমিকা বিরাট; মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত এই কাহিনী। আইসল্যাণ্ডের প্রাচীন সাগার যেন আধুনিক উপন্যাসরূপ। নোবেল কমিটি গাথা-কাহিনীর প্রাচীন ঐতিহ্যকে উপন্যাসের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যই প্রধানতঃ ল্যাক্সনেসকে পুরস্কার দিয়েছেন।

'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পীপলের' নায়ক বিয়ারতুর সাধারণ ক্ষেত-মজুর। আঠারো বছর ধরে অন্যের মাঠে ক্রীতদাসের মতো সে কাজ করেছে। তারপরে কোনোপ্রকারে এক খণ্ড জমি বন্দোবস্ত নিল। লোকালয় থেকে দূরে বরফঢাকা মাঠ। নব-পরিণীতা স্ত্রীকে সঙ্গে করে সেই নিঃসঙ্গ মাঠে এসে ঘর বাঁধল। আঠারো বছরের বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে এইটেই বিয়ারতুরের কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দ। যে স্বাধীনতা সে পেয়েছে তাকে সে কিছুতেই হারাবে না, এই তার দৃঢ়-সংকল্প। তরুণী স্ত্রী রোজার একটু ভালো খাবারের লোভ। কিন্তু বিয়ারতুর সে-সব কথায় কান দেয় না। লবণমাখা শুকনো মাছ তাদের একমাত্র খাদ্য। বিয়ারতুর একে একে তার ভেড়ার পাল বড় করে তুলছে। গ্রীষ্মকালে ঘাসের চাষ করে। শীতকালের জন্য ঘাস সঞ্চয় করে রাখে। ইতিমধ্যে তার পরিবারে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় স্ত্রীও কয়েকটি সন্তান রেখে মারা গেছে। বিয়ারতুর ভেড়ার জন্য যতটা যত্ন নেয়, ছেলে-মেয়ের জন্য তার অর্ধেকও নেয় না। কারণ বাজারে ভেড়ার দাম আছে, মানুষের দাম নেই। ভেড়া বিক্রির টাকা স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করবে।

এলো প্রথম মহাযুদ্ধ। বিদেশের বাজারে আইসল্যাণ্ডের পণ্যের আদর বাড়ল। আইসল্যাণ্ড সস্তা টাকায় ফেঁপে উঠল। যে-অঞ্চলে বিয়ারতুরের বাড়ি সেখানে পথঘাট ছিল না, লোকজনেরও বিশেষ যাতায়াত ছিল না। এখন তার বাড়ির সামনে দিয়ে পাকা রাস্তা হয়েছে, সে রাস্তা দিয়ে মোটর চলাচল করে। যে-জমি পতিত পড়ে ছিল এখন তার অসম্ভব দাম বেড়েছে। এদিকে আইসল্যাণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখন যাদের হাতে গভর্নমেণ্ট তারা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ডেনমার্কের অনুকরণে সমবায়-সমিতি ইত্যাদি স্থাপন করেছে। আসন্ন নির্বাচনে বিয়ারতুরের ভোট প্রয়োজন। সুতরাং ক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক দল তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বাড়ি তৈরির মালমশলা গছিয়ে দিয়ে গেল। বিয়ারতুরের অনেক দিনের শখ ভালো দেখে একটি বাড়ি করবার। তাই ঋণ করেও সে বাড়ি করল। সমস্যা দেখা দিল যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। আয় হঠাৎ কমে গেল, ঋণ শোধ করবার আর পথ রইলো না। ঋণের দায়ে তার বাড়ি ও সম্পত্তি নিলামে উঠল। বুকের রক্ত জল করে সম্পত্তি সে গড়ে তুলেছে, শুধু টাকার জোরে তা একজন পুঁজিপতি অধিকার করল। কিন্তু তবু বিয়ারতুর হতাশ হলো না। একবার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, আর সে জীবিকার্জনের জন্য অন্যের দাসত্ব গ্রহণ করবে না। বিয়ারতুর আরো দূরে অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। জনমানবহীন বরফের মরুভূমির মধ্যে সে নতুন উপনিবেশ গড়বে।

বিয়ারতুর একটি অসাধারণ চরিত্র। এই একটি চরিত্র প্রাধান্য লাভ করে কাহিনীর

অন্য সব পাত্র-পাত্রীদের ম্লান করে দিয়েছে। অ-প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে আস্টা ও রোজা মনে দাগ রেখে যায়। তরুণী বধূ রোজা একটু মাংসের ঝোলের জন্য ব্যাকুল; দুধের তীব্র পিপাসা দুঃস্বপ্নের মতো তাকে তাড়া করে; স্বামী কার্যোপলক্ষে শহরে গেলে সে একা থাকে। যতদূর দৃষ্টি যায়, মানুষের চিহ্ন চোখে পড়ে না, শুধু ধু ধু করছে তুষার-ঢাকা মাঠ। অপদেবতার ভয়। সারারাত চোখে ঘুম আসে না। এক-রাত্রিতে বাচ্চা একটা ভেড়া কেটে রান্না করে মাংস খাবার সাধ মেটাল। সযত্নে সকল চিহ্ন গোপন করে রাখতে হলো। স্বামী যেন বুঝতে না পারেন। তারপরে একদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় শোচনীয় মৃত্যু! পাঁচশ' পৃষ্ঠার সুবৃহৎ উপন্যাসের কয়েক পাতায় মাত্র রোজার কথা আছে। কিন্তু পাঠকের মনে এই করুণ চরিত্রটির ছায়া কাহিনী শেষ হবার পরও থেকে যায়।

বিয়ারতুর নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই সংকল্প তাকে জীবনের অন্য সকল আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত করেছে। সে একটু সংকীর্ণচিত্ত, একগুঁয়ে এবং কল্পনাশক্তিহীন। ভেড়ার বিষয় নিয়ে সে অনর্গল কথা বলতে পারে, অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু হলেই তার মুখ বন্ধ। নতুন যুগের নতুন ভাবধারা সম্বন্ধে বিয়ারতুর অজ্ঞ। ত্রিশ বছর পশ্চাতে পড়ে আছে তার মন। বিয়ারতুরের হৃদয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে কঠোর; সেই কঠোরতার মধ্যে একটুমাত্র কোমল স্থান ছিল আস্টার জন্য। আইসল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী কৃষক-সম্প্রদায়ের শেষ প্রতিনিধি বিয়ারতুর।

যুদ্ধ এমনই ভয়ংকর যে আইসল্যান্ড দূরে থেকেও তার প্রভাবে বিপর্যস্ত হলো। যুদ্ধের মুদ্রাস্ফীতির পরিণামেই বিয়ারতুরের সম্পত্তি গেল। বিয়ারতুরের ছেলে যখন আমেরিকা যাবার প্রস্তাব করল তখন তাকে এই বলে সে সাবধান করে দিল যে সন্ধিপত্রে সই করে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু মনের তো পরিবর্তন হয়নি। মন এখনো হিংস্র, সুতরাং সাবধান!

নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল সমবায়-সমিতি ও গভর্নমেন্টের তহবিল থেকে নানা প্রয়োজনে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। বিয়ারতুর ঋণ গ্রহণ করেছিল এদেরই প্ররোচনায়। লেখক এ সম্বন্ধে বলছেন:

The fact is that it is utterly pointless to make any one a generous offer unless he is a rich man; rich men are the only people who can accept a generous offer. To be poor is simply the peculiar human condition of not being able to take advantage of a generous offer. The essence of being a poor peasant is the inability to avail oneself of the gifts that politicians offer or promise and to be left at the mercy of ideals that only make the rich richer and the poor poorer.

আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিয়ারতুরের কোনো সঙ্গী নেই। একা সংগ্রাম করাতেই তার আনন্দ। তাই বন্দরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে সে যোগ দিল না। তার ছেলে ওদের সঙ্গে রয়ে গেল; সে নতুন উপনিবেশ গড়বার জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করল।

বেশ কিছুদিন পূর্বে রাশিয়ায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল তা শুধু সাহিত্যরসিকদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না, রাজনৈতিক মহলকেও স্পর্শ করেছিল। রাশিয়ার বাহিরে এ-বই নিয়ে আন্দোলন হয়েছে অনেক বেশি। ভাষান্তরিত হবার বহু আগে থেকেই এই নতুন উপন্যাসটি নিয়ে বিভিন্ন দেশের কাগজে আলোচনা কম হয়নি। এই উপন্যাসটির নাম Not by Bread Alone; লেখক Vladimir Dudintsev. এঁর নাম ইতিপূর্বে কারো জানা ছিল না। অপরিচিত লেখক আজ অকস্মাৎ বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। মস্কোর সাহিত্যপত্র Novy Mir (নতুন পৃথিবী)-এ উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে তখন থেকেই রাশিয়ার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়। বিশেষ করে যুব-সম্প্রদায়ে এ-বই নিয়ে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সোভিয়েত জীবন ও সমাজের সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এ বই প্রকাশ করতে দেওয়ায় রাশিয়ান সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেছে।

'নট বাই ব্রেড অ্যালোন' চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে দু'টি কারণে। প্রথমতঃ তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি-সুলভ মানবিকতাবোধসমৃদ্ধ রাশিয়ান উপন্যাসের ঐতিহ্য আলোচ্য কাহিনীর মধ্যে সুস্পষ্ট। বহুদিন পরে এরূপ একটি রাশিয়ান উপন্যাস পাওয়া গেল। রাশিয়া থেকে সম্প্রতি আমরা যে-সব উপন্যাস পেয়েছি, রাশিয়া থেকে যাদের গুণাবলী প্রচার করা হয়েছে—তাদের পড়তে ভালো লাগেনি। মন আকৃষ্ট করবার মতো গুণ তাদের মধ্যে নেই। 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন'-এর লেখক শুধু যে গল্প বলতে জানেন তা-ই নয়, তাঁর গল্পের ধারা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে বয়ে চলে। দ্বিতীয় কারণ, এই উপন্যাসে রাশিয়ার সমাজ ও প্রশাসন সম্বন্ধে এমন অন্তরঙ্গ ছবি আছে যা কোনো রাশিয়ান নাগরিকের বর্ণনার মধ্যে পূর্বে পাওয়া যায়নি। রাশিয়াতেও যে কার্যতঃ শ্রেণীবৈষম্য আছে, কালোবাজার আছে, এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় দলগত চক্রের প্রভুত্ব আছে, তা একজন রাশিয়ান লেখকের কাছ থেকে এই প্রথম এমন সুস্পষ্টরূপে জানা গেল। সোভিয়েত-বিরোধী দেশগুলি সমগ্র কাহিনী থেকে এই বিরূপ চিত্রগুলি বিচ্ছিন্ন করে ফলাও করে প্রচার করেছে। এটা সাহিত্য-সমালোচনা নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনই এরূপ আলোচনার প্রধান প্রেরণা।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট লোপাতকিন এসেছে মাজগার স্কুলে শিক্ষকের চাকরি নিয়ে। তখন তার বয়স সাতাশ। সে গণিত ও পদার্থ-বিদ্যার শিক্ষক। দীর্ঘ, সুদৃঢ় একহারা চেহারা। কথা বলে কম, নিজের মধ্যে সর্বদা যেন ডুবে আছে। লোপাতকিন একটা নতুন কল তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে মশগুল। এটা স্বয়ংক্রিয় পাইপ তৈরির কল। তখন পর্যন্ত পাইপ তৈরি হত প্রাচীন পদ্ধতিতে; কলের চেয়ে হাতের সাহায্য যাতে বেশি প্রয়োজন। সুতরাং পাইপের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় খুব

কম। নতুন বাড়ি, পথঘাট এবং অন্যান্য উন্নয়ন-পরিকল্পনায় পাইপের প্রচুর চাহিদা। পাইপের চাহিদা মেটাতে হলে উন্নত ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতি চাই। তার পরিকল্পনা সার্থক হলে রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে—এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লোপাতকিন পাইপ তৈরির কল একদিন যাতে সত্যি কার্যকর হতে পারে তার জন্য অবিশ্রাম কাজ করে চলছে। অবশ্য স্কুলে পড়ানো ছাড়া। লোপাতকিন ইঞ্জিনীয়ার নয়, কিন্তু যুদ্ধের সময় যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা এবং অদম্য সংকল্প মূলধন করে লোপাতকিন পাইপ তৈরির স্বয়ংক্রিয় কল উদ্ভাবনের জন্য সাধনা করছে।

একদিন তার নকশা সম্পূর্ণ হল, পাঠিয়ে দিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দপ্তরে। কিছুদিন পরে চিঠি এল—গভর্নমেন্ট তার পরিকল্পনা পরীক্ষা করে দেখতে প্রস্তুত। প্রথম গভর্নমেন্ট ফ্যাক্টরিতে পরীক্ষামূলকভাবে কলের মডেল তৈরি হবে। মডেল তৈরির সময় লোপাতকিনের উপস্থিতি প্রয়োজন। স্কুলের চাকরি ছেড়ে সে যেন চলে আসে, মেশিন তৈরির কাজের জন্য সে মাইনে পাবে। মস্কো এসে সে কিন্তু হতাশ হল। দপ্তরে দপ্তরে ঘোরাঘুরি করল, দেখা করল বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে রায় দিল তার মেশিনের সাহায্যে পাইপ তৈরি সম্ভব নয়, মডেল তৈরি করতে গিয়ে অনর্থক টাকার অপব্যয় হবে। তাছাড়া মন্ত্রীর দপ্তর থেকেও জানিয়ে দেওয়া হল যে, তার পরিকল্পনা পরীক্ষা করে দেখবার মতো টাকা বাজেটে অবশিষ্ট নেই।

লোপাতকিন মাজগায় ফিরে এল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গিয়েছিল, সুতরাং এখন বেকার। কিন্তু সে নতুন চাকরির চেষ্টা করল না। পাইপ তৈরির মেসিন হল তার চব্বিশ ঘন্টার সাধনা। ড্রইং বোর্ডের উপর কাগজ এঁটে কেবলই মেশিনের নকশা আঁকে। আজকের নকশা কাল একটু বদলে যায়। সরকারী দপ্তরে ও বিশেষজ্ঞদের নিকট সে তার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে কেবলই চিঠি লেখে। মাজগায় এবং মস্কোর সংশ্লিষ্ট মহলে সে পাইপ-পাগল নামে পরিচিত। মেশিনের সাহায্যে পাইপ তৈরির কথা কে শুনেছে? যন্ত্রবিদ্যায় যার কোনো শিক্ষা নেই সে এই অসাধ্য সাধন করবে? উপার্জন বন্ধ রেখে এই মরীচিকার পেছনে ছুটছে লোপাতকিন। ছেঁড়া পোশাক, রুক্ষ চুল, স্বেচ্ছায় বরণ করেছে দারিদ্র্য ও নিঃসঙ্গ জীবন। ছিটগ্রস্ত লোক বলে সবাই তাকে অনুকম্পার চোখে দেখে।

মাজগার দু'জন লোক তার সাধনায় আস্থাবান। একজন সিয়ানভ, এর বাড়িতে লোপাতকিন পেয়িং-গেস্ট হয়ে আছে। অবশ্য প্রায়ই 'পে' করতে পারে না। সিয়ানভ নিজে দরিদ্র; লোপাতকিনের সাধনা দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে। কতদিন নিজে না খেয়ে লোপাতকিনকে খাবার দিয়েছে, যে-কোনো সাহায্যের প্রয়োজনে সানন্দে তা করবার জন্য এগিয়ে এসেছে। আর একজন, ইংরেজীর শিক্ষয়িত্রী প্যাভ্লভনা; লোপাতকিনের অন্ধ ভক্ত। সে জানে লোপাতকিনের জীবনে তার স্থান নেই; তবু ধ্যাননিমগ্ন লোপাত-

কিনের সামনে চুপ করে বসে থাকে। আর সব চেয়ে বড় কথা, প্যাভ্‌লভনা প্রয়োজনীয় ড্রয়িংপেপার সংগ্রহ করে দেয়। লোপাতকিনের পক্ষে যা সংগ্রহ করা সম্ভব হত না।

এই বিচিত্র-চরিত্র লোকটির প্রতি ভূগোল-শিক্ষয়িত্রী নাদিয়াও আকর্ষণ অনুভব করেছিল। কিন্তু এ-আকর্ষণ স্থায়ী হয়নি। মাজগার বিরাট সরকারী ফ্যাক্টরির ম্যানেজার দ্রজদভ এল নাদিয়ার জীবনে। দ্রজদভ প্রৌঢ়, চেহারায় কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, কিন্তু প্রচণ্ড তার ব্যক্তিত্ব। তরুণী নাদিয়া এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে খুঁজে পেল তার জীবনের অবলম্বন। দ্রজদভকে জীবনের সঙ্গী করল সে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মোহ দূর হয়ে গেল। নাদিয়ার প্রেমের প্রকাশকে দ্রজদভ উনবিংশ শতাব্দীর মৃত মনোবৃত্তি বলে বাতিল করে দিল। আগে ঘর উঠুক, তারপর তো দেয়ালে ছবি টাঙাবে! এখন ঘর তৈরির সাধনা, শস্তা প্রেমের স্বপ্ন দেখার সময় নয়। দ্রজদভের কোনো বন্ধু নেই। কেননা, বন্ধু শুধু সমপর্যায়ের লোকই হতে পারে। মাজগায় দ্রজদভের সমপর্যায়ের লোক কেউ নেই; সবাই তার উপর নির্ভরশীল। দ্রজদভের মতে—"A man is either a good or a bad builder of communism—a good or bad worker···The main spiritual value in our time is the ability to work well." এই মানদণ্ড দিয়ে দ্রজদভ সকল লোকের বিচার করে। শুধু দ্রজদভ নয়, অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও এই মানদণ্ড গ্রহণ করেছে।

নাদিয়ার গর্ভে এসেছে দ্রজদভের সন্তান। কিন্তু সে ক্রমশঃ স্বামীর কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। আবার মনে পড়েছে লোপাতকিনের কথা। সিয়ানভের মেয়ে স্কুলের ছাত্রী; ছাত্রীর খোঁজ করতে এসে নাদিয়া স্বচক্ষে দেখে গেল লোপাতকিনের সাধনা। লোপাতকিন নতুন করে তার মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করল। নাদিয়াই তাকে গোপন খবর দিল। লোপাতকিন যে-সব নক্‌শা মস্কো পাঠিয়েছিল তা নকল করে সায়েন্টিফিক ইন্‌স্টিট্যুট অব ফাউণ্ড্রি রিসার্চের অন্যতম পরিচালক অধ্যাপক আভদিয়েভ নিজে একটি মেশিনের মডেল তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন। যে টাকা লোপাতকিনের জন্য বরাদ্দ ছিল সে টাকা দিয়ে মাজগার কারখানায় অধ্যাপক আভদিয়েভের পরিকল্পিত মেশিন তৈরি হচ্ছে।

লোপাতকিন শুধু একজনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। সে তার ভূতপূর্ব ছাত্রী জীন্। বড়লোকের মেয়ে, এখন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। শেষ চিঠিতে জীন্ অভিযোগ করেছে যে, লোপাতকিন এতদিন মেশিনের সাফল্য সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়েছে; এখন সে ধরে ফেলেছে সেই প্রতারণা। লোপাতকিন জবাব দিল, তুমি যে এতদিনে ভুল বুঝতে পেরেছ সেজন্য আমি আনন্দিত। সমস্ত জিনিসটা আমার পাগলামি মনে করে ভুলে যেও।

লোপাতকিন বার বার ব্যর্থ হয়েও কিন্তু তার কাজ ভোলেনি। মেশিনের নক্‌শা একটু উন্নত করতে সক্ষম হলেই সে সর্বত্র চিঠি লেখে। সরকারী দপ্তর ও বিজ্ঞান-

প্রতিষ্ঠান তাকে এড়াতে চাইলেও সে কাউকে ভুলে থাকতে দেবে না। নিজে কাজ করছে অক্লান্তভাবে, আর তার পরিকল্পনা সম্বন্ধে কেউ যেন উদাসীন হতে না পারে নিরন্তর এই চেষ্টা করে চলেছে। তার পরিকল্পিত স্বয়ংক্রিয় পাইপ তৈরির কল দেশের মঙ্গল সাধন করবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলেই লোপাতকিন সরকারী মহলের উপেক্ষা সত্বেও হতাশ হয়ে নিজের সাধনা বন্ধ করেনি।

উপমন্ত্রী সুতিকভের চিঠি এল একদিন হঠাৎ। সেদিনই জীনকে চিঠি দিয়েছে তার পাগলামি ভুলে যেতে। সরকার আবার তার মেশিনের পরিকল্পনা পরীক্ষা করে দেখতে আগ্রহান্বিত। প্রথমে জেলার সদরে গিয়ে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ করতে হবে। তারপরে মস্কো। জেলার সদরে অভিজ্ঞ ডিজাইনার দিয়ে লোপাতকিন তার মেশিনের সম্পূর্ণ নক্শা করিয়ে নিল। ডিজাইন-দপ্তরের কর্তা উরিউপিন নানা-ভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। তার ইঙ্গিতে মেশিনের এমন ভুল পরিকল্পনা রচিত হতে যাচ্ছিল যে, লোপাতকিন সতর্ক না হলে বিপদ হত। ঐ দপ্তরের আরাখোভস্কি প্রথম থেকেই তার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আস্থা প্রকাশ করেছে। তারই পরামর্শে কয়েকখানি বই না পড়লে উরিউপিনের ষড়যন্ত্রের নিকট প্রথমেই তাকে হার মানতে হত।

পরিকল্পিত মেশিনের প্রত্যেকটি অংশের বিশদ নক্শা জেলার সদর দপ্তর থেকে করিয়ে লোপাতকিন এল মস্কো। মন্ত্রীর দপ্তরে পেল সহানুভূতিশূন্য ব্যবহার। বিশেষজ্ঞদের বৈঠক বসল তার মেশিনের পরিকল্পনা বিচারের জন্য। যে ইঞ্জিনীয়ার নয়, সামান্য একজন স্কুল শিক্ষক, তার পরিকল্পনার সাহায্যে এমন আশ্চর্য একটি মেশিন তৈরি হতে পারে এ-কথা কারো মনেই রেখাপাত করল না। তার নক্শা নিয়ে সভার মধ্যেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ চলতে লাগল। অধ্যাপক আভদিয়েভ এবং উরিউপিন লোপাতকিনের আইডিয়া চুরি করে মেশিন তৈরির কাজ আরম্ভ করেছে। সুতরাং লোপাতকিনের পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হল যে, এই মেশিন তৈরি করলে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়ই শুধু ঘটবে; পাইপ তৈরি করা যাবে না। কেবল গ্যালিৎস্কি সকলের সঙ্গে একমত হতে পারল না। লোপাতকিন হতাশ হয়ে যখন বেরিয়ে আসছিল তখন গ্যালিৎস্কি বলল, তোমার এ মেশিন চলবে। আশা ত্যাগ করো না, কাজ করে যাও।

পথে বেরিয়ে তার সামনে একটু দূরে দেখতে পেল জীনকে। জীন একা নয়। সৈন্য-বিভাগের একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ ভাবে গল্প করতে করতে পথ চলেছে। মেশিন তৈরির আশা গেল, আর জীনকেও বুঝি হারাল। কিন্তু তবু লোপাতকিন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল না। নিরুপায়ের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল। দীর্ঘ চিঠি পাঠাল সংবাদপত্রে ; জাতির একান্ত প্রয়োজনীয় মেশিনটির পরিকল্পনার কি লাঞ্ছনা হয়েছে কর্তৃপক্ষের হাতে তার দীর্ঘ ইতিহাস। সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে তাকে জানানো হল যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের কাছে এই চিঠি প্রথম পাঠানো হবে তথ্য নির্ধারণের

জন্য। লোপাতকিনের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ-চিঠি কখনো ছাপা হবে না, জনসাধারণ বুঝতে পারবে না পর্দার অন্তরালে কি ঘটছে।

গ্যালিৎস্কি মেশিন নিয়ে কাজ করে যেতে বলেছে। কিন্তু কি করে করবে? মস্কো শহরে থাকার মতো সংগতি নেই তার। বৃদ্ধ অধ্যাপক বাস্কোর সঙ্গে পরিচয় না হলে মস্কো থাকা সম্ভব হত না। তার ইতিহাস শুনে বাস্কো সাগ্রহে নিজের বাড়ি তাকে ডেকে নিলেন। এই নিঃসঙ্গ অধ্যাপকও লোপাতকিনের মতো আবিষ্কারের উন্মাদনায় মত্ত। তাঁর সারাটা জীবন কেটেছে নতুন আবিষ্কারের সাধনায়; লোপাতকিনের মতো তাঁর কথাও উপরওয়ালারা শোনেনি। কিন্তু তার জন্য তাঁর পরীক্ষা বন্ধ হয়নি। একটি পুরনো জীর্ণ ঘরে বাস্কোর সঙ্গে লোপাতকিনও আশ্রয় পেল। দু'জনে মাঝে মাঝে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা কিছু অর্থ উপার্জন করেন; সেই উপার্জনের উপর নির্ভর করে চলে তাঁদের গবেষণা। এক পাশে লোপাতকিন ড্রইং-এর উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, আর এক পাশে বৃদ্ধ অধ্যাপক নানা রকম রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যস্ত। অধিকাংশ দিনই তাঁদের কাটে আলু সেদ্ধ খেয়ে। পোশাক-পরিচ্ছদ প্রায় ভিখারীর পর্যায়ে নেমে এসেছে। এ সব কষ্ট তারা গায়ে মাখে না। বেশ আছে।

একদিন বাইরে থেকে ফিরে লোপাতকিন জানতে পারল একটি তরুণী তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, কোনো পরিচয় না দিয়েই চলে গেছে। ভাবল হয় জীনা, না হয় প্যাভ্‌লভনা। কিন্তু অধ্যাপকের বর্ণনা তাদের সঙ্গে মিলল না। কিছুদিন পরে লোপাতকিন এক অজ্ঞাতনামা প্রেরকের কাছ থেকে একটা প্যাকেট পেল। খুলে দেখল কয়েক হাজার টাকার নোট। সঙ্গে একটি চিরকুট: কমরেড লোপাতকিন, এ-টাকা তোমার, যে-ভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পার।

দ্রজদভ মাজগা থেকে উচ্চতর পদে মস্কো বদলী হয়ে এসেছে। লোপাতকিনের ব্যর্থতার মূলে যে দ্রজদভের খানিকটা হাত আছে, এ-কথা নাদিয়ার মনে সব সময় খোঁচার মতো বেঁধে। স্বামীর সঙ্গে তার মনোমালিন্যটা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। নাদিয়া একদিন লোপাতকিনকে পথে দেখতে পেয়ে তাকে অনুসরণ করে বাড়িটা দেখে গিয়েছিল। নিজের দামী ওভারকোটটা বিক্রি করে সে-ই লোপাতকিনকে সাহায্য করবার জন্যে টাকা পাঠিয়েছে। এর পর সে নিয়মিতভাবে আসতে আরম্ভ করল বাস্কো-লোপাতকিনের আস্তানায়। লোপাতকিনের চিঠিপত্র টাইপ করে দেয়, সেগুলি আবার গুছিয়ে ফাইল করে রাখে, লাইব্রেরি থেকে পাইপ তৈরি সম্বন্ধে বিদেশী পত্রিকার প্রবন্ধের চুম্বক নিয়ে আসে। নাদিয়ার জীবন লোপাতকিনের ভরসায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, হতাশা দূর হয়ে যায়। সে লোপাতকিনের সত্যিকারের কর্মসঙ্গিনী হয়ে উঠেছে। এই আত্মভোলা প্রতিভাধর লোকটির লাঞ্ছিত জীবন সহনীয় করবার জন্য নাদিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দিল।

লোপাতকিন ক্রমাগত স্বয়ংক্রিয় পাইপ তৈরির কলের নক্‌শা উন্নত করবার চেষ্টা করে

চলেছে। তার নতুন মডেলের পরিকল্পনা স্বয়ং মন্ত্রীর ভালো লাগল। তিনি নকশা অনুমোদন করলেন। তারপর থেকে আশ্চর্য দ্রুতগতিতে লোপাতকিনের মেশিনের ভাগ্য আবর্তিত হতে আরম্ভ করল। বিশেষজ্ঞরা এবার তার পরিকল্পনা সমর্থন করলেন। আভদিয়েভ পর্যন্ত এবার লোপাতকিনের পক্ষে রায় দিলেন। এমন আকস্মিক সৌভাগ্যের অন্তরালে কোথাও একটা মস্ত বড় ফাঁকি আছে এই আশঙ্কা লোপাতকিনকে পীড়িত করতে লাগল। তথাপি তার তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনানুযায়ী মেশিন তৈরির কাজ শুরু হতে দেরি হল না। কাজ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর হঠাৎ একদিন সায়েন্টিফিক ইনস্টিট্যুট অব ফাউন্ড্রি রিসার্চের প্রাঙ্গণে পাইপ বোঝাই একটি লরী এসে উপস্থিত হল। অধ্যাপক আভদিয়েভ ও তাঁর সহকর্মীদের পরিকল্পিত মেশিনে তৈরি হয়েছে এই পাইপ। লোপাতকিনের নকশা বহুলাংশে নকল করে তৈরি হয়েছে এই মেশিন। গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে; সুতরাং লোপাতকিনের মেশিন তৈরির কাজ বন্ধ করবার আদেশ হল। সে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল তার মেশিনের উৎকর্ষ কত বেশি; কিন্তু কেউ সে কথা শুনল না। মন্ত্রী আদেশ দিলেন লোপাতকিন যেন আর দপ্তরে না আসে।

কিন্তু লোপাতকিনকে হতাশ হতে হল না। অন্য এক দপ্তর থেকে তাকে মেশিনের কাজ ঠিক আগের মতোই করে যেতে বলা হল। লৌহক্ষয়কারী রাসায়নিক পদার্থ পাইপের মধ্য দিয়ে গেলেও ক্ষতি হবে না এমন নতুন ধরনের পাইপ তৈরির কথা লোপাতকিন বলেছিল। আইডিয়াটা এনেছিল নাদিয়া লাইব্রেরিতে একটি পত্রিকা পড়ে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এ-রকম পাইপের গুরুত্ব আছে। লোপাতকিনকে আদেশ দেওয়া হল যে, মেশিন ও পাইপ তৈরির সকল ব্যাপার থাকবে একান্ত গোপনীয়। নাদিয়া তার আপিসে আসত তাকে সাহায্য করতে। লোপাতকিনের শত্রুরা ওৎ পেতে ছিল। তারা অভিযোগ করল রাষ্ট্রের গোপন তথ্য সে অনধিকারী নাদিয়ার নিকট প্রকাশ করেছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে লোপাতকিনের আট বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। নাদিয়ার কাছে তার কিছুই গোপন নেই, সে যে প্রথম থেকেই সব কিছুই জানে—সে কৈফিয়ৎ আদালতে গ্রাহ্য হল না। সব ব্যাপারটাই যেন সাজানো। লোপাতকিন দীর্ঘকাল যাবৎ মেশিনের যত নকশা করেছে সেই সব কাগজ কর্তৃপক্ষের আদেশে পুড়িয়ে ফেলা হল। লোপাতকিনের একজন অনুরক্ত সহকর্মী শুধু একটা মোটা ফাইল সকলের অলক্ষ্যে রক্ষা করতে পেরেছিল।

বিচারপতিদের মধ্যে একজন—বেদিন—লোপাতকিনকে দোষী বলে মনে করতে পারেননি। এই ফাইল যখন তাঁর হাতে পড়ল তখন তিনি সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করতে আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে স্তালিন আমল শেষ হয়েছে। নাদিয়া এবং মাজগা থেকে প্যাভ্‌লভনা ও সিয়ানভ আদালতে লোপাতকিনের মুক্তির জন্য আবেদন করেছে। আর এদিকে গ্যাৎসকিল ফাইলে লোপাতকিনের পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ পেয়ে সেই অনুযায়ী মেশিন তৈরি করে ফেলেছে। তার অসুবিধা নেই, সে এখন খুব বড় একটা ফ্যাক্টরির অধিকর্তা। আভ্‌দিয়েভের মেশিনে পাইপ তৈরির ফল লোকসানে গিয়ে

দাঁড়িয়েছে। লোহার পরিমাণ খুব বেশী লাগছে। কাঁচা মালের এই বিপুল ক্ষতিকে গোপন করবার সাহস মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী কারোরই হল না। সুতরাং আভদিয়েভের মেশিন বাতিল হয়ে গেল, সাদরে গৃহীত হল লোপাতকিনের মেশিন। আদালতের পুনর্বিবেচনায় লোপাতকিন নির্দোষ বলে প্রমাণিত হল। দেড় বছর পরে সাইবেরিয়া থেকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনা হল লোপাতকিনকে। তার মেশিনের কর্মক্ষমতা দেখে সবাই মুগ্ধ। প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে লোপাতকিন উচ্চ পদ লাভ করল।

অধ্যাপক বাসকো লোপাতকিনের এই সৌভাগ্য দেখে যেতে পারলেন না। চরম হতাশার মধ্যে তাঁর আগেই মৃত্যু হয়েছে। জীন সেই ক্যাপ্টেনের সংগে জীবনের পথ বেছে নিয়েছে। দ্রজদভের সংগে নাদিয়ার বিচ্ছেদটা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে; ছেলেকে নিয়ে সে পৃথকভাবে বাস করে। লোপাতকিনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। লোপাতকিন নাদিয়াকেই সংগিনী হিসাবে গ্রহণ করল। সে তার নর্মসংগিনী ও কর্মসংগিনী—দুই-ই হতে পারবে। লোপাতকিনের সামনে রয়েছে অনেক কাজ।

এই কাহিনীতে লোপাতকিনের পরিকল্পিত মেশিনটি একটি প্রধান চরিত্র। মেশিনের বিবরণ গল্পের গতি ক্ষুণ্ন করেনি। বরং মেশিন গৃহীত হবে কি হবে না এই উৎকণ্ঠায় পাঠক সাগ্রহে এগিয়ে চলে। রাশিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি অবাস্তব ধারণা নানা কারণে আমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে। এই উপন্যাস পড়ে তার অনেকগুলি পরিবর্তিত হবে। নাদিয়া উচ্চপদস্থ ব্যক্তির স্ত্রী; সুতরাং সে যখন হাসপাতালে গেল তখন তার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হল। তাকে একটি পৃথক্ ঘর দেবার জন্য অন্য রোগীদের বের করে প্যাসেজে রাখতে হয়েছে। রাশিয়াতেও ব্ল্যাকমার্কেট আছে। এই কাহিনীতে এমন লোকের সাক্ষাৎ পাই যাদের শুধু আলুসেদ্ধ খেয়ে দিন কাটাতে হয়। অনেকে অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পুত্র-কন্যাদের পরীক্ষায় বেশি নম্বর না দিলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সমালোচনা হয়। সেখানকার শিক্ষকদেরও আক্ষেপ করে বলতে হয় যে, ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই ভালো—শুধু শিক্ষকরাই খারাপ। মন্ত্রী-দপ্তরের সহানুভূতিশূন্যতা, লালফিতার দীর্ঘসূত্রতা—এসব আমাদের পরিচিত। আর রয়েছে দলগত স্বার্থচক্র। দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরাও নতুন প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত। কোনো সম্মেলনে একজন বিশেষজ্ঞ নিমন্ত্রিত হলে আর একজন আসবেন না—পরস্পরের প্রতি এমন ঈর্ষা। বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে ছিল লোপাতকিনের সংগ্রাম। সঙ্ঘবদ্ধ বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে একক প্রতিভার লড়াই। তাই দ্রজদভ তাকে উপদেশ দিয়ে বলেছে,—'Your mistake consists in being an individual on his own. The lone wolf is out of date. Our new machines are the fruit of collective thought.'

এই সব ত্রুটির মূলে রয়েছে মানবমনের স্বাভাবিক দুর্বলতা। এর হাত থেকে রাশিয়ার জনসাধারণও মুক্ত হতে পারেনি। আরাখোভস্কি একদিন লোপাতকিনকে

বলেছিল, 'দেখ, অবলীলাক্রমে পাথর ফুটো করবার যন্ত্র আমরা আবিষ্কার করেছি ; কিন্তু মানুষের হৃদয় যে বাধা সৃষ্টি করে তা দূর করবার মতো যন্ত্র আজো আবিষ্কৃত হয়নি।' সত্যি তাই। রাশিয়া শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারে, ধন-বন্টনে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করতে পারে, কিন্তু মানুষের হৃদয়কে ভেঙে নতুন করে গড়বার মতো ক্ষমতা রাশিয়া কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রেরই নেই।

তথাপি একটা আশার পরিবেশের মধ্যে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। একদল লোকের সাক্ষাৎ পাই যারা হৃদয়বান, যারা অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। নাদিয়া হাসপাতালে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেছে। প্যাভলভ্না, সিয়ানভ্, নাদিয়া, গ্যালিৎস্কি, বাস্কো প্রভৃতি অকুণ্ঠভাবে লোপাতকিনকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। আদালতের বিচারকরাও তাঁদের ভুল সংশোধন করতে দ্বিধা করেননি। সর্বোপরি, লোপাতকিনের জয়ের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের শুভ বুদ্ধির জয় সূচিত হয়েছে। যাঁরা রাশিয়ার বিরূপ সমালোচনা আছে বলে বইটি সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করেছেন, তাঁদের বিচারে ত্রুটি আছে। যেভাবে লোপাতকিন ও তার সমর্থকরা জয়ী হল তা রাশিয়ার বাইরে অন্য কোথাও হতে পারত কিনা আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত করে কাহিনী সমাপ্ত হয়। অবশ্য লোপাতকিনের জয় সম্ভব হয়েছে স্তালিন আমলের পরে ; এর মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম প্রচারকার্য আছে কিনা জানি না। তবে প্রচারের কোনো ছাপ লেখকের শিল্পকলাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

শ্রীমতী পার্ল বাকের নবতম উপন্যাস Come, My Beloved ভারতের পটভূমিকায় রচিত। পার্ল বাক এসিয়াবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি চিরদিনই সহানুভূতিশীল এবং তাঁর এই সহানুভূতি নিষ্ক্রিয় নয়। তাদের কথা বলবার জন্য তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সমিতি গঠন করে আমেরিকায় তা প্রচারের ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু এসিয়ার কথা য়ুরোপ-আমেরিকায় প্রচারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে তাঁর চীনা-জীবন নিয়ে লেখা অপূর্ব উপন্যাসগুলি। বর্তমান কাহিনীতে ভারতীয় নর-নারীর ছবি প্রাধান্য লাভ করেনি,—যেমন করেছে চীনা নরনারী 'গুড আর্থ' প্রভৃতি উপন্যাসে। তার কারণ লেখিকা চীনকে যেমন করে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন ভারতীয় সমাজকে জানবার সে সুযোগ তাঁর হয়নি। তিনি ভারতের সমগ্র সত্তাকে পটভূমিকারূপে, কোথাও বা একটি জীবন্ত চরিত্র হিসাবে, এঁকেছেন। নায়ক-নায়িকা বিদেশী। ভারত তাদের জীবনকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তারই কাহিনী বলেছেন লেখিকা। গল্প পড়বার সময় যদিও চরিত্রগুলি মন আকৃষ্ট করে রাখে, তবু পড়া শেষ হয়ে গেলে মনে হয় নায়ক-নায়িকা কেউ নয়, এই উপন্যাসের একমাত্র চরিত্র হলো ভারতবর্ষ। আমাদের জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি এখানে নেই, দূর থেকে লেখিকার পক্ষে সে ছবি আঁকা সম্ভবও নয়; কিন্তু লেখিকা যে কত যত্নের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস এবং সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তা বোঝা যায়। তিন শ' পৃষ্ঠার মধ্যে দু'একটি সামান্য অসংগতি ছাড়া ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি একটিও নেই।

আমেরিকার সুবিখ্যাত ধনী ম্যাকার্ড পরিবারের তিন পুরুষের সংগে ভারতের সম্পর্কটাই এই কাহিনীর উপজীব্য। কোটিপতি ব্যবসায়ী ডেভিড হার্ডওয়ার্থ ম্যাকার্ড স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর ভ্রমণে বেরিয়েছে। সংগে একমাত্র পুত্র ডেভিড; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টাটকা গ্র্যাজুয়েট। পিতাপুত্র ঘুরতে ঘুরতে এলো বোম্বাই শহরে। উঠল গ্র্যান্ড হোটেলে। নিজেদের ঘরে এসে বসতে-না-বসতেই হোটেলের মুসলমান বেয়ারা সাবধান করে দিয়ে গেল, খবরদার সাহেব, হিন্দুরা বড় ঠক, ওদের হাত থেকে সাবধান। সেটা ১৯০০ সাল কিংবা তারও কয়েক বছর আগের কথা। তখনও বোম্বাই সহরে গরুর গাড়িতে লোক যাতায়াত করে। রাস্তায় শুধু পুরুষদের দেখে ডেভিড বাবাকে বলল, মেয়েরা বোধ হয় পর্দানশীন, অথবা অন্য কোন কারণে তারা পথে বের হয় না। আমেরিকার এত বড় ধনী ভারতে এসেছে সে কথা বড়লাটের কানে গেল। তিনি ম্যাকার্ডকে চা-এর নিমন্ত্রণ করলেন। কাহিনীর স্থান পুণা অঞ্চলে, সুতরাং গল্পের প্রয়োজনে বড়লাটের আবাসস্থল বোম্বাইতে দেখানো হয়েছে। হোয়াইট হাউসের সংগে ম্যাকার্ড পরিচিত; বড়লাটের প্রাসাদ তার চেয়ে জমকালো।

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের নগ্ন মূর্তি ম্যাকার্ডকে বিস্মিত করল। দারিদ্র্যের চেয়েও বড় আঘাত দিল নিষ্ক্রিয়তা। ভারত সরকার, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি—সকলেই যেন নিষ্ঠুর দারিদ্র্যকে সহজরূপে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছে, সংগ্রাম ঘোষণা করেনি তার বিরুদ্ধে। আর ধর্মের নামে এখানে কুসংস্কারের রাজত্ব চলেছে। এর প্রভাবে ভারতবাসীরা উদ্যম হারিয়েছে, পশুর মতো জীবন যাপন করেও তাদের মুখে অতৃপ্তির কুটিল রেখা ফুটে ওঠে না। একদিন মাঠের পথ দিয়ে যেতে যেতে পায়ের কাছে পড়ল একটা গোখরো সাপ। ম্যাকার্ড বেতের ছড়িটা তুলে নিল, কিন্তু বাধা এল দেশীয় পথপ্রদর্শকের কাছ থেকে। সে দু'হাত যুক্ত করে প্রার্থনা করতে লাগল পথ ছেড়ে দেবার জন্য ; সাপ কারো ক্ষতি না করে ধীরে ধীরে চলে গেল। এই ঘটনা ম্যাকার্ডের মন আরো গভীরভাবে আলোড়িত করল। এদেশের ধনীরা আত্মসুখে মগ্ন, দরিদ্রের দুঃখ বোঝে না। এদের দুঃখ লাঘবের জন্য আমেরিকার কিছু করা কর্তব্য। ভারতের পক্ষে এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এমন এক ধর্ম যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় ; যে ধর্ম উদ্বুদ্ধ করবে সেচব্যবস্থার উন্নতি করতে, দেশের সর্বত্র রেল লাইনের জাল ফেলতে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে। ভারতকে আমেরিকা সেই ব্যবহারিক ধর্ম উপহার দেবে। আমেরিকার তরুণরা ভারতে নিয়ে আসবে সেই নতুন খ্রীস্টধর্মের পতাকা।

এই পরিকল্পনার বীজ নিয়ে ম্যাকার্ড ফিরে এলো নিউইয়র্কে। টাকার অভাব নেই ; পরিকল্পনা দ্রুত কার্যকর করবার জন্য কাজ শুরু হলো। স্থাপিত হবে লীলা ম্যাকার্ড স্কুল অব থিয়লজি, স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষা হবে এবং অবনত দেশেরও উপকার হবে। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা গ্র্যাজুয়েটরাই কেবল এখানে স্থান পাবে। শহরের বাইরে মনোরম পরিবেশে জায়গার সন্ধান চলছে, নতুন বাড়ি উঠবে ; ধীরে ধীরে একদিন হয়তো তা নগরে পরিণত হবে। একদিন ডেভিড উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে দেখা পেল ওলিভিয়ার। চমৎকার জায়গায় ওলিভিয়াদের প্রকাণ্ড বড় বাড়ি। শুধু মা ও মেয়ের এত বড় বাড়ির দরকার নেই। ওরা বাড়ি বিক্রি করে দিতে চায়। ডেভিডের পছন্দ হলো, তার বাবারও ভালো লাগল বাড়িটা। সুতরাং লীলা ম্যাকার্ড স্কুল অব থিয়লজির জন্য কেনা হয়ে গেল। ম্যাকার্ডের উদ্দেশ্যের কথা জেনে পৈতৃক বাড়িটা হাতছাড়া করবার বেদনা থেকে অনেকটা মুক্তি পায় ওলিভিয়া। তার ঠাকুর্দাও ভারতে গিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের তত্ত্বকথা জানতে। মনে পড়ে ছেলেবেলায় ঠাকুর্দার কাছে কত অদ্ভুত গল্প শুনেছে ভারত সম্বন্ধে। ভারতের সঙ্গে তার কি যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্র আছে !

ডেভিড কোটিপতির একমাত্র বংশধর, কিন্তু বিলাসিতা ও যৌবনের চাপল্য তাকে স্পর্শ করেনি। কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি তার। ওলিভিয়ার মধ্যে কী জাদু ছিল,- ডেভিড মুগ্ধ হলো, ভালোবাসল তাকে। ওলিভিয়া বলল, "আমেরিকার যে কোনো মেয়ে তোমাকে ভালোবাসতে পারত, কিন্তু আমি পারি না।"

"কেন ?"

"কারণ বোধ হয় তোমার মধ্যে সে শক্তির স্ফুরণ নেই যা আমি স্বামী হবার যোগ্যতা বলে মনে করি। আমি স্বামীর উপর নির্ভর করে জীবন কাটাতে চাই। তোমাকে নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। তুমি ধনী পরিবারের ছেলে, এটুকুই তোমার একমাত্র পরিচয়।"

এতবড় বেদনা ডেভিড আর পায়নি। মার মৃত্যুতেও না। তার বেদনাক্লিষ্ট মনে সহসা ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জর নরনারীর মিছিল ভেসে উঠল। নিজের বেদনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাদের বেদনা। সঙ্কল্প স্থির হতে দেরি হলো না। মিশনারী হয়ে সে ভারতে যাবে, সেবা করবে ওদের। ম্যাকার্ড শুনে বলল, "তুমি আমার একমাত্র ছেলে, তুমি কেন যাবে সেই সাপ-বাঘ, মহামারীর দেশে ? আমিই তো ব্যবস্থা করছি টাকা দিয়ে দলে দলে মিশনারী পাঠাবার।" কিন্তু ডেভিড সঙ্কল্পচ্যুত হলো না। পিতার সকল অনুরোধ অগ্রাহ্য করে জাহাজে উঠল। ধর্ম নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিল ম্যাকার্ড। একমাত্র ছেলের উপর দিয়ে ধর্ম তার প্রতিশোধ নিল। লীলা ম্যাকার্ড স্কুলের পরিকল্পনা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নতুন কেনা বাড়িতে ম্যাকার্ডের আর একটি ফ্যাক্টরী স্থাপিত হলো।

ডেভিড পুণার এক খ্রীস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দিল। তার সহকর্মী মিঃ ফর্ডহাম সপত্নীক মিশন বাড়িতেই থাকে। ডেভিডও সেখানে স্থান পেল। পুণায় আছে তার এক পুরানো মারাঠী বন্ধু দরিয়া। দরিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল লন্ডনে। এই বিদেশে পুরাতন বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হলো। ডেভিড এসেই সংস্কৃত ও মারাঠী শিখতে আরম্ভ করেছে। তার ঘরের দেয়ালে উপনিষদের সেই অমর বাণী—'অসতো মা সদ্গময়ো, তমসো মা জ্যোতির্গময়' ইত্যাদি লেখা। মুখ তুললেই চোখে পড়ে। দেশের লোকের একজন হবার জন্য তার সাধনার অন্ত নেই। প্রচণ্ড গরমে ফর্ডহাম-দম্পতি যখন শৈলাবাসে চলে যায়, তখনো ডেভিড পুণায় থাকে। ভারতীয়দের যদি এই গরম সহ্য হয় তাহলে তারও হবে। সে স্বপ্ন দেখে, স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে, তারপর কলেজ, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল। ডেভিড শত শত খাঁটি মানুষ তৈরি করবে, তারা ছড়িয়ে পড়বে দেশের সর্বত্র, উন্নত করবে দেশকে। শ্রীমতী ফর্ডহাম বলে, কিন্তু এতে ধর্ম কোথায় ? ধর্ম না থাক, সেবা আছে। মিঃ ফর্ডহাম-বিষয়ী লোক। প্রশ্ন করল, টাকা কোথায় পাবে ?—মা টাকা রেখে গেছেন আমার নামে, ডেভিড বলল, টাকার জন্য ভাবনা নেই।

দরিয়ার সঙ্গে ওলিভিয়ার কথা হলো। বন্ধুর পরামর্শে চিঠি দিল ওলিভিয়াকে। লিখল, আমি এখনো তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি। কী আশ্চর্য, এতদিন পরে ওলিভিয়া ডেভিডের আহ্বানে সাড়া দিল। নিউইয়র্ক থেকে চলে এল পুণায় এক মিশনারী সাহেবের বৌ হতে। দেখল, কত বদলে গেছে ডেভিড, এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় তার উপর। কয়েকদিনের মধ্যে ওলিভিয়ার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিল।

নিউইয়র্কের মেয়ে,—কত ভয় ছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। এখন আর ভয় করে না। কোন এক অদৃশ্য জাদুমন্ত্রে ভারত তাকে আপন করে নিয়েছে। শুধু তাকে নয়, ডেভিডকেও। তাদের গায়ের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে উঠেছে; এখানকার রোগ-শোক দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। জলবায়ুর গুণে দেহ ও জীবনযাত্রায় এসেছে শিথিলতা। নিউইয়র্কের আলো-ঝলমল নাচের আসরের কথা মনে পড়লে এখন ওলিভিয়ার হাসি পায়।

ওলিভিয়া বুঝি এদেশকে ভালোবেসে ফেলেছে। গভর্নরের বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ; জনসাধারণকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখবার জন্য মিশনারীদের সাহায্য প্রয়োজন, আবার মিশনারীদের কাজ চালাবার জন্যও সরকারের সহায়তা দরকার। তার উপর ডেভিড বিশ্ববিখ্যাত ধনী-পরিবারের ছেলে। ছোটলাট-বড়লাটের বাড়ি থেকে প্রায়ই আমন্ত্রণ আসে। চায়ের আসরে ছোটলাট সেদিন বলছিলেন, এদেশের চার-পঞ্চমাংশ লোকই নিরক্ষর ও অজ্ঞ; আজও এরা স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত হয়নি।

সহসা ওলিভিয়া বলে উঠল, কিন্তু লাটবাহাদুর, আমি ভেবে আশ্চর্য হই যে আপনাদের মতো সভ্য সাম্রাজ্যের অধীনে থেকেও আজ এদের এমন অবস্থা কেন?

সাম্রাজ্যভক্তদের জমায়েতে যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। বুদ্ধিমানরা অন্য কথা পেড়ে প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করল।

ওলিভিয়া ডেভিডের জীবনে নতুন বাঁক রচনা করেছে। প্রেম মাঝে মাঝে কর্তব্য ভুলিয়ে দেয়। ওলিভিয়ার স্পর্শ থেকে পালিয়ে এসে প্রার্থনা করতে বসে: ওলিভিয়ার জন্য ভারতকে যেন না ভুলি, ভগবান! ভারতের সেবা ঈশ্বরের কাজ; তার প্রেমেরও ঊর্ধ্বে ভারতবর্ষের স্থান। ওলিভিয়া কলহ করে না। বলে, আমি ছেলে-মেয়ে ঘর-সংসার নিয়ে থাকব, তুমি থেকো তোমার ব্রত নিয়ে।

ডেভিড দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে এসে দাঁড়ায় দুর্গতদের পাশে। কিন্তু বিপুল সমস্যা, একা সে কি করবে? বড়লাট বলেন, দুর্ভিক্ষটা এদেশে ক্রনিক রোগের মতো। ডেভিড প্রশ্ন করে, চিরকালই তা থাকবে কেন? এর কি প্রতিকার নেই? প্রতিকার?—বড়লাট হাসেন। সকল সমস্যার মূলে অবিশ্বাস্য জন্মহারটা। যে হারে লোক বাড়ছে তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল সম্পদ্ দিয়েও এদের ক্ষুধা মেটানো যায় না।

ডেভিড জানে দরিয়া একথার কি উত্তর দিত। দরিয়া বলে, লোকবৃদ্ধির যুক্তিটা গভর্নমেন্ট উপস্থিত করে তাদের অক্ষমতা বা অনিচ্ছা ঢাকবার জন্য। আমাদের গড়ে পরমায়ু ২৭ বছর, আমাদের শতকরা পঞ্চাশটি শিশু এক বছর পূর্ণ না হতেই মারা যায়; জন্মের হার বেশি না হলে এতদিনে আমরা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। নিছক টিঁকে থাকবার জন্যই আমাদের সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন।

ওলিভিয়ার কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে এলো; নাম রাখল থিয়োডোর। ওলিভিয়া থাকে ছেলে নিয়ে, ডেভিড তার কাজে মগ্ন। হঠাৎ বোম্বাই শহরে প্লেগ আরম্ভ হলো, দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল পুণা এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। দরিয়ার স্ত্রী,

পুত্র, কন্যা সব হারিয়ে গেল প্লেগের নির্মম কবলে। মিশন হাউসে হানা দিয়ে প্লেগ নিয়ে গেল ওলিভিয়াকে। সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে দরিয়া পথে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ডেভিড বাঁধা পড়ে রইল কাজের চাকায়। তা ছাড়া সে তো দরিয়ার মতো রিক্ত হয়ে যায়নি ; তার ছেলে আছে। তাকে মানুষ করে তুলতে হবে।

থিয়োডোর আমেরিকার শিক্ষা সমাপ্ত করে ভারতে ফিরে আসছে স্বেচ্ছায়। ডেভিড লিখেছিল, ইচ্ছা হয়তো আমেরিকায় থেকে যেও। বুড়ো ঠাকুর্দা ম্যাকার্ডেরও তাই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বাধা দিল না ; বলল, দ্বিতীয়বার তো আঘাত লাগে না ; তুমি যাও। পিতৃবন্ধু দরিয়া প্রায়ই চিঠি লেখে। জানিয়েছে, যে ভারতকে তুমি দেখে গেছ, সেই ঘুমন্ত ভারত আর নেই। সে জেগে উঠছে ধীরে ধীরে, নতুন ভারতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন গান্ধী। প্রত্যেক চিঠিতেই থাকে গান্ধীর কথা। তাঁকে জানবার জন্য থিয়োডোরের কৌতূহলের শেষ নেই। আমেরিকা তার দেশ নয়, ভারতের সঙ্গে তার নাড়ীর বন্ধন। প্রথম সে চোখ মেলেছে ভারতবর্ষের আলোয়, বুকে টেনে নিয়েছে সে দেশের বাতাস। আর কী মমতা, স্নেহ, ভারতের লোকগুলির ! তার বাবা বাইরে চলে যেতেন নানা কাজে, কিন্তু সে কোনোদিন মা'র অভাব বুঝতে পারেনি। থিয়োডোর কৃতজ্ঞ, সে ভারতকে ভুলতে পারে না।

জাহাজে আলাপ হলো বাঙলা দেশের গভর্নরের মেয়ে অ্যাগনিসের সঙ্গে। পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলো দু'জনে। অ্যাগনিস দেখল স্বামী হিসেবে থিয়োডোর লোভনীয়। নিউইয়র্কের এতবড় ধনী-পরিবার ; তাছাড়া ডঃ ডেভিডও ভারতবর্ষে স্বনামধন্য লোক, গভর্নমেন্টের কাছে অত্যন্ত সমাদর। কিন্তু বিপদ হলো যখন থিয়োডোর কথায় কথায় একদিন গান্ধীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করল। হৃদয়ের ব্যাপারেও ইংরেজ-দুহিতা হিসাবের কথা ভোলে না। গান্ধীর নাম শুনে তাড়াতাড়ি মন গুটিয়ে নিল অ্যাগনিস। কিন্তু থিয়োডোরকে কিছুই বলল না।

থিয়োডোর বোম্বাই পৌঁছবার দু'দিন পূর্বে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন উপলক্ষে দরবার হয়ে গেল। সে দরবারে ডেভিডের নিমন্ত্রণ ছিল। ডেভিড আজকাল গভর্নমেন্টের সমর্থক। সে বড়লাটের মতো বিশ্বাস করে ভারত এখনো স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করেনি ; উপযুক্ত হলেই স্বাধীনতা পাবে। ডেভিড ভারত-বাসীদের যোগ্য করে তোলবার কাজই হাতে নিয়েছে। দরিয়া চলে গেছে অন্য পথে ; স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বস্ব পণ করেছে সে। দরবারের প্রতিবাদ করায় তার জেল হয়েছে।

থিয়োডোর এবার ফিরে এসে গান্ধীর অস্তিত্বটা বড় বেশি করে অনুভব করতে লাগল। সকলের মুখে গান্ধীর নাম। সরকার পক্ষের সাহেবরা তাঁর নিন্দা করে, ভারতীয়রা শ্রদ্ধায় নত হয়। ডেভিডের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরে কিছু না বললেও অন্তরে তারা গান্ধীর ভক্ত। ডেভিড তাদের মন ফেরাতে পারে না।

থিয়োডোর জানতে চাইল, "বাবা, তুমি গান্ধীকে দেখেছ ?"

"দেখেছি দূর থেকে। কালো কুচ্ছিৎ বৈশিষ্ট্যহীন একটা লোক। দরিয়া কি দেখেছে তার মধ্যে সে-ই জানে।"

"আমার গান্ধীর সংগে একবার আলাপ করতে ইচ্ছা হয়।"

ডেভিড চমকে উঠলো ; বলল, "আমার উপদেশ যদি শোন তাহলে গান্ধী এবং তাঁর রাজনীতি থেকে দূরে থেকো।"

ভারতের সর্বত্র শত শত লোক জেলে যাচ্ছে ; পাঞ্জাবে ও'ডায়ারের গুলিতে নিরীহ নরনারী প্রাণ দিল। কারো জেলের ভয় নেই। মাটির কুটির, নেংটির এক টুকরো কাপড় ; এক মুঠো চাল বা গম এবং সাতাশ বছরের পরমায়ু। সুতরাং কিসের ভয় ? জেল বরং ভালো। যে লোকটি ভয় ভাঙ্গালো তাঁর অশরীরী অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। থিয়োডোরের মনে উম্মাদনা জাগে ; চুপ করে থাকতে ভালো লাগে না, কিছু একটা করা চাই। দরিয়ার সংগে দেখা করতে গেল জেলে ; দরিয়া বলল, "গ্রামে যাও, সেখানে কাজ করো।' গান্ধীর কথা উঠলে দরিয়া বলল, 'যে লোক নিঃশেষে ত্যাগ করতে পারে, তার মত যা-ই হোক, তার উপর নির্ভর করা যায়। গান্ধী সেই জাতের লোক।"

বিদায় নেবার আগে থিয়োডোর জিজ্ঞাসা করল : "দরিয়া জ্যেঠা, কি আশা নিয়ে তুমি জেলে আছ ?"

দরিয়ার দুই চোখ দীপ্ত হয়ে উঠলো, বলল, "এই আশা নিয়ে আছি যে একদিন আমরা স্বাধীন হবো, নিজের পায়ে দাঁড়াব, জমির মালিক হবো, নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করব এবং পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা স্বচ্ছন্দে আত্মসম্মান নিয়ে জীবনযাপন করব। একদিন তা দেখে যাব। দেখব, কংকালসার দেহগুলি মাংসপুষ্ট হয়েছে, ক্ষুধাক্লিষ্ট শিশুদের কান্না আর শুনব না—কারণ তাদের মুখে খাদ্য তুলে দিতে পারব।"

থিয়োডোর চলে এলো কলকাতায়, অ্যাগনিসের সংগে শেষ বোঝাপড়া করতে। দুজনের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়াল ভারতবর্ষ। অ্যাগনিস সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী, থিয়োডোর ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে আস্থাশীল। শুধু তাই নয়, সে সক্রিয়ভাবে এর জন্য কাজ করবে। থিয়োডোর কলকাতা থেকে পুণা ফিরে এল মধ্যবর্তী গ্রামগুলি দেখে দেখে। সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে তার। গ্রামে গিয়ে সেবাকেন্দ্র খুলবে। ডেভিড গভীর দুঃখ পেল ; ছেলেকে ঘিরে তার কত আশা ছিল। কিন্তু থিয়োডোর অটল। মনে পড়ল সে-ও তার ব্যবাকে এমনি বেদনা দিয়েছে।

থিয়োডোর উত্তরপ্রদেশের ভাঙ্গী নামে ছোট্ট একটি গ্রাম বেছে নিল কর্মকেন্দ্ররূপে। গ্রামের লোকেদের সে লেখা-পড়া শেখায়, রোগে ওষুধ দেয়। আধুনিক সভ্যতার সম্পর্কহীন এই গ্রামে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল থিয়োডোর। ডেভিড তখনো আশা ছাড়েনি। ভাবল, অ্যাগনিসের সহায়তায় থিয়োডোরকে ফিরিয়ে আনবে। পত্রালাপ করল, দেখা করল অ্যাগনিসের সংগে। আর আশ্চর্য, পুত্রের জন্য ওকালতি করতে

গিয়ে পিতা প্রেমে পড়ে গেল ; বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্না অ্যাগনিস তরুণ পুত্রকে ত্যাগ করে পরিণত বয়স্ক পিতাকে পতিত্বে বরণ করল। নব-দম্পতি চলে গেল নিউইয়র্ক। তরুণী বধূর পদতলে ভারতসেবার সাধু সংকল্প ডেভিড চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিল।

থিয়োডোরের পরিচর্যায় ভাঙ্গী গ্রাম ধীরে ধীরে নতুন রূপ গ্রহণ করছে। কত নেতা দেখতে আসেন তার গ্রাম। ভারত স্বাধীন হবার পর কথা হলো এর আদর্শে ভারতের অন্য গ্রামগুলি গড়ে তুলতে হবে। দরিয়া তার কাজ দেখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করেছে। থিয়োডোর দেখেছে গ্রামের লোক গান্ধী ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারেনি। আর আর নেতারা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, জেল খেটেছে, কিন্তু কোথায় যেন একটা দূরত্ব থেকে যায়, যার জন্য একাত্মবোধ সম্ভব হয়না। থিয়োডোর এক হতে পেরেছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ; এইটে তার মস্ত বড় তৃপ্তি। প্রথম যখন এলো তখন রাত্রিবেলা এ-গ্রামের উপর গাঢ় ঘুম নামত না ; ভারতের কোনো গ্রামেই নামে না। অর্ধভুক্ত বয়স্করা বিছানায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে মাত্র ; ক্ষুধার জ্বালায় শিশুরা সারারাত ট্যাঁ ট্যাঁ করে ; তার উপর আছে মশা, বিছা ও মাকড়সার উপদ্রব ; ভাঙা বেড়া দিয়ে হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয়। গাঢ় ঘুম আসা সম্ভব ছিল না। এখন সে অনুভব করে ভাঙ্গী গ্রামের উপর প্রগাঢ় নিদ্রা নেমে আসতে শুরু করেছে, মনটা খুশিতে ভরে ওঠে।

স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট কত কী! থিয়োডোর তার স্ত্রীর সাহায্যও পেয়েছে এসব গড়ে তুলতে। পুণার মিশনারী ফর্ডহামের মেয়ে রুথের চিঠি পেল একদিন। লিখেছে ঃ আমি ভারতবর্ষের মেয়ে ; এদেশে জন্ম হয়েছে, এ-দেশকে নিজের বলে জেনেছি। তোমার ব্রতের সঙ্গিনী করে নাও আমাকে।

থিয়োডোরের মনে পড়ল বাইবেলে সলোমনের গান ঃ

> Come, my beloved, let us go forth into the field,
>
> Let us lodge in the villages.

রুথকে বিয়ে করে নিয়ে এল। দু'জনে মিলে গ্রাম সাজাল, নিজেদের ঘর সাজাল। এলো ছেলে-মেয়ে। তাদের বড় মেয়ে লিভিকে উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য বয়সের চেয়ে বড় দেখায়। প্রথম মাকে, তারপর বাবাকে লিভি জানাল সে হাসপাতালের ডাক্তার যতীন দাসকে বিয়ে করতে চায়। থিয়োডোরের মুখ কালো হয়ে গেল। সে ভারতবর্ষের জন্য সব ত্যাগ করেছে, কিন্তু ভারতীয়দের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কল্পনার বাইরে। লিভি আপত্তির কারণ বুঝে উঠতে পারে না। সে আমেরিকা দেখেনি ; এটাই তার দেশ ; এখানকার লোকেরা তার বন্ধু। যতীনের কত প্রশংসা শুনেছে এতদিন বাবার মুখে, তবে এখন কেন অসম্মতি ?

স্বামী-স্ত্রী ঠিক করল প্রথম জাহাজেই তারা আমেরিকা যাবে, লিভিকে দেবে কলেজে ভর্তি করে ; তারপর কোথায় হারিয়ে যাবে কোন এক নগণ্য যতীন দাস ! কিন্তু লিভিকে

সহজে ঠেকানো গেল না। গভীর রাত্রিতে সে চলে যায় হাসপাতালের ব্যাচেলার্স কোয়ার্টারে। যতীনকে বলে, "তুমি আমাকে যেতে দিও না, জোর করে ধরে রাখ।" কিন্তু ভারতবর্ষের মতোই যতীন কেবল আকৃষ্ট করে, জোর করে ধরে রাখতে জানেনা। কয়েকটা রাত স্বপ্নের মত কেটে গেল। আমেরিকা যাবার আগের দিন যতীন বলল, "যদি ছেলে হয় কাউকে দিয়ে দিও।" লিভি বলল, "ছেলেকে সে রাখবে, ওই ছেলেই তার ভরসা।"

ম্যাকার্ড ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে; ডেভিডও ভারত ত্যাগ করেছে, এবার চলল থিয়োডোর। অথচ তারা তো ভারতের মঙ্গল ব্রত নিয়েছিল, কষ্টও সহ্য করেছে। কিন্তু নিঃশেষে ত্যাগ করতে পারেনি কেউ। ম্যাকার্ড ও ডেভিড তাদের ছেলেকে উৎসর্গ করতে পারেনি, থিয়োডোর পারেনি রক্তের আভিজাত্যবোধ ত্যাগ করে লিভিকে দান করতে। এরা যেন উচ্চাসন থেকে ভারতকে দয়া করতে এসেছিল। তাই ভারত তাদের নিজের বলে গ্রহণ করতে পারেনি।

লিভি সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রার্থনা করে; হে ভগবান, যতীনের ছেলে দাও আমার কোলে। তাহলে সে আবার ভারতে ফিরতে পারবে, ফিরবে যতীনের বউ হয়ে। কিন্তু একদিন সকালে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল তার প্রার্থনা গেছে ব্যর্থ হয়ে, যতীনের সঙ্গে তার মিলন হয়েছে বন্ধ্যা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল লিভি। মা এসে বলল, বোকা মেয়ে, কাঁদিস কেন? মাকে কি বলবে লিভি?

লিভি ও যতীনের মিলন যেমন নিষ্ফল হয়ে গেল তেমনি নিষ্ফল হয়েছে ভারত ও য়ুরোপের এতদিনকার মিলন। শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায়দের মধ্যে যোগাযোগ ঘটেছিল; ছিল বৃহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত। কত মহৎ জিনিস গড়ে উঠতে পারত, স্থায়ী মিলনের স্বর্ণ-সেতুর ভিত্তি রচনা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সব ব্যর্থ, সব নিষ্ফল হয়ে গেল। বিট্রিশ সরকার দু'শ বছর ভারত শাসন করে বিদায় নিল, কিন্তু পারল না ভারতের হৃদয় স্পর্শ করতে।

মিলনের এত বড় সুযোগ হারিয়ে শুধু লিভি কাঁদছে না। সেই সঙ্গে কাঁদছে মানবাত্মা, যে মানবাত্মা য়ুরোপ-এসিয়ার ঊর্ধ্বে, গায়ের শাদা-কালো রঙের উপরে।

হে বিষাদ, স্বাগতম্

য়ুরোপ-আমেরিকার সাহিত্যের আসরে কিছুদিন সবচেয়ে আলোচিত নাম ছিল Francoise Sagan. মাত্র আঠারো বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস Bonjour Tristesse লিখে তিনি অভূতপূর্ব খ্যাতি লাভ করেছেন। মূল ফরাসী সংস্করণ প্রথম বছর বিক্রি হয়েছে দু'লক্ষ কপিরও বেশি। ইংরেজীতে অনুবাদ হয়ে এই উপন্যাসটি পৃথিবীর সর্বত্র সমাদর লাভ করেছে। কাহিনীর সিনেমা ও থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রি করে সাগান সাত লক্ষ টাকারও অধিক পেয়েছেন।

মাত্র ১৩২ পৃষ্ঠার কাহিনী, অল্প কয়েকটি চরিত্র ; উপ-কাহিনীর সংঘাত নেই। যে মুন্সিয়ানার সঙ্গে গল্পটি বলা হয়েছে তা আঠারো বছরের মেয়ের কাছ থেকে আশা করা যায় না। কোথাও কাঁচা হাতের ছাপ পড়েনি। ভাষা ও ভাবের সংযমে এবং চরিত্রচিত্রণে লেখিকা বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

তিন বছর আগে সেসিল স্কুলের হোস্টেল ছেড়ে বাড়ি এসেছে। বাড়িতে আছেন শুধু বাবা। মা মারা গেছেন অনেক দিন। বিপত্নীক রেমন্ড অবসর সময় প্যারিসের স্ফূর্তিতে ডুবে থাকে। হোটেল-রেস্তোরাঁয় রাত কাটিয়ে তৃপ্তি নেই। বাড়িতেও চাই নারীসঙ্গ। রেমন্ড তার প্রণয়িনীদের বাড়িতে এনে রাখে। প্রথম সেসিল বাবার এই জীবন-যাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু রেমন্ডের চরিত্রে এসব ত্রুটি সত্ত্বেও এমন মাধুর্য ছিল যে, তার উপর রাগ করে থাকা অসম্ভব। উদার, আমুদে স্বভাবের জন্য রেমন্ড সকলকেই আকৃষ্ট করতে পারত। সে নিজের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা ভালোবাসত মেয়েকেও সেই স্বাধীনতা দিয়েছে। বাবা ও মেয়ের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে ইঙ্গিত করাও রীতিবিরুদ্ধ, তা নিয়ে ওরা খোলাখুলি আলোচনা করত। বাবার নিত্য নতুন প্রণয় সম্বন্ধে ঠাট্টা-তামাসা করতেও সেসিলের বাধত না। প্রথম জীবনে একনিষ্ঠ প্রেমের যে আদর্শ রঙীন স্বপ্নজাল সৃষ্টি করে, বাবার সান্নিধ্যের প্রভাব সেসিলের মনে সে স্বপ্নকে স্থান দেয়নি।

সেবার গ্রীষ্মকালে সেসিল বাবার সঙ্গে সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছে। এলসা তাদের সঙ্গিনী। এলসা রেমন্ডের অধুনাতম প্রণয়িনী। পূর্বেই বলেছি, বাবার স্বভাব এমন আশ্চর্য যে রাগ করে থাকা যায় না। এলসাকে সঙ্গে আনায় সেসিল প্রতিবাদ করবার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারেনি। এলসাকে ঘৃণা করবার পরিবর্তে সে তাকে সহজ ভাবে বন্ধুর মতো গ্রহণ করেছে।

সমুদ্রে স্নান করে, পাইন বনে বেড়িয়ে, দিনগুলি আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সিরিলের সঙ্গে সমুদ্রতীরে আলাপ হয়েছে। দুজনে ঘন্টার পর ঘন্টা সমুদ্রে সাঁতার কাটে ; নৌকো করে বেড়ায় ; কখনো বেলাভূমিতে, কখনো বা পাইন বনে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। সেসিল এর আগে কখনো প্রেমে পড়েনি ;

সিরিল তার কুমারী হৃদয়ের ঘুম ভাঙাতে আরম্ভ করেছে। সিরিলের একটু স্পর্শ তার হৃদয় মধুর অস্বস্তিতে পূর্ণ করে রাখে। রাত্রিতে অনেকক্ষণ ঘুম আসে না।

কিন্তু স্বচ্ছন্দগতি জীবনে হঠাৎ যতি পড়ল। রেমন্ডের আমন্ত্রণে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এলো অ্যান্ লারসেন। অ্যান্ ছিল সেসিলের মা'র বন্ধু। বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে অনেক দিন আগে। নিজেকে নিয়েই আছে। আর কোন বন্ধন নেই।

বয়স হলেও অ্যানের দেহে ভাঙ্গন ধরেনি। এই প্রৌঢ় বয়সেও তার শক্ত-সমর্থ দেহে এমন এক ধরনের সৌন্দর্য ছিল যা প্রত্যেককেই আকৃষ্ট করত। অ্যানকে সেসিল আগেই দেখেছে। তার চরিত্রে দৃঢ়তার মাত্রা এত বেশি যে তাকে কঠোরতাও বলা যায়। অ্যানের আত্মপ্রত্যয় ও সংযম সেসিলের নিকট বিস্ময়ের বস্তু ছিল। পিতা-পুত্রীর উচ্ছল সংযমহীনতার মূর্তিমতী প্রতিবাদ এই অ্যান্। তাই অ্যানের সামনে সেসিল অস্বস্তি বোধ করে।

অ্যান্ এসে যখন জানতে পারলে এলসাও বাড়িতেই আছে তখন হঠাৎ তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। অ্যানের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে সেসিল বিস্মিত হলো। কারণ অ্যানের প্রশান্তি ক্ষুব্ধ হতে এর আগে সে কখনো দেখেনি। সুখ-দুঃখের ছায়া পড়ে না তার মুখে; দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা স্পর্শ করতে পারে না তাকে। তবে আজ সে বিচলিত হলো কেন? এলসাকে ঈর্ষা করে? অ্যান্ কি রেমন্ডকে ভালোবাসে? সেসিল এই সম্ভাবনায় বিরক্তি বোধ করল।

কিছুদিনের মধ্যেই অ্যান্ বাড়ির কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করল। সকল দিকে তার দৃষ্টি। সেসিলের খাওয়া, বেড়ানো, পড়া সবকিছুর উপরে অ্যান্ লক্ষ্য রেখেছে। তার মতামত সেসিলের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। একদিন পাইন বনে সিরিলের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতাটা অ্যান্ দেখে ফেলল। বাড়ি ফিরে আদেশ করল সিরিলের সঙ্গে আর মেলামেশা করতে পারবে না। সেসিল বলল, আমি ওকে ভালোবাসি।

অ্যান্ অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, ভালোবাসা কাকে বলে তা এখনো তুমি জানো না; এ শুধু যৌবনের মোহ।

নিশ্চিন্ত আলস্যে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। অ্যান্ বলল, পড়াশুনা আরম্ভ করে দাও, আগামী পরীক্ষাটা দিতে হবে।

পড়বার ভান করে সেসিল ঘরে বসে থাকে। মাঝে মাঝে পালিয়ে যায় সিরিলের বাড়ি। তীক্ষ্নবুদ্ধি অ্যানের কাছে এই ফাঁকি ধরা পড়তে দেরি হলো না। একদিন সে সেসিলকে তালা দিয়ে ঘরে বন্দী করে রাখল।

এত বড় নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা সেসিল জীবনে পায়নি। সে বাবার আদুরে মেয়ে, যখন যা খুশি করেছে, কোনো বন্ধন ছিল না। অ্যান্ তার মঙ্গলের জন্যই কঠোর হাতে জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। রেমন্ডের নীরবতা অ্যান্কেই সমর্থন করেছে।

বাবাও ধীরে ধীরে অ্যানের সকল ইচ্ছাকে নির্বিচারে মেনে নিচ্ছে। অ্যানের হাতে

সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সে যেন সুখেই আছে। সেসিল প্রথম দিনই যে অনুমান করেছিল তা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। এখান থেকে প্যারিস ফিরে রেমন্ড অ্যান্‌কে বিয়ে করবে। বাবাই একদিন তাকে জানালো কথাটা। সেসিল আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তাহলে তো অ্যানের কঠোর শাসনের মধ্যে বন্দী হতে হবে! জীবনের সকল আনন্দ কালো হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

এলসা এবার চলে যাবে এ বাড়ি থেকে। অ্যান্ কর্তৃত্ব পেয়েছে; এখন এলসার মতো মেয়েদের আর স্থান হবে না। সেসিল এলসার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা প্ল্যান ঠিক করল। এলসা সিরিলদের বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকবে। সিরিলের সঙ্গে বেড়াবে, প্রেমের অভিনয় করবে। যে পথ দিয়ে রেমন্ড সাধারণতঃ যাতায়াত করে, তারা দুজন জোড় বেঁধে সে পথেই ঘোরাঘুরি করবে। সেসিল তার বাবাকে ভালো করেই জানে। ভূতপূর্ব যুবতী প্রণয়িনীকে অন্যের করতলগত দেখে ঈর্ষা জাগবে। রেমন্ডের মধুকরবৃত্তি প্রৌঢ়া অ্যান্ তৃপ্ত করতে পারবে না। অ্যানের ব্যক্তিত্বের সামনে রেমন্ড শান্ত হয়ে আছে। তার সেই প্রকৃত চঞ্চল স্বভাবটা জাগিয়ে দিতে পারলেই অ্যানের প্রভাব দূর হয়ে যাবে। তার মধ্যেই সেসিলের মুক্তি।

এলসা এবং সিরিল সেসিলের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হলো। ওরা দু'জনে রেমন্ডের পথের উপর এসে পড়ে। সেসিল সঙ্গে থাকলে নতুন প্রেমিকযুগল সম্বন্ধে নানা টিপ্পনি করে বাবাকে শোনায়। বলে, এলসা এবার একজন তরুণ প্রেমিক পেয়েছে তাই অতো হাসিখুশি। খোঁচাটা রেমন্ডের আসন্ন বার্ধক্যের প্রতি। সেসিল তার বাবার মেজাজ ভালো করেই জানত; তাই সুযোগ পেলেই মনে করিয়ে দিত যে সিরিল যৌবনের শক্তি দিয়ে এলসাকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। কয়েক দিন এমনি ভাবে ক্রমাগত খোঁচা খেয়ে, এবং এলসা ও সিরিলের জ্বালাদায়ক অন্তরঙ্গতা সর্বদা চোখের সামনে দেখে, রেমন্ড চঞ্চল হয়ে উঠল। এলসার সঙ্গে নির্জনে দেখা করবার ব্যবস্থা করে ফেলল রেমন্ড।

সেদিন বিকেল বেলা সেসিল খবরের কাগজ হাতে করে বসে ছিল। হঠাৎ দেখল, অ্যান্ নিকটের পাইন বন থেকে ছুটে আসছে। সেসিল চমকে উঠল। অ্যান্ অকস্মাৎ বুড়ী হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে সে তার দেহটাকে টেনে আনছে। অ্যান্ বাড়িতে প্রবেশ করল না। গ্যারেজ খুলে গাড়িতে উঠে বসল। সেসিল ছুটে এলো। দেখল, অ্যানের দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। অ্যান্ হৃদয়হীনা নয়; সে যে একটি অনুভূতিপ্রবণ নারীহৃদয়কে আঘাত দিয়েছে তা এই প্রথম উপলব্ধি করল। সেসিলের বুঝতে বাকি রইলো না কি ঘটেছে। ওই পাইন বনে অ্যান্ হয়তো দেখে ফেলেছে রেমন্ড ও সেসিলের অশোভন ঘনিষ্ঠতা: আর এই নিষ্ঠুর দৃশ্যের পটভূমিকা রচনা করে দিয়েছে সেসিল নিজে। আজ এক মুহূর্তে সে অ্যানের যে পরিচয় পেল তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সেসিলের মনে হল অ্যানও একদিন বালিকা ছিল, তারপর যৌবনে পা দিয়েছে, নারীত্ব লাভ করেছে পরিণত বয়সে। চল্লিশ বৎসর বয়সে হয়তো

নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসেছিল। তাই রেমন্ডকে বিয়ে করে জীবনের বাকি দশ-বিশ বছর সুখ ও শান্তিতে কাটাবার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। সেসিল নির্বোধ ছেলেমানুষী করে চূর্ণ করে দিল সেই আশা।

ইঞ্জিন সচল হয়েছে। সেসিল ব্যাকুল হয়ে বলল, তোমাকে আমরা চাই, তুমি যেও না।

অ্যান্ বলল, আমাকে কেউ চায় না। তুমিও না, তোমার বাবাও না। আমাকে ক্ষমা করো।

ক্ষমা? কেন?

গাড়ি রাস্তার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেসিল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এ কী হয়ে গেল হঠাৎ! পেছনে পায়ের শব্দ; ফিরে দেখল, রেমন্ড। সেসিল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠল, পশু!

ওরা যখন কি করে অ্যান্‌কে ফিরিয়ে আনবে তার আলোচনা করছে, তখন পুলিশের কর্তৃপক্ষ সংবাদ দিল অ্যান্ মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। রাস্তার যে জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে মোটর গাড়ি মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে। রাস্তার ঐ অংশটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেসিল বুঝল, এটা মোটর দুর্ঘটনা নয়, আত্মহত্যা। অন্য কেউ হলে আত্মহত্যা করবার পূর্বে চিঠি লিখে যেত, নাটকীয় ভাষায় কারণ বর্ণনা করত; কিন্তু অ্যান্ অন্য জাতের মেয়ে। সে এমন জায়গায় এমন ভাবে মৃত্যু বরণ করল যে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কোন কারণ থাকতে পারে সে কথা অনুমান করবারও সূত্র নেই।

সেসিল ও রেমন্ড প্যারিস ফিরে এসেছে। অ্যানের অপঘাত মৃত্যু ওদের জীবনের চাকাটা কিছুদিনের জন্য অচল করে দিয়েছিল। আবার তারা ফিরে পেয়েছে পূর্বের স্বেচ্ছাচারী জীবন। সেসিল ঘোরে তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে; রেমন্ড জলের মতো টাকা ঢালে তার নতুন প্রণয়িনীর পায়ে। এই পরিবেশে অ্যানের স্মৃতি বেমানান।

তবু খুব সকালে যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, প্যারিসের রাজপথ থেকে যখন মোটর গাড়ির শব্দ উপরে ভেসে আসে, তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেসিলের মনে পড়ে যায় অ্যানের কথা। আধো-অন্ধকারে বারে বারে ডাকে: অ্যান্, অ্যান্। এই নাম সেসিলের সমস্ত অন্তর বিষাদে পূর্ণ করে দেয়। ভোরের সূর্যকে আহ্বান না করে সে স্বাগত সম্ভাষণ জানায় বিষাদকে। চোখ বন্ধ করে আবিষ্ট কণ্ঠে বলে: Bonjour Tristesse! হে বিষাদ, এসো এসো!

রোজেনবার্গ-দম্পতির বিচার ও প্রাণদণ্ড বেশ কিছু দিন পূর্বেকার আর একটি বিচার-কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। রোজেনবার্গ-দম্পতির প্রাণদণ্ড যতটা চাঞ্চল্য এনেছে সাকো-ভ্যান্‌জেত্তির প্রাণদণ্ড তার চেয়ে অনেক বেশি বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল এবং এ বিক্ষোভ শুধুই সংবাদপত্রের প্রবন্ধে এবং জনসভার বক্তৃতায় নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আমেরিকান সাহিত্যে সাকো-ভ্যান্‌জেত্তির কাহিনী একটি স্থান করে নিয়েছে। ম্যাক্সওয়েল অ্যান্ডার্সন; আপ্‌টন সিনক্লেয়ার এবং আরো অনেকে এ কাহিনী নিয়ে নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সর্বশেষ উপন্যাস পাওয়া গেল হাওয়ার্ড ফাস্টের কাছ থেকে। মানুষ স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করেছে হাওয়ার্ড ফাস্ট তারই ইতিহাসকার। The Passion of Sacco and Vanzetti-তে ফাস্ট সেই কুখ্যাত বিচার-কাহিনীকে উপন্যাসের রূপ দিয়েছেন। বিচারে যদিও সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তিকে হত্যাকারী বলে রায় দেওয়া হয়েছে, তবু অনেকের ধারণা তারা নিরপরাধ; তাদের প্রাণ দিতে হয়েছে একটি বিশেষ আদর্শের ভক্ত হবার অপরাধে। রোজেনবার্গ-দম্পতির প্রাণদণ্ডের পটভূমিকায় সাকো-ভ্যান্‌জেত্তির বিচারের কথা আলোচনা করবার সুযোগ করে দিল ফাস্টের নতুন বই। আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ বলে দাবী করে। অথচ ছাব্বিশ বছরের ব্যবধানে দু'টি রাজনৈতিক বিচার সেই গণতন্ত্রের রূপ সম্বন্ধে সকল দেশের স্বাধীনতাকামী লোকের মনে সন্দেহ দৃঢ় করেছে।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ম্যাসাচুসেটের অন্তর্গত একটি ছোট শহরে একটি জুতার কারখানার খাজাঞ্চি ও প্রহরীকে দু'জন আততায়ী পিস্তলের গুলি দ্বারা হত্যা করে পনেরো হাজার ডলারেরও অধিক অর্থ নিয়ে নিকটে অপেক্ষমান মোটরগাড়িতে চড়ে পালিয়ে যায়। মোটরগাড়িতে আরো তিনজন লোক বন্দুক হাতে করে অপেক্ষা করছিল। এই হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের সাক্ষীরা পুলিশকে জানাল যে, আততায়ীরা ছিল ইতালিয়ান। ঐ অঞ্চলে ইতালী থেকে এসে কিছুসংখ্যক লোক কল-কারখানায় কাজ করত। পুলিশ লাগল তাদের পেছনে। সাকো এবং ভ্যান্‌জেত্তি দু'জনেই ইতালিয়ান। সাকো জুতো তৈরি করত, ভ্যান্‌জেত্তি ঘুরত মাছ ফেরি করে। যে গাড়িটা হত্যাকাণ্ডের সংগে সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহ করে পুলিশ দৃষ্টি রাখছিল, সেই গাড়ি নিতে এসে সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তি একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। তারপর অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তারা দু'জনেই অ্যানার্কিস্ট এবং যে-কোনদিন আমেরিকা থেকে নির্বাসনের আদেশ পাবার আশঙ্কা করছিল। তাছাড়া তাদের কাছে পাওয়া গেল পিস্তল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তারা যুদ্ধে যোগ দেয়নি, বরং বিরোধিতা করেছে; এটাও একটা অপরাধ। কিন্তু থানায় অপরাধীদের তালিকার মধ্যে তাদের নাম নেই; আইন ভংগ করে এ পর্যন্ত তারা কোনো অপরাধ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। লুণ্ঠিত অর্থ যে তারা

গ্রহণ করেছে সে সম্বন্ধেও প্রমাণ নেই। বিচারের সময় সরকারপক্ষের সাক্ষীরা বলল, সাকো ও ভ্যানজেত্তি আততায়ীদের সঙ্গে ছিল। আবার আসামীপক্ষের সাক্ষীরা প্রমাণ করল যে, ঘটনার সময় তারা ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সনাক্তকারী সাক্ষীদের বিবরণে সন্দেহের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও বিচারে আসামীদের প্রাণদণ্ড হলো। জনসাধারণ এই দণ্ড সহজভাবে মেনে নিতে পারল না। হত্যা ও লুণ্ঠনের সঙ্গে যোগাযোগের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো রাজনৈতিক মতবাদের জন্য! আসামীরা দু'জনেই র‍্যাডিকাল এবং অ্যানার্কিস্ট; আমেরিকার অভিজাত শ্রেণী এই মতবাদকে ঘৃণা করত। সুতরাং আসামীদের রাজনৈতিক মতবাদকেই বিচার করে দণ্ড দেওয়া হলো; অপরাধের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল কিনা সে প্রমাণের বিচার করা হলো না। পুনর্বিচারের দাবী ম্যাসাচুসেটের সুপ্রীম কোর্ট এবং ঐ রাজ্যের গভর্নর অগ্রাহ্য করলেন। কারণ তাঁদের মতে নিম্ন আদালতে ঠিকভাবেই বিচার হয়েছে। দীর্ঘ সাত বছর পরে ১৯২৭ সালের ২২শে আগস্ট দুপুর রাত্রিতে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে সাকো ও ভ্যানজেত্তির প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়। সাধারণ লোক সেদিন একে সুবিচার বলে গ্রহণ করতে পারেনি; যতই দিন যাচ্ছে, ততই বিচার-পদ্ধতির ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেদিনও ছিল, এবং আজও অনেকের ধারণা আছে যে, সাকো ও ভ্যানজেত্তি নিরপরাধ, তারা প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছে।

২২শে আগস্ট, ১৯২৭ সাল। ফাস্টের গল্পের শুরু হলো ভোর ছ'টায়, জেলখানার মৃত্যু-ঘরে। আজই রাত্রি বারোটায় সাকো, ভ্যানজেত্তি এবং ম্যাডেরসের প্রাণদণ্ড হবে। তাদের তিন জনকে পর পর তিনটি ছোট মৃত্যু-ঘরে এনে রাখা হয়েছে। ম্যাডেরস ছিল সত্যকার অপরাধী, নিজের অপরাধ সে স্বীকার করেছে। সত্যিকারের অপরাধী বলেই মৃত্যুভয় তার বেশি। ঘুম ভাঙতেই সর্বপ্রথম মনে হলো আজ জীবনের শেষ দিন। এই ভাবনা তার সর্বদেহে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। মাত্র পঁচিশ বছরেই তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। সে জীবনে অনেক অপরাধ করেছে; জেলে এসে যখন জানতে পারল নিরপরাধ সাকো ও ভ্যানজেত্তিরও প্রাণদণ্ড হচ্ছে, তখন তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এলো। সে কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলল, সাকো ও ভ্যানজেত্তির কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু কি কারণে সে জানে না, বিচারের পরিবর্তন হয়নি। জেলের ওয়ার্ডেনেরও ঘুম ভেঙেছে এই দুশ্চিন্তা নিয়ে যে, আজ তিনজন লোককে বিচারের নামে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাতে হবে। সাকো ও ভ্যানজেত্তির জন্য সে আন্তরিক দুঃখিত। দীর্ঘ সাত বছর মৃত্যু শিয়রে নিয়ে তারা জেলে আছে। ওয়ার্ডেন কিছুতেই ভাবতে পারে না এদের মতো লোক কখনো খুনী হতে পারে। ওয়ার্ডেন মৃত্যু-ঘরে ভ্যানজেত্তির সঙ্গে দেখা করল। আজ তারা যা খুশি খেতে চাইতে পারে, যখন খুশি পাদ্রিকে ডাকতে পারে এবং সম্ভাব্য অন্য প্রয়োজনও মেটানো যায়। ভ্যানজেত্তি শুধু চাইল তার বন্ধু সাকোর সঙ্গে একবার দেখা করতে।

প্রথম দু'টি পরিচ্ছেদই পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। মৃত্যু-ঘরে বন্দী সাকো ও ভ্যানজেত্তিকে পাঠকের সম্মুখে রেখে দিন দ্রুত এগিয়ে চলেছে প্রাণদণ্ডের নির্দিষ্ট মুহূর্তটির দিকে। দৃশ্যপট কখনো উঠছে জেলের মধ্যে, কিন্তু বেশির ভাগই বাইরে। দীর্ঘ সাত বছর যারা উদাসীন ছিল, আজ তারাও সচেতন হয়ে উঠেছে এই শেষ দিনটিতে। দু'টি নিরপরাধ লোককে রক্ষা করা যায় কিনা তারই শেষ চেষ্টা চলছে। সংবাদপত্রে সাত বৎসরে সাকো-ভ্যানজেত্তিকে নিয়ে আজকের মতো এত আলোচনা হয়নি। জনসাধারণ, শ্রমিক সমিতি, মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি এদের প্রাণদণ্ড মুকুবের জন্য আবেদন করেছে গভর্নরের কাছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, চব্বিশ ঘন্টার জন্য, প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখা হোক। দেখা যাক্. কি করতে পারে তারা। ইতালির ডিক্টেটারের নিকট সে দেশের কিষাণ-মজুররা আবেদন জানিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমেরিকার (যুক্তরাষ্ট্র) দূতাবাস আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমেরিকার কর্তারা অটল। তবু সাধারণ লোক বিশ্বাস হারায় না; হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হবে না। তাদের সংগে পাঠকও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে; সেই অপেক্ষা গোয়েন্দা কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর। যত সময় ঘনিয়ে আসে ততই লোকের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সেই ছোট শহরটির নাগরিকরা নয়, পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকদের মধ্যেই প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। লন্ডন, প্যারিস, রোম, বার্লিন, মস্কো, টোকিও, বোম্বাই সর্বত্র শ্রমিকরা সেই চরম মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে আছে। কাহিনীটি বলবার কৌশলও চমৎকার। পশ্চাতের ঘটনাগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফৌজদারী আইনের ইহুদি অধ্যাপকের বক্তৃতা থেকে, সাকো তার ছেলে-মেয়েদের কাছে যে চিঠি লিখেছে তা থেকে, বিচারকের দিবাস্বপ্ন ইত্যাদি থেকে, সমগ্র কাহিনীটি জানা যায়। কিন্তু অতীত জানবার জন্য কোথাও থামবার প্রয়োজন হয় না। সাকো ও ভ্যানজেত্তি কম্যুনিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ; তাই বলে মৃত্যুকে উপেক্ষা করবার মতো মহাপুরুষ নয়। তারা বাঁচতে চায়; কিন্তু বাঁচা সম্ভব নয় বলে মৃত্যু দেখে ভয়ও করবে না। এদের দৃঢ়তা ও সাহস ম্যাডেরসের মনেও সংক্রামিত হয়ে তাকে দৃঢ়চেতা করবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণদণ্ড স্থগিত হবার আশা করে ওয়ার্ডেন ব্যর্থ হলো। সর্বপ্রথম ম্যাডেরস, তারপর সাকো এবং সবশেষে ভ্যানেজত্তি গিয়ে ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে বসল।

আমাদের দেশের অনেক স্বদেশী মামলাকেই বোধ হয় এমনি ভাবে উপন্যাসের রূপ দেওয়া যায়।

আঁদ্রে মরোয়া সুখপাঠ্য চরিতকার হিসাবে সুপরিচিত। লেখকদের জীবনী উপন্যাসের মতো করে লিখতে তাঁর জুড়ি বর্তমানে আর কেউ নেই। তাঁর জীবনীগুলি যেমন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লাভ করে, তেমনি তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায় জীবনীর কতকগুলি লক্ষণ। মরোয়ার সাম্প্রতিক উপন্যাস 'September Roses' অনেকাংশে একটি সরস জীবনীর মতো। এই উপন্যাসের নায়ক গিয়োম ফোঁতনে একজন প্রসিদ্ধ লেখক। একমাত্র স্ত্রীর ভালোবাসা ও যত্ন তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। একাধিক রমণীর প্রতি গিয়োমের আকর্ষণ। প্রবীণ বয়সে এক রমণীর প্রেমে পড়ে গিয়োমের দাম্পত্যজীবনে কি সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল আলোচ্য উপন্যাসে তারই কাহিনী বলা হয়েছে। স্ত্রী ছাড়া গিয়োমের জীবনে তিনটি মেয়ের প্রভাব পড়েছিল। সেই সব কাহিনী উজ্জ্বল রঙ দিয়ে আঁকলে হয়ত শেলী বা বায়রনের জীবনীর সঙ্গে তুলনা করবার কথা মনে হত। কিন্তু যেহেতু নায়ক তরুণ নয়, জীবনের শরৎকালে এসে পেঁছেছে, তাই কাহিনীর মধ্যে উজ্জ্বল রঙের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়।

গিয়োমের বয়স যখন আটান্ন তখন কাহিনীর শুরু। ফ্রান্সে এবং ফ্রান্সের বাইরে গিয়োমের নাম সুপরিচিত। তিনি প্রথম শ্রেণীর লেখক; নানা সম্মান ও পুরস্কার দিয়ে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে। শীগ্‌গিরই তিনি নোবেল পুরস্কার পাবেন এমন বিশ্বাসও অনেকেরই আছে। বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী পলিনের। গিয়োমের প্রতিভা আবিষ্কার করবার এবং তাঁকে খ্যাতির শিখরে তুলে দেবার কৃতিত্ব পলিন দাবি করতে পারে। পলিন গিয়োমের জীবনকে নিজের হাতের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তুলে নিয়েছে। পলিনকে এড়িয়ে গিয়োমের পক্ষে এখন কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়। এমন কি, লেখা পর্যন্ত নয়। নারী বা পুরুষ কেউ যদি গিয়োমের ঘনিষ্ঠ হতে চায় তা হলে এই বয়সেও পলিন ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে।

পলিন এক খ্যাতনামা অধ্যাপকের মেয়ে। সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশে সে বড় হয়েছে। তাই পলিন যখন অধ্যাপক ও লেখক প্রার্থীদের আবেদন অগ্রাহ্য করে একজন ব্যাঙ্কারকে বিয়ে করল তখন অনেকেই বিস্মিত হল। বিস্ময় পুরনো হতে পারল না। পলিনের স্বামীর মৃত্যু হল অল্পদিন পরেই। এখন সে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। লেখক ও অধ্যাপকদের নিয়মিত পার্টি দিয়ে শিল্প ও সাহিত্যের আলোচনা করে তার সময় কাটে।

এই পার্টিতেই গিয়োমের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। তখন তার মাত্র দু'একখানি বই বেরিয়েছে। প্রতিভার ছাপ রচনার মধ্যে তখনো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলে গিয়োমের নাম শোনা যায়। পলিন গিয়োমের মধ্যে প্রতিশ্রুতির লক্ষণ দেখতে পেয়ে তার সাহিত্য-সাধনায় উৎসাহ দিতে লাগল। গিয়োমের নতুন বই

বের হলে পলিন নামজাদা অধ্যাপকদের দিয়ে সমালোচনা লিখিয়ে কাগজে পাঠায়। অবশ্য একে সমালোচনা বলা চলে না; এ হল প্রশস্তি। প্রত্যেকটি বিশেষণ মনোমত না হলে, পলিন নতুন করে লিখিয়ে নেয়। বিত্তশালিনী তরুণীর সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে বিজ্ঞ সমালোচকরা পরিবর্তন করতে দ্বিধা করেন না। সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রে এবং বিদগ্ধ সমাজে গিয়োমের রচনা প্রচারের ভার নিল পলিন। পলিনের চেষ্টায় গিয়োম দ্রুতগতিতে খ্যাতির শিখরে উঠতে লাগল। পলিনের প্রেরণা গিয়োমকে উদ্দীপ্ত করল; ক্রমশঃ তার লেখা প্রকৃতই প্রথম শ্রেণীর হয়ে উঠল।

পলিন শুধু গিয়োমের লেখা সম্বন্ধেই উৎসাহী ছিল না। লেখক সম্বন্ধেই তার আগ্রহ ছিল বরং বেশি। পলিনের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়ের পক্ষে গিয়োমের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা কঠিন হল না। পলিন তাকে বিয়ে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। সেই থেকে গিয়োমের শোয়া-বসা, লেখা, বেড়ানো—সব কিছু পলিন কঠোর-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে। আজ এই আটান্ন বছর বয়সে ছকবাঁধা জীবনের কারাগার থেকে একটু মুক্তি পাবার জন্য তার মনের কোণে ব্যাকুলতা জেগেছে। পলিনের সংগে পরিচয় হবার পূর্বে গিয়োম আর একটি মেয়েকে ভালোবাসত। তাকে অন্যায়ভাবে ত্যাগ করে পলিনকে গ্রহণ করবার অপরাধ এখন তার মনে কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করে ওঠে।

ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী পাঠকদের নিকটও গিয়োমের রচনা সুপরিচিত ছিল। বিদেশী পাঠকরা এখন শুধু তার বই পড়েই তৃপ্ত নয়, তার জীবন ও সাধনার সংগেও পরিচিত হতে চায়। সুতরাং গিয়োমের ইংরেজ প্রকাশক তার একটি জীবনী প্রকাশ করবার সংকল্প জানিয়েছে। পলিন খুব আগ্রহের সংগে গ্রহণ করেছে এই প্রস্তাব। স্বামীর নাম ও কীর্তি প্রচার করতে পারলেই তার আনন্দ। স্থির হল তরুণ লেখক এবং গিয়োমের ভক্ত হার্ভে পলিনের নির্দেশ অনুসারে জীবনীটি লিখবে।

এই জীবনী-গ্রন্থের মধ্যে গিয়োমের কয়েকটি আধুনিকতম রেখাচিত্র সংযোজন করতে হবে। হার্ভে ওয়ান্দাকে এ-কাজের জন্য সুপারিশ করল। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী তরুণী শিল্পীকে স্বামীর নিকটে যেতে দিতে পলিনের প্রথম একটু দ্বিধা হয়েছিল। কিন্তু সব দ্বিধা দূর হয়ে গেল ওয়ান্দার আঁকা কতকগুলি চমৎকার ছবি দেখে। ঠিক হল, গিয়োমের ঘরে বসেই ওয়ান্দা ছবি আঁকবে। তাতে অনেক সময় বাঁচবে।

ওয়ান্দার সাহচর্যে কয়েকদিনের মধ্যেই গিয়োমের জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল। এতদিন পলিনের সতর্ক শাসনে গিয়োম তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি, তার ব্যক্তিগত রুচি ও আকাঙ্ক্ষা ভুলে ছিল। কিন্তু তারা হারিয়ে যায়নি। অবচেতন মনে আত্ম-গোপন করে ছিল। ওয়ান্দা তার যৌবনের যাদুস্পর্শে তাদের জাগিয়ে তুলল। এত-দিনের নিরুদ্ধ বাসনা হঠাৎ বন্যার মতো মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

তবু পলিনকে ভয় আছে। গোপনে ওয়ান্দাকে নিয়ে গিয়োম রেস্তোরাঁ ও পার্টিতে যায়। ওয়ান্দার চিত্রপ্রদর্শনী হল, প্রদর্শনীর পুস্তিকায় ওয়ান্দার শিল্প সম্বন্ধে

ভূমিকা লিখে দিল গিয়োম। ওয়ান্দা একজন খ্যাতনামা লেখকের উপরে মোহ বিস্তার করতে পারার আনন্দে মশগুল। পলিনের কাছে বেশি দিন এ-সব কথা গোপন রইল না। গিয়োমের ব্যবহার তাকে কঠিন আঘাত করল। তার ফলে পলিন ক্রমশঃ দুর্বল হতে লাগল। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, পলিন আর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না। ডাক্তার বলল, এটা মানসিক রোগ, মনের আঘাত ভালো না হলে রোগ সারবে না। ওয়ান্দার সংগে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাবার কথা ছিল গিয়োমের। ডাক্তার বলল, স্ত্রীকে এমন অবস্থায় একা ফেলে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। মানসিক রোগে কোনো ওষুধই কার্যকর হবে না। সুস্থ করে তোলবার একমাত্র উপায় স্বামীর সযত্ন পরিচর্যা। একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও স্ত্রীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে গিয়োমের ওয়ান্দার সংগে যাওয়া হল না। স্বামী যে তার জন্যই থেকে গেলেন এজন্য পলিনের মন খুশিতে ভরে উঠল। মন ভালো হবার সংগে সংগে ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল পলিন।

কিছুদিন পরে আমেরিকা থেকে এক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এলো গিয়োমকে নিয়ে যেতে। ওদেশে তার অনেক ভক্ত আছে; তারা গিয়োমের বক্তৃতা শুনতে ও তাকে দেখতে উৎসুক। টিকিট বিক্রি করে বক্তৃতার ব্যবস্থা হবে। গিয়োম অনেক টাকা পাবে অগ্রিম। গিয়োম ইতস্তত করছিল। কিন্তু পলিনই জোর করে বলল, যেতে হবে। পলিন কিন্তু সংগে যেতে রাজী হল না। যুক্তি দেখাল, তার শরীর এখনো দুর্বল।

দক্ষিণ আমেরিকা স্প্যানিশ ভাষার দেশ। অথচ গিয়োম সে ভাষা জানে না, সুতরাং তার জন্য একজন দো-ভাষী নিযুক্ত করা হল। সে ঐ অঞ্চলের খ্যাতনামা সুন্দরী অভিনেত্রী। আসল নাম তার অনেকেই ভুলে গেছে। লোলিতা নামে সে সকলের নিকট পরিচিত। গিয়োমকে সম্পূর্ণরূপে জয় করতে তার দেরী হল না। দেশ ও সমাজ থেকে বহু দূরে লোলিতাকে পেয়ে গিয়োম তার নিরুদ্ধ কামনা সফল করবার সুযোগ পেল। য়ুরোপের এত বড় একজন লেখককে জয় করতে পারার আনন্দই লোলিতার সব চেয়ে বড় পুরস্কার। লোলিতার সাহচর্যে গিয়োমের বয়স যেন হঠাৎ অনেক কমে গেল; দ্বিতীয়বার সে যৌবন ফিরে পেল।

দক্ষিণ আমেরিকার দিনগুলি স্বপ্নের মতো কেটে গেল। গিয়োম ফিরে এসে দেখল লোলিতার সঙ্গে তার সম্পর্কটা পলিনের অজানা নয়। এখানকার ফরাসী দূতাবাসের কর্মচারীদের মারফৎ খবরটা প্যারিসে ছড়িয়ে পড়েছে। পলিনকে সে সবই খুলে বলল। ইচ্ছা করে বলেনি; পলিনের জেরার সম্মুখীন হয়ে বলতে হয়েছে। কেমন মেয়ে এই লোলিতা? কোন্ মন্ত্রবলে সে তার প্রবীণ স্থিতধী স্বামীকে এমন করে ভুলিয়েছে? কৌতূহলের শেষ নেই পলিনের। সে চিঠি লিখে লোলিতার সংগে যোগাযোগ স্থাপন করল। স্বামীর উপর অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করার জন্য সে তাকে তিরস্কার করে চিঠি লেখে। জবাবে লোলিতার কাছ থেকে কড়া চিঠি পায়।

শুধু দক্ষিণ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে লোলিতার

তৃপ্তি নেই। য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান প্যারিসে যদি তার অভিনয় প্রশংসা লাভ করে তবেই সে ধন্য হবে। গিয়োমকে বলেছিল তার আকাঙ্ক্ষার কথা। সে লোলিতাকে আসবার জন্য উৎসাহিত করেছিল।

লোলিতা এবার সুযোগ পেয়ে তার থিয়েটারের দল নিয়ে স্পেন ভ্রমণ করে প্যারিস এসে উপস্থিত হল। লোলিতা আসবার খবর পেয়ে গিয়োম তাকে এড়াবায় জন্য প্যারিসের বাইরে চলে গেছে। এখনো লোলিতার আকর্ষণ তার কাছে এত বড় যে, আবার তার সংগে দেখা হলে হয়তো পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে ভেসে যেতে হবে। দেখা হল পলিনের সংগে। লোলিতা পলিনের দুঃখ উপলব্ধি করে বলল, এ দুঃখ তোমার নিজের সৃষ্টি। তুমি বুদ্ধিমতী, সংস্কৃতিবতী মহিলা। তোমার স্বামীর মনের খোরাক মেটাবার ক্ষমতা তোমার আছে। কিন্তু জীবনের স্থূল দিকটার উপর তুমি দৃষ্টি দাওনি। অথচ গিয়োম কবি ও শিল্পী, সুতরাং তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি অত্যন্ত সচেতন। প্রদীপ নেভার আগে যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে; তেমনি বার্ধক্যের প্রান্তে এসে পুরুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি নতুন করে কিছুদিনের জন্য জাগ্রত হয়। তুমি সারাজীবন তার দেহকে উপবাসী রেখে মন নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছ। সেখানেই তুমি ভুল করেছ। সুতরাং যে মেয়ের মধ্যে গিয়োম জীবনের স্থূল ও লঘু দিকটা দেখতে পেয়েছে তাকেই সে কাছে টানতে চেয়েছে।

পলিন প্রথমে কথাটা স্বীকার করতে চায়নি। কিন্তু শেষে ভেবে দেখল, কথাটা ঠিক। দোষ তারই। এবার থেকে সে নতুনভাবে জীবন শুরু করবে।

প্যারিসের দর্শকরা লোলিতার দলকে গ্রহণ করতে পারল না। লোলিতা সুন্দরী, তার অভিনয়ে আন্তরিকতা আছে; কিন্তু অভিনয়ের কলাকৌশল এখনো যথার্থরূপে আয়ত্ত হয়নি। দক্ষিণ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্যারিসের সুশিক্ষিত দর্শকের নিকট মর্যাদা পেল না। পলিন লোলিতার খোঁজ করতে গিয়ে জানল সে কাউকে কিছু না জানিয়ে সদলবলে গোপনে প্যারিস ত্যাগ করেছে। সে কি অভিনয়ে ব্যর্থতার লজ্জায়, না গিয়োমের দ্বারা উপেক্ষিত হবার বেদনায়?

পলিন এ প্রশ্নের উত্তর পেল না।

হেমিংওয়ে নোবেল পুরস্কার পেলেন এটা আমাদের দেশে অনেকেই সহজভাবে নিতে পারেননি। তিনি সত্যি সাহিত্যের এত বড় পুরস্কারটা লাভ করবেন সে কথা কারো কারো ধারণার বাইরে ছিল। ব্যাপারটা যেন অকস্মিক,—এমনি একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধ ও মন্তব্য থেকে। আসলে তা কিন্তু সত্য নয়। সিনক্লেয়ার লুইসা আমেরিকা থেকে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৩০ সালে। তিনি স্টকহোমে পুরস্কার আনতে গিয়ে হেমিংওয়ের সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে সুইডিশ অ্যাকাডেমির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তখন হেমিংওয়ের 'দি সান অলসো রাইজেস্' ও 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্'—এই দুটি উল্লেখযোগ্য বই মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। সিনক্লেয়ারের সুপারিশের ফলে হেমিংওয়ে সুইডেনে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ক্রমশঃ এই জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। এবার নোবেল পুরস্কার ঘোষণার দিন সুইডেনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুইডিশ অ্যাকাডেমির অফিসে ঘন ঘন টেলিফোন আসতে লাগল, "পুরস্কারটা হেমিংওয়ে পেয়েছে তো ?"

১৯৫৩-এর পুরস্কার দেবার সময় চার্চিলের সঙ্গে হেমিংওয়ের নাম বিবেচনা করা হয়েছিল। চার্চিলের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল তাঁর বয়স। পরবর্তী বৎসর তাঁকে সম্মানিত করবার সুযোগ পাওয়া না-ও যেতে পারে। সুতরাং হেমিংওয়ের প্রশ্ন চাপা পড়ল। পরের বার হেমিংওয়ের সাহিত্য-প্রতিভার বিচার করা হয়েছে আইসল্যান্ডের ল্যাক্সনেস, ফ্রান্সের পল ক্লদেল ও আলবেয়ার কামু এবং এজরা পাউন্ড প্রভৃতির সঙ্গে।

নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে বার্নার্ড শ' ও চার্চিল ছাড়া হেমিংওয়ের মতো অন্য কোনো লেখকের ব্যক্তিগত জীবনই জনসাধারণের নিকট আগ্রহের বস্তু নয়। হেমিংওয়ের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে পাঠকদের মধ্যে ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের বিচিত্র নায়কদের মধ্যে পাঠকরা লেখককেই দেখতে পায়। এরূপ অনুমানের অবশ্যই ভিত্তি আছে। হেমিংওয়ে অ্যাড্ভেঞ্চার ভালোবাসেন; বিপদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে তাঁর ভয় নেই। এই দুঃসাহসিকতা হেমিংওয়ের চরিত্রগুলিকে স্পর্শ করেছে। হেমিংওয়ের জীবনের সবচেয়ে বড় অ্যাড্ভেঞ্চার ঘটেছে সুদূর আফ্রিকায়। আফ্রিকার জঙ্গলে দু'বার বিমান ভেঙে হেমিংওয়ে ও তাঁর স্ত্রী আহত হয়েছেন। প্রথম বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মেরুদণ্ডের হাড় দু' জায়গায় ভেঙে যায় এবং কিডনির আঘাত হয় সাংঘাতিক। দ্বিতীয়বার যে বিমানে করে দেশে ফিরছিলেন সেটাও ভেঙে পড়ল, ইঞ্জিনে জ্বলে উঠল আগুন। তাড়াতাড়ি বিমানের দরজা খুলতে গিয়ে আঘাতে হাত অবশ হয়ে পড়ল ; তখন মাথার গুঁতো দিয়ে বিমানের দরজা খুলতে হলো। সেই গুঁতোর চোটে মাথার হাড় গেল ভেঙে। বাইরে এসে দেখা গেল বিমানের ইঞ্জিনে আগুন লেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আগুনের বৃত্ত থেকে

বাইরে আসতে গিয়ে হেমিংওয়ের সমস্ত চুল পুড়ে গেল। তাঁর স্ত্রীর কয়েকটি পাঁজরার হাড়ও দুর্ঘটনায় ভেঙেছে। হেমিংওয়ে অনেক দুঃখ সহ্য করে শরীরের এই অবস্থা নিয়ে যখন ইতালির হাসপাতালে এসে পৌঁছলেন তখন ডাক্তাররা বিস্মিত হয়ে গেলেন হেমিংওয়ের জীবনীশক্তির পরিচয় পেয়ে। এতবড় আঘাত পেয়ে অন্য যে কোন লোক পথেই মারা যেত। হেমিংওয়ে দীর্ঘকাল সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। তবু আফ্রিকার অরণ্যের আহ্বান তাঁর কাছে একটুও শিথিল হয়নি। এক লক্ষ একাত্তর হাজার টাকার নোবেল পুরস্কার পেয়ে আর একবার আফ্রিকা যাবার কথা স্থির করে ফেলেছেন। আফ্রিকার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা তাঁর কতকগুলি গল্প অল্পদিনের মধ্যেই বেরিয়েছে।

হেমিংওয়ের এক বন্ধু তাঁর বৈশিষ্ট্যকে কয়েক লাইন পদ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন:

Veteran out of the wars before he was twenty ;
Famous at twenty-five ; thirty a master—
Whittled a style for his time from a walnut stick
In a carpenter's loft in a street of the April city.

—নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌

'এপ্রিল সিটি' হলো প্যারিস। প্যারিসে এক ছুতারের কারখানার উপরতলায় সস্তায় ঘর ভাড়া করে হেমিংওয়ে থাকতেন। সেখানে থাকতেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। প্রথম প্রথম সম্পাদকরা তাঁর গল্প প্রকাশের অযোগ্য বলে ফিরিয়ে দিতেন। হেমিংওয়ে হতাশ না হয়ে অধ্যবসায়ের দ্বারা এমন স্টাইল আয়ত্ত করলেন যে বছর চারেক পরে 'দি সান অলসো রাইজেস' প্রকাশিত হবার সংগে সংগে ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। হেমিংওয়ের ভাষা আশ্চর্য রকম স্বচ্ছ, সরল ও বেগবান। ভাষা সম্বন্ধে তিনি বলেন: Prose is architecture, not interior decoration, and the Baroque is past. সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় অলংকরণের যে আতিশয্য ছিল তাকেই বলা হতো 'বারোক' রীতি। সংবাদপত্রের যুগে ভাষার অলঙ্করণ অচল হয়ে পড়েছে। নোবেল পুরস্কার কমিটি হেমিংওয়ের ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন:

His vigorous art and the influence of his style on the literary art of our times as manifested recently in his book "The Old Man and the Sea..."

'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী'তে শুধু যে হেমিংওয়ের রচনা-রীতির সর্বাপেক্ষা সুন্দর বিকাশ দেখা যাবে তাই নয়, কাহিনীর নতুনত্বে এবং দৃষ্টিভঙ্গির সজীবতায় এটি নতুন সৃষ্টি। এই বইটির জন্য হেমিংওয়ে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন।

'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী'র দৈর্ঘ্য বড় গল্পের চেয়ে একটু বড়, কিন্তু উপন্যাসের

চেয়ে ছোট। কাহিনীর মধ্যেও চরিত্রের ও আখ্যায়িকার ভিড় নেই। এক বৃদ্ধ জেলে, সমুদ্র, বিরাট আকৃতির এক মার্লিন মাছ এবং একটি বালক এই কাহিনীর চরিত্র। হাভানা উপসাগরে বৃদ্ধ জেলে সান্টিয়াগো চুরাশি দিন যাবৎ মাছ ধরার চেষ্টা করেছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বড় মাছ একটিও ধরতে পারেনি। প্রথম চল্লিশ দিন ম্যানোলিন যেত তার ডিঙিতে মাছ ধরবার সঙ্গী হয়ে। কিন্তু চল্লিশ দিনেও যখন কোনো বড় মাছ ধরা পড়ল না তখন ম্যানোলিনের বাবা হতাশ হয়ে ছেলেকে নিয়ে দিল অন্য জেলের সঙ্গে। ম্যানোলিন স্যান্টিয়াগোর নৌকো থেকে চলে গেলেও তাকে ভুলতে পারল না। ঐ অঞ্চলে সান্টিয়াগো এককালে ছিল নামকরা জেলে। তার কুঞ্চিত মুখের রেখায় রেখায়, কাঁধে ও হাতে দড়ি এবং দাঁড় টানবার দাগে-দাগে অনেক অভিজ্ঞতা ও বীরত্বের কাহিনী আছে আত্মগোপন করে। ম্যানোলিন এই বৃদ্ধকে বীরের মতো পুজো করে, ভালোবাসে। এখন অন্য জেলের কাছে গিয়ে সে কিছু কিছু উপার্জন করছে। এই স্বোপার্জিত অর্থ দিয়ে বৃদ্ধ জেলেকে সে সাহায্য করতে উৎসুক। স্যান্টিয়াগো রোজ বিকেলে যখন হতাশ মনে অবসন্ন দেহে ফিরে আসে তখন ম্যানোলিন যায় এগিয়ে; সে ডিঙির পাল গুটিয়ে কাঁধে করে, বড় মাছ মারবার বৃহৎ ট্যাটা হাতে করে বৃদ্ধকে পেঁাছে দেয় তার কুটীরে। নারকেল গাছের খোল দিয়ে তৈরী কুটীর। এক কোণে একটা তক্তপোশ, জরাগ্রস্ত টেবিল ও চেয়ার,— এমনি সামান্য দু'চারটে আসবাবপত্র। জীর্ণ দেয়ালে টাঙানো আছে তার পরলোকগত স্ত্রীর একটি বিবর্ণ ফটোগ্রাফ। ম্যানোলিন হোটেল থেকে খাবার এনে দেয়, সান্টিয়াগো সামান্য একটু আপত্তি জানিয়ে তা খায়। খেতে খেতে গল্প করে বেসবল লীগ খেলার প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে। নিঃসঙ্গ কুটীরে শুয়ে শুয়ে রাত্রিতে সে স্বপ্ন দেখে যৌবনকালের,—যখন জাহাজে কাজ নিয়ে গিয়েছিল আফ্রিকার উপকূলে। জাহাজ থেকে দেখতে পেত সমুদ্রের তীরে সিংহেরা এসে দলে দলে খেলা করছে।

অন্য দিনের মতো আজও অন্ধকার থাকতে সান্টিয়াগো তার ডিঙিতে উঠে বসল। নিজের নৌকোয় যাবার আগে ম্যানোলিন তার জিনিসপত্র তুলে দিয়ে গেছে। পাল খাটিয়ে ডিঙি ক্রমশঃ তীর থেকে দূরে চলল। তীরের গাছপালা প্রথম একটা নীল রেখায় পরিণত হলো, তারপর সে রেখাও গেল মিলিয়ে। উপুড় করা বাটির মতো মাথার উপরে নীল আকাশ। নিচে চঞ্চল সমুদ্র; পূর্বদিকে সমুদ্রের বুক চিরে আগুনের থালার মতো সূর্য উঠছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন ঐ বুড়ো জেলে ছাড়া আর কেউ নেই। চারিদিকের সীমাহীন জলরাশির মধ্যে নৃত্যপরায়ণ ডিঙিটা ব্যতিক্রম। মাঝে মাঝে দু'একটা সামুদ্রিক পাখী ডিঙির উপর উড়ে আসে ডাঙার বার্তা নিয়ে। সান্টিয়াগোর বড় ভালো লাগে ওদের দেখে, মনে হয় ওরা যেন আত্মীয়।

সার্ডিন মাছের টোপ গেঁথে কয়েকটা বড় বড় বড়শি সান্টিয়াগো সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। স্রোতের টানে ভেসে চলল তার ডিঙি। বড়শির মোটা শক্ত সুতোগুলি হাতের মুঠোয় ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। অভিজ্ঞ কবিরাজের নাড়ী

টেপার মতো সুতোর কম্পনের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে সান্টিয়াগো। শত শত ফুট জলের নিচে কোন্ টোপটা কে ঠোকর দিয়ে গেল একটু, কে একটু টেনে পরীক্ষা করছে; সুতোর ওপারে তিমি না হাঙর, না অন্য কোন মাছ—তা সে অনুভব করতে চায়। সেই বুঝে সুতো টানবে বা ছাড়বে। কী ব্যগ্র প্রতীক্ষা! হে ভগবান, অনেক-দিন ব্যর্থতার গ্লানি সয়েছি, আজ যেন সফল হতে পারি! সুসংবাদ: সার্ডিন মাছ টোপ দিয়েছি, তোমরা এসে খাও। একা একা কথা বলে বৃদ্ধ জেলে; তার এই সুন্দর স্বগতোক্তিগুলি গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

হঠাৎ প্রচণ্ড টান পড়ল একটা সুতোয়। দুরুদুরু বুকে সান্টিয়াগো সুতো ছাড়তে লাগল। শেষ নেই, টেনেই চলেছে। নিশ্চয়ই খুব বড় মাছ। দু'দিন দু'রাত্রি ধরে চলল মাছের সঙ্গে লড়াই। প্রাণান্তকর সংগ্রাম। সুতো টেনে ধরে থাকতে থাকতে হাতে খিল ধরে যায়, মনে হয় বুঝি হেরে গেল। কিন্তু সামলে নেয় অনেক কষ্টে। মাছের প্রচণ্ড টানে সুতোয় হাত কেটে রক্ত বেরিয়ে যায়, তবু হাল ছাড়বার পাত্র নয় সান্টিয়াগো। এক বোতল জল এনেছিল সঙ্গে করে; তাই একটু একটু করে খায়, আর খায় টোপ ফেলবার কাঁচা মাছ। দু'দিন বাদে বড়শিবিদ্ধ মাছটা আধমরা হয়ে জলের উপর ভেসে উঠল। ট্যাঁটা দিয়ে সম্পূর্ণ ঘায়েল করে মাছটাকে দড়ি দিয়ে ডিঙির সঙ্গে বাঁধল সান্টিয়াগো। প্রকাণ্ড বড় মার্লিন মাছ; এতবড় মাছ সে কখনো কাউকে ধরতে দেখেনি। বড় সুসংবাদ 'মাছ। চড়া দামে বিক্রি হবে। তাড়াতাড়ি পাল তুলে তীরের দিকে হাল ধরল।

কিন্তু দেখা দিল নতুন বিপদ। মাছের গন্ধ পেয়ে হাঙর পিছু নিয়েছে। প্রথম দু'টো-একটা। ট্যাঁটা দিয়ে, ছুরি দিয়ে কয়েকটা হাঙর মারল। দু'টো অস্ত্রই একটু পরে সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। তারপর এলো হাঙরের ঝাঁক। নিরুপায় সান্টিয়াগো দেখতে লাগলো কেমন করে তার মুখের গ্রাস ওরা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। যখন তীরে পৌঁছল তখন মাছের মাথা এবং তার বিরাট কঙ্কালটা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

হেমিংওয়ের পূর্বের কাহিনীগুলি মৃত্যুর ছায়া ও হতাশার গ্লানিতে ভারাক্রান্ত। 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী'তে লেগেছে নতুন সুর। মমতায় ও সহানুভূতিতে গল্পটি স্নিগ্ধ। শুরুতেই ম্যানোলিনের বৃদ্ধ জেলের প্রতি আকর্ষণ পাঠকের মনকে কোমল করে। সান্টিয়াগোর সামুদ্রিক পাখী ও বড়শিবদ্ধ মাছটার প্রতি করুণা হেমিংওয়ের সাহিত্যে নতুন রস। সান্টিয়াগো তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাছটাকে জয় করেও বীরত্ববিলাসী হয়ে ওঠেনি। বরং বলছে, শক্তিতে ও ধৈর্যে মাছটা তার সমকক্ষ; মানুষের বুদ্ধি ট্যাঁটা আবিষ্কার করেছে, বড়শি আবিষ্কার করেছে, তাই সে জয়ী হতে পেরেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা আশার বাণী। সান্টিয়াগো এত কষ্ট সয়েও হতাশ হয়নি। সে বলছে, মানুষের পক্ষে আশা না করা পাপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি সান্টিয়াগোর হার হল না? মাছটাকে জয় করেও তো পেল না। ম্যানোলিন সান্ত্বনা দিয়ে বলল,

তোমার লক্ষ্য ছিল মাছটাকে ধরা। সে লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে ; তুমি জয়ী। সকল বৃহৎ জয়ের পশ্চাতেই একটু বেদনা থাকে। একটু বেদনার ছায়া পড়লেও হেমিংওয়ে তাঁর কাহিনী হতাশার মধ্যে শেষ করেননি। মাছের বিরাট কংকালটা দেখেই ও-অঞ্চলের জেলেরা সান্টিয়াগোর ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে নতুন করে। মাছ পেল না, কিন্তু ফিরে পেল ম্যানোলিনকে। ম্যানোলিন বলল, কাল থেকে সান্টিয়াগোর সংগেই সে মাছ ধরবে। বাবার কথা অগ্রাহ্য করেও। পরিশ্রান্ত সান্টিয়াগো বিছানায় শুয়ে শুয়ে বহুদিন পূর্বেকার আফ্রিকার উপকূলের সিংহ স্বপ্ন দেখছে, এই কথা দিয়েই কাহিনী শেষ করা হয়েছে। সিংহ শৌর্য ও সাহসের প্রতীক ; বিষাদের গ্লানি পাঠকের মন থেকে চলে যায়। আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

ফেলিক্স ক্রুলের আত্মচরিত টমাস মানের শেষ এবং অসম্পূর্ণ উপন্যাস। এটি ক্রুলের স্মৃতিকথার প্রথম খণ্ড মাত্র। সম্পূর্ণ হলে মানের সাহিত্য সাধনায় এর মূল্য কি হতো তা বলা যায় না। তবে এক বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে যে তিনি ক্রুলের কাহিনী লিখতে বসেছিলেন তা বোঝা যায়; কারণ নায়কের বিশ বছরের কাহিনী বলতেই চারশ' পৃষ্ঠার বেশি লেগেছে। ফেলিক্স ক্রুলের জীবনের কয়েকটি ঘটনা মানের কাছ থেকে আমরা অনেক দিন আগে পেয়েছি একটি ছোট গল্পের আকারে। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মান একে উপন্যাসের বীজরূপে লালন করে এসেছেন। সুতরাং ফেলিক্স ক্রুলের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। মানের দীর্ঘকালের চিন্তা ভাবনা এবং সাহিত্য সাধনার পরিণত ফল এই উপন্যাস।

কাহিনী আরম্ভ হয়েছে মানের প্রিয় পরিবেশে। বনেদি ব্যবসায়ী পরিবার। মদ তৈরির ব্যবসা। ফেলিক্সের বাবা এই ব্যবসার শেষ কর্ণধার। কারবার বন্ধ হবার মুখে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। চরিত্রে ভাঙন ধরেছে। মা, বাবা, দিদি—সকলের। বাড়িতে পার্টি এবং হৈ-হল্লা লেগেই আছে। পাড়ায় দুর্নাম। অন্য বাড়ির সমবয়স্ক ছেলেরা ফেলিক্সের সঙ্গে মিশতে চায় না। একা একা তার দিন কাটে। এই নিঃসঙ্গতার ফলে ফেলিক্সের মানসিক গঠন বিকৃত হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে সে স্কুল থেকে পালায়; বাবার দস্তখত হুবহু জাল করে অনুপস্থিতির জন্য মিথ্যা জবাবদিহি দেয়। স্কুলে পড়বার সময় একদিন ফেলিক্স দোকান থেকে চুরি করে। ছেলেবেলায় এই জাল ও চুরি করবার প্রবৃত্তিটা বয়স বাড়বার পরও তাকে ত্যাগ করেনি। এই দুটি প্রবৃত্তি পরবর্তী কালে ফেলিক্সের জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে।

দেনার জ্বালায় অস্থির হয়ে ফেলিক্সের বাবা আত্মহত্যা করলেন। ব্যবসা আগেই ডুবেছে। এখন ফেলিক্সের আর কোন অবলম্বন রইল না। স্থির করলো, প্যারিস যাবে ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানে যাবার আগে বাধ্যতামূলক সামরিকবৃত্তি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে বিদেশে যাবার অনুমতি মিলবে না। ফেলিক্স সেনা বিভাগের নির্বাচন কমিটির সামনে এমন চতুর অভিনয় করলো যে কমিটি তাকে অসুস্থ ও বিকৃতমস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত করে সামরিক কর্তব্যের দায় থেকে রেহাই দিল। টমাস মানের সমগ্র রচনার মধ্যে ফেলিক্সের সাক্ষাৎকারের মতো কৌতুককর দৃশ্য আর একটিও নেই।

ফেলিক্স মুক্তি পেয়ে কিছুদিন এক বারবনিতার ব্যবসায়ে অংশীদার হয়ে কাজ করলো। তারপর এলো প্যারিস। ফ্রান্সে প্রবেশের শুল্ক ঘাঁটিতে এক বিখ্যাত লেখিকার গহনার বাক্স চুরি করলো। ফেলিক্স চতুর ছেলে। গহনা বিক্রির টাকার উপর

নির্ভর করে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো না। প্যারিসে এক বড় হোটেলে চাকরি শুরু করলো লিফ্‌টবয় হিসাবে। অল্পদিন পরেই ফেলিক্স ওয়েটারের পদ পেলো।

প্যারিসের হোটেল এক বিচিত্র জগৎ। অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনের মিছিল। ফেলিক্স ওয়েটার; সুতরাং এদের জীবন ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছে সে। যে-সব ধনী পরিবারের মেয়েদের খাদ্য পরিবেশন করা আর হুকুম তামিল করা তার কাজ, তারাই তাকে প্রেম নিবেদন করে; এক বিট্রিশ লর্ড তাকে বন্ধু ও পার্শ্বচর হিসাবে স্বদেশে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র। ওয়েটার বলে যারা ফেলিক্সকে অবজ্ঞা করে তাদের অন্তঃসারশূন্য জীবনও তার কাছে গোপন থাকে না।

মাকুইস দ্য ভেনস্তা বড়লোকের ছেলে। প্যারিস এসেছে ছবি আঁকা শিখতে। কিন্তু ছবি আঁকবে কি, মডেল জাজার প্রেমে সে উন্মত্ত। বাড়ীতেও এ খবর পেঁছেছে। মা-বাবার ভয় হলো ছেলের বুঝি উচ্ছন্নে যাবার দেরি নেই। তাঁরা ছেলের হাতে প্রচুর টাকা তুলে দিয়ে বললেন, যাও, পৃথিবী ঘুরে এসো। তাঁদের আশা; দেশের বাইরে গেলে জাজাও মনের বাইরে চলে যাবে। মাকুইস পড়লো উভয় সংকটে। বাবার কথা না শুনলে টাকা পাঠানো হয়তো বন্ধ হবে। অথচ জাজাকে ছেড়ে প্যারিসের বাইরে থাকবে কি করে?

ফেলিক্সের শরণাপন্ন হলো মাকুইস। হোটেলে তাদের আলাপ হয়; দুজনে পরামর্শ করে স্থির করলো মাকুইস জাজাকে নিয়ে প্যারিসেই থাকবে; ফেলিক্স তার হয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করে আসবে। মাকুইসের হাতের লেখা নকল করে ফেলিক্স বাবাকে চিঠি লিখবে বিভিন্ন জায়গা থেকে। ছেলে তাঁর আদেশ পালন করছে দেখে বাবা সন্তুষ্ট হবেন।

পৃথিবী ভ্রমণের পথে ফেলিক্স প্যারিস থেকে লিসবনে এলো। আলাপ হলো সেখানকার প্যালিওজুলজিকাল ইন্‌স্টিটুটের পাগলাটে অধ্যাপক কুকুকের সঙ্গে। নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, পাখীর ডানা ও মেয়েদের সুকুমার বাহুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন তিনি। ফেলিক্স হঠাৎ বিবর্তনবাদ আলোচনায় উৎসাহী হয়ে পড়ে। কিন্তু আসলে সে মুগ্ধ হয়েছে অধ্যাপকের অষ্টাদশী কন্যা সুসানাকে দেখে। বড় ঘরের ছেলে এই পরিচয় দিয়ে সকলের কাছ থেকেই ফেলিক্স সমাদর লাভ করেছে। সুসানা প্রথম এমন ভাব দেখাল যেন ফেলিক্স সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহ নেই। প্রেমের প্রসঙ্গ উঠলেই সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। একদিন সুসানার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার সুযোগ পাওয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুসানা যখন আত্মনিবেদনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তে আবির্ভাব হলো অধ্যাপক পত্নীর। মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে তিনি ফেলিক্সকে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। ধরা পড়ে যাবার সঙ্কোচে ফেলিক্স একটু অপ্রতিভ। যে প্রেম মেয়েকে নিবেদন করতে যাচ্ছিল তা খরদৃষ্টি বাজপাখীর মতো মা

ছিনিয়ে নিয়ে গেল। প্রৌঢ়া রমণীর ব্যাকুল বাহুবন্ধনে বন্দী হলো ফেলিক্স। প্রথম খন্ডের গল্প এখানেই শেষ হয়েছে।

ফেলিক্স ক্রুল মানের এক নতুন ধরনের চরিত্র। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের নায়কদের মতো ফেলিক্সের ওপর কোনো দার্শনিক তত্ত্বের বোঝা চাপানো হয়নি। জীবনকে সে কৌতুক বলে গ্রহণ করেছে। নীতির বন্ধন কিংবা বিবেকের দংশন জীবনের পথে তার অবাধ গতিকে বাধা দিতে পারেনি। কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন এক স্বচ্ছন্দ হালকা সুর পাওয়া যায় যা মানের রচনায় দুর্লভ। তবু গল্পের উপর থেকে কৌতুকের পর্দা সরিয়ে দিলে ফেলিক্সের যে জীবনদর্শন উপলব্ধি করা যায় তার মধ্যে লঘুতা নেই। চুরি করে হোক, প্রতারণা করে হোক, জীবনে সাফল্যলাভ করতে হবে —এই হলো ফেলিক্সের মূলমন্ত্র। শুধু তার নয়। যে-কোন মূল্যে এগিয়ে যাবার মন্ত্র তো বর্তমান সমাজেরও।

ওয়েটার ফেলিক্সের চোখ দিয়ে অভিজাত সমাজের বাহ্যিক জাঁকজমকের পশ্চাতে যে বেদনা রয়েছে তা-ও আমরা দেখতে পাই। ডিয়ানে ফিলিবার্টের মতো নামকরা লেখিকা হোটেলের এক নগণ্য লিফ্‌টবয়কে ডেকে এনে দেহ দান করল। ফেলিক্সের স্থান যে সমাজের নিম্নতম স্তরে একথা ডিয়ানে তাকে বুকের মধ্যে টেনে এনেও ভুলতে পারে না। অধঃপতন হলো বলে ডিয়ানের অনুশোচনার শেষ নেই। কিন্তু কি করবে? The intellect longs for the delight of the non-intellect. স্বামীর কাছ থেকে সে এ আনন্দ পায়নি। তাই সমাজের নর্দমা থেকে কুড়িয়ে এনে তা আস্বাদন করতে হলো।

যদিও ফেলিক্স মানের একটি নতুন ধরনের চরিত্র, তবু পূর্বের রচনার সংগে খানিকটা সাদৃশ্য খুঁজে বের করা যেতে পারে। মান যে-সব শিল্পী ও সাহিত্যিকের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তারা কেউ সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। তাদের চরিত্রে কোনো-না-কোনো প্রকার বিকৃতি দেখা যাবে। ছেলেবেলায় ফেলিক্স সংগীত শুনে তন্ময় হয়ে যেত। মাত্র আট বছর বয়সে সে তার সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এক বিরাট জনতাকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। সুতরাং ফেলিক্সের জীবন শুরু হয়েছে শিল্পী হিসাবে। তারপর মানের শিল্পপ্রবণ চরিত্রের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই ফেলিক্স বিকৃত পথ গ্রহণ করেছে। ফেলিক্স-চরিত্রে যৌবনবিলাস, জালিয়াতি ও চুরির প্রবৃত্তি যতটা প্রাধান্য লাভ করেছে মানের অন্য কোনো শিল্পী চরিত্রে তা দেখা যায় না। আট বছর বয়সের পরে ফেলিক্সের সংগীত প্রতিভার কোনো পরিচয় কাহিনীর মধ্যে নেই। হয়তো তার শিল্প-প্রতিভার পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই কাহিনী শেষ হতো।

মান মৃত্যুর পূর্বে আভাস দিয়েছিলেন ফেলিক্স ক্রুলের স্মৃতিকথায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার অনেক কথা থাকবে। ফেলিক্সের অকপট স্বীকারোক্তির সংগে রুশোর আত্মকথার তুলনা সহজেই মনে পড়ে। স্মৃতিকথার আংগিকে রচিত বলেই উপন্যাসের জমাট বাঁধুনি কাহিনীর মধ্যে আশা করা যায় না। অনেক চরিত্র একবার

দেখা দিয়ে হারিয়ে গেছে। ডিয়ানের উপ-কাহিনীটি একটি ছোট গল্পের মর্যাদা নিয়ে পৃথকভাবে দাঁড়াতে পারে।

'ব্ল্যাক সোয়ানে' মানের রচনা-রীতি পরিবর্তনের যে সূচনা দেখা গিয়েছিল, আলোচ্য গ্রন্থে তার আশ্চর্য সুন্দর পরিণতি ঘটেছে। অনুবাদের মধ্য দিয়েও মূলের উজ্জ্বল ও স্বচ্ছন্দ গদ্য রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীর প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষা রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিহাস, দর্শন ও বাইবেলের পূর্বসূত্র দিয়ে মান তাঁর রচনাকে কন্টকিত করেননি। 'ফেলিক্স ক্রুল' না পড়লে মানের সাহিত্য সাধনার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

কলকাতার জীবন নিয়ে লেখা একটি নতুন উপন্যাস পাওয়া গেল। বইটির নাম The City and the Wave, লেখিকা Jon Godden. বইটি আমেরিকা এবং বিটেন এই দু'জায়গা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসটির দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন হয়েছে বিটেনে ; সুতরাং কাহিনীটি যে পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করতে পেরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কলকাতার একটা পুরনো ছ'তলা বাড়ি। এ বাড়িতে বাঙালী, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা জাতি ও ধর্মের লোক বাস করে। অনেকটা যেন কলকাতার সমাজের প্রতীক এই বাড়ি। লেন চেজ এবাড়ির সর্বোচ্চ তলায় একটি ঘর নিয়ে একা থাকে। তার বয়স উনচল্লিশ, মাথায় টাকের আভাস দেখা দিয়েছে, চলে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে। চাকরি করে একটা বিটিশ কোম্পানীর আপিসে ; ভাতাশুদ্ধ মাইনে পায় তিনশ' টাকা। লেন চেজ বিয়ে করেনি, তবু এ টাকায় তার চলে না। অথচ সে জানে কত বাঙালী কেরাণী মাত্র ষাট টাকায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চালিয়ে আছে।

জুলাই মাসের একটি গুমোট বিকেল। ক্লান্ত হয়ে লেন বাড়ি ফিরেছে। ঘরে ঢুকেই সে কিসের অভাব বোধ করল,—যেন কি নেই এখন, অথচ আগে ছিল। ভালো করে চেয়ে দেখল টেবিল, চেয়ার, ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া পুরনো দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা—সবই ঠিক আছে। নেই শুধু তার পোষা বিড়ালটা। দরজা খুললেই যে রোজ তাকে মিউ মিউ করে অভ্যর্থনা জানায়, যাকে সে রোজ দুধ খাওয়ায়, যে তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী, সেই বিড়ালটাকে কোথাও দেখা গেল না। নিচের তলায় পাঞ্জাবী ভাড়াটের ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে জানতে পারল তার ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে বিড়ালটা রাস্তায় পড়ে গিয়ে তখনি মারা গেছে। ছ'তলা থেকে পড়লে বাঁচবার কথা নয়! কলকাতার জীবনসমুদ্রে একবিন্দু জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বিড়ালের মৃত্যুর ঘটনাটি প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা করে লেখিকা লেনের চরিত্র সম্বন্ধে সার্থক ইঙ্গিত দিয়েছেন ; সমগ্র কাহিনীর সূচনা লেখিকা যে খুব দক্ষতার সঙ্গে করেছেন সে কথা স্বীকার করতে হবে।

লেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। তার ঠাকুরদা ছিল খাঁটি ইংরেজ, সে জাহাজের কাপ্তান ছিল বলেই একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র সংগ্রহ করেছিল! উত্তরাধিকারী সূত্রে লেন সেটা পেয়েছে। লেনের বয়স যখন খুব অল্প তখন তার বাবার মৃত্যু হয় ; মা আবার বিয়ে করল। নতুন সংসারে লেন অনাদৃত হওয়ায় তার মা ওকে রেখে এল অনাথ আশ্রমে। সেখানে পাদ্রিদের যত্নে সে লেখা-পড়া শিখেছে এবং তাদেরই সুপারিশে চাকরি পেয়েছে। লেনের স্বভাব চটপটে নয় বলে উপরওয়ালারা তার কাজে সন্তুষ্ট হতে পারে না।

লেনের আত্মীয়হীন নিঃসংগ জীবনে সময় কাটাবার সবচেয়ে বড় উপায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা। রাত্রিতে ঐ যন্ত্রটার সাহায্যে সে কলকাতার লোকারণ্য থেকে চলে যায় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। ঐ বাড়িরই নিচের তলায় থাকে বাঙালী জ্যোতিষী দেবেন্দ্রনাথ দে। দেবেন্দ্রনাথের সংগে তার বন্ধুত্ব। মাঝে মাঝে দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রীর রান্না মাছের ঝোল ও ভাত এবং দই-মিষ্টি খেয়ে আসে। খুব ভালো লাগে।

বৃষ্টির দিন। লেন বাড়ির সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করবার পর দরজার আড়াল থেকে ষোল বছরের একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবতী চুপি চুপি তার পিছনে সিঁড়ি ভেংগে উপরে উঠতে লাগল। লেন তালা খুলে ঘরে ঢোকবার পর মেয়েটিও ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল; লেন এই প্রথম দেখতে পেল তাকে। ক্ষীণকায় বলে বয়স ষোল হলেও মেয়েটিকে দেখায় নেহাৎ ছোট বালিকার মতো। বৃষ্টিতে ভিজে তার পোশাক গায়ের সংগে লেপ্‌টে গেছে; সারাদিন অনাহারে পথে পথে ঘুরেছে, পুরনো জুতো কোথায় যে পা থেকে খুলে পড়েছে টের পায়নি। ওর নাম মারি; দূর সম্পর্কের পিসিমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ছেড়ে এসেছে। মা বাবা নেই, আর কোনো আশ্রয় নেই। সারাদিন অনাহারে পথে পথে ঘুরেছে। এখন লেনের কাছে আশ্রয় চায়, অন্ততঃ সে রাতটার জন্য। অনেক অনুরোধের পর লেন সম্মত হলো। রাতটা থেকে সকালেই চলে যাবে মারি। কিন্তু সেই এক রাত্রিতে লেন এবং মারির মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপিত হলো, যার ফলে মারির আর যাওয়া হলো না। লেন বিয়ে করল মারিকে।

কয়েক মাস পরে লেন যখন জানল মারি সন্তানসম্ভবা তখন তার মনে আতঙ্ক জেগে উঠল। লেন তার ছ'তলার ঘরের জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখত উঁচু-নিচু ছাদগুলি ঢেউয়ের মতো ওঠা-নামা করে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। এই সব ছাদের নিচে জীবাণুর মতো মানুষগুলি দুঃখের সমুদ্রে কিলবিল করছে। দু'শ বছর ধরে এই শহর যেভাবে খুশি প্রসার লাভ করে চলেছে। বিমান থেকে সবুজ প্রকৃতির বুকে কলকাতা শহরকে দেখা যায় একটা কলঙ্ক চিহ্নের মতো। একটা অসুস্থ, অসুখী পরিবেশ সমস্ত শহরটাকে গাঢ় কুয়াশার মতো ঢেকে রেখেছে। এর মধ্যে আর একটি নতুন জীবনকে ডেকে আনা পাপ ছাড়া আর কী? লেন স্থির করল তার সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেওয়া হবে না। কিন্তু মারি সন্তান চায়। দেবেন দে তার যুক্তি বোঝে না; যে পাদ্রি লেনকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে সে-ও লেনের যুক্তি বুঝতে অক্ষম। এই দুঃখের সংসারে আর একটি প্রাণীকে ডেকে আনবার পাপবোধ তার বুকের উপর গুরুভার পাথরের মতো চেপে বসেছে; এবং তারই ফলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

দেবেন দে-র একটি ভবিষ্যদ্বাণী লেনকে স্বস্তি দিল। শীগ্‌গীর একদিন নব্বই মাইল দূরের সমুদ্র থেকে বিধ্বংসী প্লাবন এসে কলকাতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সে, মারি, তাদের অনাগত সন্তান এবং কলকাতার এই ইঁটের অরণ্য কুটোর মতো ভেসে যাবে। তাহলে আর ভেবে কি হবে? এই প্লাবনের মধ্যে রয়েছে তার মুক্তি। সে কলকাতা থেকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করবার চেষ্টা করবে না। বরং সে অধীর আগ্রহে

অপেক্ষা করে আছে কবে আসবে সেই প্লাবন। কিন্তু যারা বাঁচতে চায় তাদের সে সাবধান করে দেবে। আপিসে উপরওয়ালা সাহেবকে একথা বলতেই দু'মাসের মাইনে দিয়ে লেনকে চাকরি থেকে বিদায় দেওয়া হলো। লেন চাকরি যাওয়ায় একটুও চিন্তিত হলো না। কারণ, দু'মাসের আগেই প্লাবনের জলে সে ভেসে যাবে।

সেদিন আকাশে মেঘ করেছে। পাগলা হাওয়া বইছে চারদিক থেকে। দেবেন দে বাসা ছেড়ে যাচ্ছে, ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছে তার মালপত্র। দেবেন দে-র গণনা হিসাবে আজকেই প্লাবন আসবে। প্রকৃতির রোষ কেবল কলকাতার উপরে; কলকাতার সীমানার বাইরে যেতে পারলে রক্ষা পাওয়া যাবে। জ্যোতিষীর ভয়, প্লাবন আসবার আগে সে পালাতে পারবে কি না?

লেন ছ'তলার জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। সে যেন প্রলয়ের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছে, আর দেরি নেই, এলো বলে! সে এবং মারি ভেসে যাবে। নিচে পথ বেয়ে এখনো চলছে জনস্রোত। হঠাৎ মারির আর্তনাদে লেনের স্বপ্ন ভেঙে গেল। প্লাবন আসবার আগেই কলকাতার আকাশে চোখ খুলতে চায় তাদের সন্তান। লেনকে ছুটতে হলো দাই-এর খোঁজে। এই কলকাতার জনারণ্যে আসছে একটি নতুন অতিথি। কিন্তু কতক্ষণের জন্যই বা? মা ও সন্তান ঘুমিয়ে আছে। লেন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। মেঘ দূর হয়ে গেছে, প্রলয়ের চিহ্ন কোথাও নেই। প্রাণের সমুদ্র এই কলকাতা ঠিক আগের মতোই ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। ছেলেকে আর একবার দেখল লেন। প্রলয় নয়, প্রাণের দুর্নিবার বন্যা। ঐটুকু প্রাণের দাবী ঠেকানো গেল না। হঠাৎ লেন উপলব্ধি করল ধ্বংসের চেয়ে প্রাণ কত বড়। লেন-এর মনে যে বিষাদের মেঘ ছিল তা দূরে হয়ে গেল। একটি কচি প্রাণের স্পর্শ তার নিঃসঙ্গ ঘুণধরা জীবনকে সঞ্জীবিত করে তুলল।

এই কাহিনীর দু'টি প্রধান পুরুষ চরিত্রই অস্বাভাবিক বাতিকগ্রস্ত। একজন দেবেন দে, আর একজন লেন। শুধু মারি ব্যতিক্রম। সে সুস্থ ও স্বাভাবিক। লেন-এর অস্বাভাবিকতার মধ্যেই কাহিনীর বীজ নিহিত। লেখিকা সহজ কিন্তু জোরালো ভাষায় একটি ঋজু কাহিনী বলেছেন। অনাবশ্যক চরিত্র বা অনাবশ্যক ঘটনা একটিও নেই। লেখিকার রচনা পড়ে ক্লাসিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের কথা মনে পড়ে। দুর্গা ও কালীর বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা গোলমালে পড়েছেন। একটু নতুন ধরনের এই গল্পটি লেখিকা সাফল্যের সঙ্গে বলতে পেরেছেন।

সম্রাজ্ঞী ইয়েহোনালা

চীন দেশের কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে শ্রীমতী পার্ল বাক এতদিন উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর নতুন বই Imperial Woman এর ব্যতিক্রম। চীনের শেষ সম্রাজ্ঞী ৎজু সি'র জীবনী নিয়ে এই উপন্যাসটি লিখেছেন পার্ল বাক। সম্রাজ্ঞীর চরিত্রটি নাটকীয় সংঘাতে পূর্ণ। রাজপ্রাসাদের লোভ, দ্বন্দ্ব, বিলাসিতা ও ষড়যন্ত্রের চিত্র নিপুণভাবে এঁকেছেন লেখিকা। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়ও পার্ল বাক সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইয়েহোনালা সতেরো বছরের তরুণী। অল্প বয়সে বাবার মৃত্যু হয়েছে ; থাকে কাকার বাড়ি। খুড়তুতো বোন সাকোটা তার বন্ধু। ইয়েহোনালার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে আছে জুং লু-র সঙ্গে। ছেলেবেলা থেকেই দু'জনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক। জুং লু এখন রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর দলপতি।

সম্রাট তাঁর মহিষী ও উপপত্নী নির্বাচন করবেন। রূপবতী মেয়েদের আহ্বান এসেছে রাজধানীতে যাবার জন্য। সম্রাটের সামনে দিয়ে মেয়েরা পর পর হেঁটে যাবে ; সম্রাট ও রাজমাতা তাদের দেখে নির্বাচন করবেন। ইয়েহোনালার রূপের কথা অবিদিত নেই। তাকেও যেতে হবে রূপের পরীক্ষায়। আহ্বান এসেছে। আর সেই পরোয়ানা নিয়ে এসেছে জুং লু। কাকার মেয়ে সাকোটাও বাদ পড়েনি।

সম্রাটের আহ্বান তো অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই ! যেতেই হবে। যদি সম্রাট তাকে পছন্দ করেন তা হলে আর ফিরে আসা হবে না। জুং লুকে বিয়ে করবার এতদিনের স্বপ্ন যাবে ব্যর্থ হয়ে। জুং লুকে সে গভীরভাবে ভালবাসে। তাকে হারাবার আশঙ্কা সত্ত্বেও সম্রাজ্ঞী হবার লোভ ইয়েহোনালার তরুণ চিত্তে দোলা দেয়।

রাজপ্রাসাদে কুমারী মেয়েদের মিছিলের মধ্য থেকে সম্রাটের ইয়েহোনালাকে নির্বাচন করতে অসুবিধা হলো না। সুন্দরীদের মেলার মধ্যেও সৌন্দর্যে ও ব্যক্তিত্বে ইয়েহোনালা অনন্যা। তবু সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা লাভ করবার সৌভাগ্য তার হলো না। মহিষী পদে বৃত হলো সাকোটা। সাকোটার পরলোকগত দিদির সঙ্গে ছিল রাজপরিবারের যোগাযোগ ; সেই জন্যই সৌন্দর্যে খাটো হয়েও সে প্রধান স্থান পেল।

ইয়েহোনালার আর বাড়ি ফেরা হলো না। রাজপ্রাসাদের উপপত্নী মহলে স্থান হলো তার। সে মহলে খোজাদের প্রভুত্ব। বিকৃত কামনা সেখানকার জীবনকে করেছে কলুষিত। দিনের পর দিন কেটে যায়, সম্রাটের বিলাস কক্ষে যাবার আহ্বান আসে না। ইয়েহোনালা অন্যান্য উপপত্নীদের মতো অলসভাবে দিন কাটায় না ; সে নিয়ম করে পড়াশুনা আরম্ভ করেছে। বিশেষ আগ্রহ নিয়ে চর্চা করে রাজনীতির। যুবরাজ কুং পড়ায় চীনের ইতিহাস, আলোচনা করে চীনের সমস্যা। সবচেয়ে বড় সমস্যা বিদেশী জাতির প্রভুত্বলিপ্সা। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ একে একে চীনের

উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের ছলে করে। তাদের ঠেকাতে হবে।

উপপত্নীদের প্রত্যেকের জন্য একজন করে প্রধান খোজা আছে। সম্রাটের প্রিয়পাত্রী হবে যে উপপত্নী, তার খোজার উপার্জন ও প্রতিপত্তি দুই-ই বাড়বে। তাই খোজারা ক্রমাগত সম্রাটের কাছে সুযোগ পেলেই ইয়েহোনালার রূপগুণের কথা উল্লেখ করত। এক রাত্রিতে ইয়েহোনালার সত্যি আমন্ত্রণ এলো সম্রাটের বিলাস কক্ষে। এ মহলে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেল। প্রসাধন ও সাজপোশাকে পরিপাটির অন্ত নেই।

নির্দিষ্ট সময়ে সম্রাটের সামনে উপস্থিত হলো ইয়েহোনালা। সম্রাটের কাছে এসে মেয়েরা ভয়ে ও সম্ভ্রমে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু ইয়েহোনালার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, তার সপ্রতিভ ব্যবহার এবং তেজোদীপ্ত রূপ সম্রাটকে মুগ্ধ করল। ইয়েহোনালা যখন নিজের ঘরে ফিরে এলো তখন তার সকল মোহ দূর হয়ে গেছে। কিসের বিনিময়ে সে তার প্রেম ত্যাগ করেছে, ফেলে এসেছে মুক্ত জীবন? আশা ছিল সম্রাটকে তুষ্ট করে চীনের উপর কর্তৃত্ব লাভ করবে। সম্রাট বয়সে তরুণ, শক্তিতে বৃদ্ধ। ছেলেবেলা থেকে খোজাদের কলুষিত সংসর্গে মানুষ হয়েছে, ছদ্মবেশে নগরীর কুখ্যাত অঞ্চলে রাত কাটিয়েছে, ক্ষয় করে দিয়েছে নিজেকে। জুং লুকে হারিয়ে, মুক্ত আকাশে অবাধ বিচরণের অধিকার ত্যাগ করে, শুধু শূন্য হাতে সে রাজধানীতে বন্দিনীহয়ে থাকতে পারবে না। বেরুতে হবে এখান থেকে।

এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে একমাত্র জুং লু। রাজধানীর সিংহদ্বার রক্ষা করবার দায়িত্ব তার। সম্রাটের উপপত্নীর সঙ্গে তার দেখা হতে পারে না। ইয়েহোনালা নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল জুং লুকে। নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করতে তার একটুও ভয় হলো না। খোজাদের বোঝাল, লু আমাদের আত্মীয়। জুং লু এলো। রাজধানী থেকে বেরিয়ে যাওয়া যে অসম্ভব সে কথা বুঝিয়ে বলল। ইয়েহোনালা বলল: তুমি আমাকে এমন কিছু দিয়ে যাও যার স্মৃতি এখানকার জীবন সহ্য করতে সাহায্য করবে।

অনেকক্ষণ পরে জুং লু যখন বেরিয়ে এলো তখন খোজার দল পরস্পরের প্রতি মুখ টিপে হাসল।

ইয়েহোনালার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। দূর করেছে অবসাদ। সম্রাটকে বশ করে ক্ষমতার অধিকারী হওয়া চাই; তা হলে জুং লুকে উচ্চপদ দিতে পারবে; লু-র সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার অন্তরায়ও যাবে দূর হয়ে। সম্রাটকে নিজের মুঠোর মধ্যে আনতে তার দেরি হলো না। এখন রাজকার্য সম্পর্কে পরামর্শ দেয় ইয়েহোনালা।

কয়েক মাস পরে ইয়েহোনালা সম্রাটকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দিল। সাকোটার মেয়ে হয়েছে। সুতরাং এই ছেলেই হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। সেই অধিকারে ইয়েহোনালার প্রতিষ্ঠা বাড়ল। সম্রাট তাকে নতুন মর্যাদা দিলেন। তার নতুন নাম হলো ৎজু সি, অর্থাৎ পশ্চিম প্রাসাদের সম্রাজ্ঞী; সাকোটা হলো ৎজু আন, অর্থাৎ পূব প্রাসাদের সম্রাজ্ঞী। দুজনেরই সমান মর্যাদা। কিন্তু রাজ্য শাসন করে প্রকৃতপক্ষে

ইয়েহোনালা। একদল তার বিরুদ্ধবাদী; রাজকুমারের জন্মের ইতিহাস নিয়ে তারা কাণাঘুষা করে। তার ছেলেকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রও হয়েছিল। আশ্চর্য সাহস ও কৌশলের সঙ্গে ইয়েহোনালা সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করল।

চিররুগ্ণ সম্রাট পরলোকগমন করলেন। শুরু হলো ক্ষমতালোভীদের দ্বন্দ্ব। ইয়েহোনালা এবারও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নাবালক পুত্রের নামে রাজ্য শাসন করতে লাগল। সাকোটাও সমান অংশীদার; কিন্তু নামে মাত্র। ক্ষমতা হাতে পেয়ে জুং লুকে রাজকীয় পরামর্শ সভার সভ্য করা হলো। চারদিক থেকে এর প্রতিবাদ উঠল। কিন্তু কে তা গ্রাহ্য করে?

ছেলের বিয়ে দিল ইয়েহোনালা। বিয়ের পর থেকেই দেখা গেল ছেলে স্ত্রীর কথায় ওঠে বসে; মা-কে আর সমীহ করে চলে না। পুত্রবধূ সন্তানবতী; ছেলে হলে সম্রাটের পরেই হবে তার স্থান। রাজমাতার হাত থেকে চলে যাবে সকল ক্ষমতা। ক্ষমতার মদ যদি না থাকে, ভালোবাসা যদি সার্থক না হয়, তা হলে কি নিয়ে থাকবে? ইয়েহোনালা পুত্রবধূর আকর্ষণ থেকে মুক্ত করবার জন্য পুত্রকে বিপথে নিয়ে যেতেও দ্বিধা করল না। তার ফলে সম্রাট আক্রান্ত হলেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে। মা হয়ে ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করল না। ছেলের মৃত্যুর পর পুত্রবধূকে নির্দেশ দিল আত্মহত্যা করতে। সে নির্দেশ অমান্য করা চলে না। পুত্র পুত্রবধূ এবং তাদের ভাবী সন্তান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এবার ইয়েহোনালা সিংহাসনে বসাল তার বোনের নাবালক ছেলেকে; নাবালক হলেই তার সুবিধা। সম্রাটের নাম করে নিজে শাসন করতে পারে। সম্রাট সাবালক হতে চাইলেই ইয়েহোনালার উদ্যত রোষ নেমে আসবে তার মাথায়। চীনের জনসাধারণ সিংহাসনের উপর নারী দেখতে চায় না। তাই ইয়েহোনালাকে নাবালকের অভিভাবক হিসাবে রাজ্য শাসন করতে হয়।

বিদেশীরা দক্ষিণাঞ্চল ত্যাগ করে চীনের অভ্যন্তরে আসবার উদ্যোগ করছে। বক্সার বিদ্রোহীরা প্রবেশ করেছে রাজধানীতে। রাজসভায় নানা দল। কেউ তার পক্ষে, আবার অনেকে গোপনে ইয়েহোনালার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। কঠোর হস্তে বিরোধী পক্ষের লোকদের সে শাস্তি দেয়; নির্মম চিত্তে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে একটু দ্বিধাবোধও করে না। একবার বিপদ এমন ঘনিয়ে এলো যে, ইয়েহোনালাকে দলবল নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ইংরেজদের সঙ্গে অপমানজনক সন্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। চীনকে বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য ইয়েহোনালার চেষ্টা ছিল অবিরাম। দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখত সে সারাক্ষণ। কিন্তু চীনা সৈন্যের হাতে ঢাল-তলোয়ার; বন্দুকের বিরুদ্ধে তা কতক্ষণ! নতুন সংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল। এমন কি ইয়েহোনালাও পাশ্চাত্যের নতুন আবিষ্কারগুলির সহায়তা গ্রহণ করতে নারাজ।

ইয়েহোনালা সর্বদা শুভানুধ্যায়ীরূপে পেয়েছে জুং লুকে। অনেক সময় জুং লু তার কাজের বিরোধিতা করেছে, কিন্তু পাশ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। গুপ্ত ঘাতকের হাত

থেকে জুং লু একবার তার প্রাণ রক্ষা করেছে। রাজকার্যের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও ইয়েহোনালার প্রথম প্রেম, তার একমাত্র প্রেম, হারিয়ে যায়নি। জুং লুকে দেখলে এখনো তার রক্ত অশান্ত হয়ে ওঠে, সম্রাজ্ঞী হয়েও জীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়। কিন্তু জুং লু রাজপ্রাসাদেরই কোথাও থাকলেও তার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলবার সুযোগ নেই। জুং লু শুধুই একজন কর্মচারী। সম্রাজ্ঞীর সামনে এসে নতজানু হয়ে কুর্নিশ করে। এখানে দেয়ালের চোখ-কান আছে। জুং লুকে পাশে বসিয়ে দুটো কথা বললে সে খবর ছড়িয়ে পড়বে চীনের সর্বত্র ; সম্রাজ্ঞীর কলঙ্কের কাহিনী রাজনৈতিক রূপ লাভ করবে। তার ফল কত দূরপ্রসারী হবে কে বলতে পারে ? তাদের দু'জনকে নিয়ে মুখরোচক আলোচনা বন্ধ করবার জন্য ইয়েহোনালা জুং লু-র বিয়ে দিয়েছে। জুং লু বিয়ে করতে চায়নি। সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে বিয়ে করতে হয়েছে।

জুং লু-র মৃত্যু হলো। জুং লু যখন মৃত্যুশয্যায় তখনো সে কাছে যেতে পারেনি, সেবা করতে পারেনি। কারণ সে যে সম্রাজ্ঞী। লু-র মৃত্যুর পরে ইয়েহোনালা একান্ত অসহায় বোধ করতে লাগল নিজেকে। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখল জুং লু বলছে : তুমি যদি সকলের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করো, বিজ্ঞের মতো বুঝেসুঝে রাজকার্য পরিচালনা করো, তা হলে সর্বদাই তোমার পাশে থাকব।

এর পর থেকে আশ্চর্য পরিবর্তন হলো ইয়েহোনালার। সকলের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করে। মুখে গভীর প্রশান্তি। বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে নিয়মিত উপাসনা করে। কুসংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়েছে তার মন। দেশের তরুণদের ইংলন্ড-আমেরিকা যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। পশ্চিমের শক্তির উৎসকে জানতে হবে। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের আঘাত করতে হবে।

ইংলন্ডের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কথা শুনেছে ইয়েহোনালা। প্রাচ্যে ভিক্টোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাজ্ঞী ইয়েহোনালা। চীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল সম্রাজ্ঞী ৎজু সি-র নাম। প্রজারা তাকে ভয় করত, শ্রদ্ধা করত ; সচেতন ছিল তার ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে।

ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর ছ' বৎসর পরে ইয়েহোনালার মৃত্যু হয়।

পতন

আলবেয়র কামু-র উপন্যাস The Fall পড়তে আরম্ভ করে কোলরিজের 'রাইম অব দি এন্‌শেন্ট মেরিনারের' কথা মনে পড়ে যায়। অ্যালবাট্রস হত্যার পাপবোধ বৃদ্ধ নাবিকের হৃদয় এমন ভারাক্রান্ত করেছিল যে স্বীকারোক্তি দ্বারা তার ভার লঘু করবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; বিয়ের বরযাত্রীকে আটক করে স্বস্তিলাভের আশায় তাকে নিজের কাহিনী শুনিয়েছিল। তেমনি কামু-র নায়ক জঁ-ব্যাপ্তিস্ত ক্ল্যামেন্স আমস্টার্ডাম শহরের 'নিউ মেক্সিকো' রেস্তোরাঁয় বসে ক্ষণিকের পরিচিতের কাছে নিজের অতীত জীবনকে উদ্‌ঘাটিত করে দেবার জন্য ব্যগ্র। বৃদ্ধ নাবিকের মতো ক্ল্যামেন্সের জীবনও শেষ হয়ে গেছে। অতীতের অনুতপ্ত রোমন্থনই এখন তার একমাত্র কাজ।

ক্ল্যামেন্স প্যারিসের প্রতিষ্ঠাপন্ন আইন ব্যবসায়ী। অনাথ, বিধবা ও দরিদ্র মক্কেলদের মামলা বিনা পারিশ্রমিকে সে পরিচালনা করে। অর্থের লোভ তাকে মিথ্যা মামলা তদারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কখনো প্ররোচিত করতে পারেনি। সকলের সঙ্গে তার সহৃদয় ব্যবহার। শুধু আইনজীবী হিসাবে নয়, একজন রুচিবান, উদার-হৃদয় নাগরিক হিসাবেও প্যারিসের সমাজে তার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ল্যামেন্সের অবচেতন মনে বেশ খানিকটা গর্ববোধ লুকানো ছিল। কিন্তু সমাজের উপর তলায় স্থান পাবার আত্মপ্রসাদ তার ব্যবহারে ঘুণাক্ষরেও বোঝবার উপায় নেই।

পর পর দু'টি ঘটনায় ক্ল্যামেন্স তার জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। যে জীবন শ্রদ্ধায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় এবং আত্মপ্রসাদে পূর্ণ ছিল হঠাৎ তার মধ্যে অতলস্পর্শ ফাঁকির গহ্বর দেখতে পেয়ে সে চমকে উঠল। প্রথম ঘটনাটি ঘটল রাজপথের উপরে। ক্ল্যামেন্সের গাড়ির সামনে এক মোটর-সাইকেল-আরোহী অন্যায়ভাবে দাঁড়িয়ে গেল। অগ্রসর হবার সবুজ সংকেত যখন পাওয়া গেল তখন মোটর-সাইকেলের দম নেই, প্রাণপণে দম দেবার চেষ্টা করেও আরোহী সফল হতে পারছে না। ক্ল্যামেন্স এবং তার পিছনে আরো অনেকগুলি গাড়ি সবুজ সংকেতের সংকীর্ণ সময় বৃথা চলে যাচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। গাড়ি থেকে নেমে সে বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে সাইকেল আরোহীর কাছে এগিয়ে এল; আর ঠিক তখনই দম পেয়ে ফটফট শব্দ করে সাইকেল অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার তার গাড়ি পিছনের গাড়িগুলির পথ আটকে আছে। ক্রমাগত হর্ন বাজতে শুরু হয়েছে। ক্ল্যামেন্স নিজের গাড়িতে ফিরে আসবার সময় শুনতে পেল সমবেত জনতার মধ্য থেকে কে একজন তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'সিলি অ্যাস্'। ক্ল্যামেন্সের পরনে নীল রঙের দামী পোশাক; বেশ মর্যাদাব্যঞ্জক চেহারা। এমন লোকের সম্বন্ধে এরূপ অবমাননাকর মন্তব্য জনতা উপভোগ করল। যারা উপরে আছে, তাদের নিচে টেনে আনবার মধ্যে একটা কুটিল আনন্দ পাওয়া যায়, সে টেনে নামানোর মধ্যে কোনো যুক্তি না থাকলেও।

এই দু'টি কথা ক্ল্যামেন্সকে কশাঘাত করল। এক নিমেষে সে উপলব্ধি করল, মিথ্যা তার এতদিনের সামাজিক প্রতিষ্ঠার গৌরব। এতগুলি লোকের সামনে অকারণে যদি এমনভাবে অপমানিত হতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার সামাজিক মর্যাদার গৌরব একান্তভাবেই ফাঁকির উপরে দাঁড়িয়ে ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো গভীরভাবে তার মনে আঘাত করল। এক রাত্রিতে একটি তরুণী প্রায় তার চোখের সামনেই পুলের উপর থেকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আত্মহত্যা করবার জন্য। ক্ল্যামেন্স সব জেনেও দ্রুতপায়ে বাড়ি ফিরে এল। মেয়েটিকে রক্ষা করবার জন্য জলে ঝাঁপ দিতে পারল না। অথচ তার উপচিকীর্ষা সর্বজন-বিদিত। তবু একটু সাহস কেন তার হল না? অতি সাধারণ শ্রেণীর লোকও এ-ধরনের উদ্ধারকার্যকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে। নিজের প্রতি মাত্রাহীন ভালোবাসার জন্যই কি সে পারেনি? তাহলে তার যত দয়া, সৌজন্য ও মানবতাবোধ একেবারেই কি ফাঁকি? এই প্রশ্ন তাকে ক্রমাগত পীড়া দিতে লাগল।

এর পর থেকে ক্ল্যামেন্স মাঝে মাঝে হঠাৎ শুনতে পায় কে যেন হাসছে। কার হাসি? চারদিকে চেয়ে দেখে কেউ নেই। জীবনের ফাঁকি ধরা পড়ায় তার বিবেক হেসে ওঠে। ক্ল্যামেন্সের মনের শান্তি ঘুচে গেল। সে শুরু করল আত্মবিশ্লেষণ। উপলব্ধি করল, আত্মপ্রেমই মানুষের জীবনে একমাত্র সঞ্চালক। প্রণয়িনীর প্রতি প্রেম, বন্ধুর জন্য ভালোবাসা, অন্যের ভালো করবার প্রবৃত্তি,—এই সবকিছুর পশ্চাতেই আছে নিজের প্রতি গভীর আসক্তি; যে উপচিকীর্ষা নিয়ে সে গর্ব করত তার মধ্যেও যে কত বড় ফাঁকি লুকিয়ে ছিল তা এখন বুঝতে পারে। আজ সে প্রশ্ন করে, তার পরোপকারবৃত্তি যদি নিষ্কলুষ হয় তাহলে উপার্জিত অর্থ সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করেনি কেন? রাস্কিনের মতো সে এখন উপলব্ধি করছে যে চার পাশের দুঃখের মধ্যে শুধু নিজেকে নিয়ে সুখে থাকবার চেষ্টা বিবেক কখনো ক্ষমা করে না।

আমরা প্রত্যেকেই দ্বৈত জীবন যাপন করি। বাইরের পালিশ-করা মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে আমাদের স্বার্থকলঙ্কিত জীবন। চাকচিক্যময় মুখোশটাকেই জীবন মনে করে সে ভুল করেছে। এখন জানতে পেরেছে নিজের সত্য পরিচয়, মনের অন্ধকার গুহায় যে পরিচয় এতদিন লুকিয়ে ছিল। নিজেকে জেনে সে সমাজকেও জানতে পেরেছে। যে প্যারিসের বিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে এতদিন ডুবে ছিল এখন সেই প্যারিসকেই মনে হয় 'a magnificent dummy-setting inhabited by four million silhouettes'. ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকেরা বর্তমান যুগের মানুষ সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য একটি বাক্যেই শেষ করতে পারবেন। সেই সর্বার্থবোধক বাক্যটি এই: 'he (modern man) fornicated and read the papers'.

জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ক্ল্যামেন্স আইন-ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমস্টার্ডামে 'নিউ মেক্সিকো' রেস্তোরাঁয় বসে সে তার অতীত জীবনের কাহিনী বলছে। একটি দীর্ঘ 'মনোলগ'। যেন নিজেকে সে অভিযুক্ত

করছে। তার বিবেক-দংশন পাঠকের বিবেকও সচেতন করে তোলে। এখানেই এই বইয়ের সার্থকতা। ব্যক্তিবিশেষের বিচার নয়, আধুনিক সমাজের বিশ্লেষণ ; সমাজের বিবেককে চাবুক মেরে সচেতন করবার প্রয়াস। কামুর আঙ্গিকই এই উদ্দেশ্যের সহায়ক। মনে হয়, নায়ক যেন পাঠকের সামনে বসে কথা বলছে ; তার কথা শোনবার জন্য আর কেউ উপস্থিত নেই। তাই প্রত্যেকটি শব্দের ভার অনেক গুণ বেশি হয়ে পাঠকের মনের উপর আঘাত করে।

বইটিকে উপন্যাস বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ আছে। নায়কের বিবেক-দংশনের ক্রমাভিব্যক্তির যে নিপুণ বিশ্লেষণ আছে তা যতটা মনোবিজ্ঞান বা দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়ে করা হয়েছে, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি দিয়ে ততটা নয়। স্বীকারোক্তির পরিবেশটি ইঙ্গিতময়। শহরের বৃত্তাকার পরিখার উপর গাছের পাতা ঝরে পড়েছে, বদ্ধ জলাশয় থেকে পচা পাতার গন্ধ উঠছে ; কখনো সেই পরিখার ধারে বসে, কখনো বা মৃত সমুদ্র জাইডার জী-র উপর দিয়ে নৌকা করে যেতে যেতে ক্ল্যামেন্স তার কাহিনী বলছে। বিবেকহীন বিবর্ণ জীবনের উপযুক্ত পরিবেশ। কোলরিজের বৃদ্ধ নাবিকের অস্বাভাবিক ভাস্বর দৃষ্টি যেমন বরযাত্রীকে বন্দী করেছিল, তেমনি ক্ল্যামেন্সের বিবেক-দংশনের তীব্র যন্ত্রণা প্রথম থেকেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। এই জীবনযন্ত্রণা তো শুধু নায়কের নয়, সে যন্ত্রণার বলি পাঠকও। এই অনুভূতির চেতনা পাঠককে এগিয়ে নিয়ে যায়। চেতনা জাগাবার কৃতিত্ব লেখকের। মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস ভবিষ্যতে কি রূপ লাভ করবে আলোচ্য বইখানি হয়ত তার পূর্বাভাস। কিংবা জীবন সম্বন্ধে একটি গভীর তত্ত্বকে কতটা সহজ ও সুখপাঠ্য করা যায় এটি তারও উদাহরণ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কামু-র রচনাবলীর মধ্যে The Fall একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাসের চরিত্রগুলি ক্ল্যামেন্স-এর মতো জটিল নয়। তাই লেখক যথাসম্ভব ব্যক্তিনিরপেক্ষতা বজায় রেখে চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এখানে ক্ল্যামেন্স-এর মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রসারটা সুস্পষ্ট। এর চেয়ে বড় কথা কামু-র নতুন জীবন-দর্শন। তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস The Outsider এবং The Plague-এ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেই মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্টের জন্য পরোক্ষে দায়ী করা হয়েছে। হিটলারিজম, স্ট্যালিনিজম, রাজনৈতিক চক্রান্ত, যুদ্ধ প্রভৃতি বাহ্যিক ঘটনা ও পরিস্থিতি আমাদের দুঃখের কারণ। আমরা এদের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে কামু বাহিরকে উপেক্ষা করেছেন। দেখিয়েছেন নিজেদের চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য আমরা দুঃখ পাই, আমাদের পতন ঘটে।

জীবনের এই গভীরতর উপলব্ধির দ্বারা কামুর সাহিত্য নিছক সাময়িক সমস্যার আবর্ত থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

আধুনিক ফরাসী-সাহিত্যের পুরোবর্তী লেখকদের মধ্যে অঁরি দ্য মঁতেরলাঁ অন্যতম। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে আধুনিক ফরাসী লেখকরা যখন ঘরোয়া পরিবেশে মনোবিশ্লেষণমূলক কাহিনী রচনায় ব্যস্ত তখন মঁতেরলাঁর রচনায় বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেয়ে পাঠকরা তৃপ্তি লাভ করেছিল। মঁতেরলাঁ প্যারিসের সংকীর্ণ পরিবেশে তাঁর গল্পের প্রাণ বন্দী করতে চাননি; মনের অন্ধকার গলিপথে না ঘুরে উত্থান-পতনে ক্ষুব্ধ ঘটনাবহুল জীবনের রূপ তিনি বাইরে থেকে দেখাতে চেয়েছেন। পরিমার্জিত নাগরিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ তাঁর নেই। আদিম জীবনের উদ্দাম প্রকৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। এই আকর্ষণের মূলে স্পেনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে।

মঁতেরলাঁ উত্তর আফ্রিকার মরুময় অঞ্চলকে তাঁর উপন্যাসের পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সেখানকার প্রকৃতি, বেদুইন ও অন্যান্য অধিবাসীর সংস্পর্শে ফরাসী নর-নারীর জীবন কি ভাবে পরিবর্তিত হয়, কেমন করে সভ্যসমাজের রীতি-নীতি ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যায় এবং মানুষের আদিম প্রবৃত্তির প্রেরণা প্রাধান্য লাভ করে—তাঁর অধিকাংশ কাহিনীর বিষয়বস্তু হল এই। আফ্রিকার অধিবাসীদের প্রতি মঁতেরলাঁর আছে গভীর সহানুভূতি। ফরাসী আকাদেমি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিয়ে তাঁকে যখন সম্মানিত করলেন তখন তিনি পুরস্কারের সম্পূর্ণ অর্থ (দশ হাজার ফ্রাঁ) মরক্কোর রেডক্রশের হাতে দিয়ে বললেন, টাকাটা সাম্রাজ্যরক্ষী ফরাসী বাহিনী ও মরক্কোর বিজিত বিদ্রোহীদের মধ্যে সমান ভাগ করে দিতে।

মঁতেরলাঁর রচনায় প্রেমই মুখ্য অনুভূতি হিসাবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু সে প্রেম সভ্য-সমাজের নানা বাধা-নিষেধ অতিক্রান্ত পরিস্রুত প্রেম নয়; আবেগের প্রচণ্ডতায় তা আবিল, সামাজিক বিধিবহির্ভূত এবং আদিম মানবের সহজ কামনার সগোত্র। মঁতেরলাঁ তাঁর প্রেমের কাহিনীতে মেয়েদের প্রতি অবিচার করেছেন বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। মেয়েদের অন্যায়ভাবে ছোট করে দেখানো হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। তাঁর চার খণ্ডের সুবৃহৎ উপন্যাস 'Les Jeunes filles' সম্বন্ধে আঁদ্রে জিদ মন্তব্য করেছেন যে, এটি হল 'an eloquent offensive against women.'

মঁতেরলাঁর নতুন উপন্যাস 'Desert Love' কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হল লেখকের মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন; এই কাহিনীতে মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনো মন্তব্য নেই। বরং এক অপ্রাপনীয়া কিশোরীর জন্য নায়কের জীবন কিরূপ দুঃখময় হয়ে উঠেছিল তার মর্মস্পর্শী কাহিনী মেয়েদের শক্তির পরিচয় দেয়। মঁতেরলাঁ বলতেন, মেয়েদের

জীবনে আনন্দের একমাত্র উৎস হল পুরুষ, কিন্তু পুরুষ তার আনন্দের জন্য নারীর মুখাপেক্ষী নয়, নিজের জীবনের সাধনার মধ্যেই রয়েছে তার আনন্দের উৎস। নারী যদি অনধিকার প্রবেশ না করে তা হলে পুরুষের জীবনের আনন্দ-প্রবাহ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা নেই। আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক কিন্তু নিজের কাজের মধ্যে আনন্দের উৎস খুঁজে পায়নি; সে আনন্দ পেতে চেয়েছিল একটি মেয়েকে জয় করে।

এই কাহিনীর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর মনোবিশ্লেষণ। পূর্ববর্তী রচনায় মঁতেরলাঁ ঘটনার উপর যত জোর দিয়েছেন, মনোবিশ্লেষণের উপর ততটা দেননি। কিন্তু এখানে বাইরের ঘটনা গৌণ; নায়কের মনের ছবিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই সব নতুন লক্ষণগুলি মঁতেরলাঁর সাহিত্য-জীবনে পরিবর্তন সূচনা করে। শুভ সূচনা।

'ডেজার্ট লভ' মঁতেরলাঁর বড় উপন্যাস 'বালির গোলাপের' একটি অংশ। 'বালির গোলাপের' প্রেমের কাহিনীটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাসে পরিণত করে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে এখানে চরিত্রের ভিড় নেই; ঘটনার জটিলতা নেই; একটি প্রগাঢ় অনুভূতির সরাসরি আবেদন সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখে।

লুসিয়েন ওলিনি বিদ্যালয়ের পড়া সমাপ্ত করে সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করেছে। তার পিতৃকুল ও মাতৃকুল সেনা-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও উত্তরাধিকার সূত্রে সৈনিক-জীবনের যোগ্যতা সে লাভ করেনি। ওলিনি সংস্কৃতিবান নয়; বুদ্ধিমত্তার দিক থেকেও তার স্থান তৃতীয় শ্রেণীতে নির্দেশ করতে হয়। নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা তার নেই বললেই চলে। এগুলি তার জন্মগত চারিত্রিক ত্রুটি। অভিজাত পরিবারে লালিত হয়ে এবং প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ পেয়েও এ সব ত্রুটি দূর হয়নি।

অবশ্য ওলিনির চরিত্রে বিশেষ কতগুলি গুণও ছিল। নিজের চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান তার যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। সে কর্তব্যপরায়ণ, সৎ এবং গম্ভীর। চালাক-চতুর না হলেও এই সব গুণের জন্যই ধীরে ধীরে তার পদোন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায় এবং লেফটেন্যান্টের কর্তব্য মোটামুটি সন্তোষজনক রূপেই বর্তমানে করে যেতে পারছে। মা ছেলের ভাবালুতার জন্য খুব উদ্বেগ বোধ করেন। ওলিনির চরিত্রের এটা মস্ত বড় ত্রুটি। কখনো কখনো একটা বিড়ালের বেদনাতেও সে সারা দিন অস্বস্তি বোধ করে। সৈনিকের জীবনে এরূপ ভাবালুতা বৃহৎ অন্তরায়।

আর একটি কারণেও মা উদ্বেগ বোধ করেন। মেয়েদের প্রতি সহজ আকর্ষণের অভাব দেখে মা'র মনে আশঙ্কা হয় ছেলের হয়ত কখনো বিয়ে হবে না। ১৯৩১ সালে সাতাশ বছর বয়স হল; তথাপি ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের এক উচ্চপদস্থ তরুণের কোনো মেয়ে-বন্ধু নেই। মা উপর তলায় কলকাঠি নেড়ে পুত্রের মঙ্গলের আশায় তাকে উত্তর আফ্রিকায় বদলি করালেন। মনে ছিল কুটিল আশা যে, নিঃসঙ্গ কর্মহীন মরুভূমির জীবনে ওলিনির মন মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। স্থানীয় মেয়েরা

সহজলভ্য। একবার যদি হৃদয় জ্বলে ওঠে তা হলে আফ্রিকান মেয়ের ইন্ধন বদলে প্যারিসের মেয়ে যোগান দেওয়া যাবে। সে আর এমন কঠিন কাজ কী!

ওলিনি এসে পৌঁছল মরক্কোর অন্তর্গত ক্ষুদ্র এক সেনা-শিবিরে। নতুন জায়গায় গুছিয়ে নেবার কাজ দু'দিনেই শেষ হয়ে গেল। শিবিরে আলাপ করবার মতো লোক আছে মাত্র দু'জন। শিকারে তার আসক্তি নেই। সঙ্গে যে বইগুলি এনেছে তা অনেকবার পড়া হয়ে গেছে। কর্মহীনতার যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে তাকে পিষ্ট করছে। এই যন্ত্রণাকে তীব্রতর করেছে মরুভূমির পরিবেশ। শিবিরের চারপাশে স্থানীয় অধিবাসীদের ছোট ছোট কয়েকটি বস্তি; তারপরে চতুর্দিকে দিগন্ত-বিস্তৃত ধু-ধু বালির সমুদ্র। সেই বালির সমুদ্র কখনো কখনো আকাশ গ্রাস করতে চায়; লু উড়ে আসে। দরজা-জানালা বন্ধ করে বিছানার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয় তখন। দম বন্ধ হয়ে আসে, গা জ্বলে যায়। কয়েকবার লু বয়ে গেলে দেহ ফোড়ায় কণ্টকিত হয়, ফোস্কা পড়ে, দেহ-মন গভীর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়। এই অবসাদের গহ্বর থেকে দেহকে উদ্ধার করবার উপায় কি? মনে পড়ল নারীদেহের বিদ্যুৎস্পর্শের কথা।

একদিন বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে খেজুর-কুঞ্জে একটি আরব কিশোরীকে দেখে ওলিনি মুগ্ধ হল। সে শুনেছে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকে মেয়েকে ফরাসী অফিসারের হাতে তুলে দিতে পারলে সম্মানিত বোধ করে। সমাজে সে মেয়ের মূল্য বেড়ে যায়। এই সংবাদের উপর নির্ভর করে ওখানকার একমাত্র দোকানদার ইয়াহিয়ার সাহায্যে সে মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। মেয়েটির নাম রাখমা। অর্থের বিনিময়ে সে ওলিনির কাছে আসতে সম্মত হয়েছে। ইয়াহিয়া তাকে বলে দিল, রাখমা খুব ভালো মেয়ে, এ-পথে তার এই প্রথম আসা; তার সঙ্গে যেন ভালো ব্যবহার করে। ওলিনি স্বীকার করল ইয়াহিয়ার শর্ত।

গ্রামের সীমানার বাইরে ইয়াহিয়ার বাড়ি। সেখানে এখন কেউ থাকে না। সেই বাড়িতে দুপুর বেলাটা রাখমার সঙ্গে কাটায় ওলিনি। আরবী নামটা বদলে ওলিনি ওর নাম রেখেছে র‍্যামি। র‍্যামি আশ্চর্য মেয়ে। প্রতিদিন ঠিক সময়মত আসে, কথা নড়চড় হয় না। ওর যেন নিজের কোনো ইচ্ছা নেই; সব কথাতেই বলে, 'আপনার যা ইচ্ছা।' প্রথম প্রথম তার মধ্যে পুরুষের প্রতি নারীর স্বাভাবিক আগ্রহের একান্ত অভাব লক্ষ্য করে ওলিনি বিস্মিত হল। তথাপি তার খুব ভালো লাগল এই সরল, অনভিজ্ঞা, স্বল্পবাক্ কিশোরীকে। তার পরিচিত ফরাসী মেয়েদের মতো র‍্যামি নয়; সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মেয়ে। র‍্যামির এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ওলিনি তার প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে লাগল। র‍্যামি ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে কথা বলে। তার জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। একদিন সে অ্যাস্পিরিন খাচ্ছিল; তা দেখে র‍্যামি বলল, আমাকেও একটা সাদা বড়ি দিন, খাব।

ওলিনি জানতে চাইল, কেন, তোমার মাথা ধরেছে?

—না; মাথা ধরেনি। আমি ঐ বড়ি কখনো খাইনি কি-না!

আবার হয়তো জিজ্ঞাসা করে, জার্মানীর সংলগ্ন যে চীন দেশ আছে সেখানে আপনি গিয়েছেন ?

তিন মাস ক'দিনে হয় তা সে জানে না, এমনি তার জ্ঞানের পরিচয়। তাই বলে র‍্যামি বোকা নয়। তার ব্যক্তিত্ব আছে, আর সে ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ওলিনিকে মুগ্ধ করেছে। ওলিনি নিজে খুব চালাক-চতুর নয়, য়ুরোপের অভিজাত পরিবারের ছেলেদের মাপকাঠিতে তার জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ। প্যারিসের কোনো অভিজাত তরুণীর সংগে এমন অন্তরঙ্গভাবে মিশতে গেলে নিজের চারিত্রিক ত্রুটির জন্য হয়ত হীনমন্যতা এসে বাধা দিত। কিন্তু এখানে র‍্যামির সামনে নিজেকে সব দিক থেকেই অনেক বড় মনে হয় ; শুধু সামাজিক মর্যাদায়, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে ও সংগতিতে নয়, বয়সেও সে অনেক বড়। তাই এতদিনের নিরুদ্ধ আবেগ র‍্যামিকে ঘিরে উৎসারিত হতে পেরেছে। ওলিনির এখন মনে হয় সে তার সমবয়স্ক কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারবে না। র‍্যামি অনেক ছোট, তার মধ্যে ওলিনি যেন কন্যা ও প্রিয়াকে এক সংগে পেয়েছে। ছোট আর সরল বলেই কেমন একটা গভীর মমতা জেগেছে। এমন চমৎকার মেয়ে, কোনো এক নোংরা মুর্খ আরবের সংগে বিয়ে হয়ে জীবনটা ওর মাটি হয়ে যাবে। যৌনানুভূতি থিতিয়ে পড়েছে ; র‍্যামির দিকে চেয়ে চেয়ে ওলিনির হৃদয় করুণায় ভরে যায়। অন্ধ অকারণ করুণা। ভালোবাসার চেয়ে শক্তিশালী সেই কারুণ্য ওলিনিকে যেমন শক্তি দিয়েছে, তেমনি করেছে দুর্বল। র‍্যামিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আরব জাতিকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। শিবিরের আরব-সৈন্যদের কি ভাবে মংগল করা যায় তার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

র‍্যামির সংগে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে তাদের সম্পর্ক কেমন করে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে, কেমন করে ওলিনির হৃদয় দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এবং আস্থা ও সংশয়ের দোলায় ক্ষুব্ধ হয়েছে, তারই মনোজ্ঞ বিবরণ এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ ; ঘটনা নেই বললেই চলে। যে যৌন-আকর্ষণের তাড়নায় র‍্যামিকে সে ডেকেছিল, এখন তা শান্ত হয়েছে। র‍্যামির পাশে চুপ করে শুয়ে থেকে আশ্চর্য প্রশান্তি লাভ করে ওলিনি। র‍্যামির দেহ তার কাছে আর বড় নয় ; দেহাতীত আত্মার দানের জন্য সে লালায়িত। নতুন-জাগা চরের মতো নবীন ও প্রচুর সম্ভাবনাময় র‍্যামির হৃদয়। সেখানে কোনো আবিলতা নেই, ছল নেই, সামাজিক সভ্যতার পর্দার আড়াল নেই। সেখানে একটু স্থান চায় ওলিনি।

কখনো মনে হয় স্থান পেয়েছে, আবার মনে হয় পায়নি। র‍্যামি কোনোদিন ওলিনির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বোধ করে না। কোনোদিন তার জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেনি। এই ঔৎসুক্যহীনতাকে ওলিনি বড় করে দেখেনি। ভেবেছে, এটা ওর স্বভাব।

মাঝে মাঝে তন্দ্রার ঘোরে র‍্যামি বলে ওঠে, 'যাও, তুমি চলে যাও।' তখন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে ওলিনির মুখ। তার সোহাগের আবেশে র‍্যামি ঘুমিয়ে পড়লে কখনো কখনো র‍্যামি স্বপ্ন দেখে। কার স্বপ্ন ? উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে ওলিনি।

না, তার স্বপ্ন নয়। একান্ত সহজভাবে র‍্যামি বলে, 'মা-কে স্বপ্ন দেখছিলাম।'

কয়েক বছর আগে তার মা'র মৃত্যু হয়েছে।

যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ র‍্যামির ব্যবহারে অভিযোগ করবার কিছু থাকে না। ওলিনি তখন সব সংশয় ভুলে যায়।

কয়েক মাস পরে ওলিনি এই শিবির ত্যাগ করে যাবে অন্যত্র। র‍্যামিকে ছেড়ে থাকবার কথা সে ভাবতে পারে না। র‍্যামিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে স্থির করল; ও রাজী। র‍্যামির বাবাকেও রাজী করাল কিছু টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিতে। কিন্তু এর পর থেকে কেমন একটা পরিবর্তন অনুভব করতে লাগল র‍্যামির মধ্যে। র‍্যামি যদিও মুখে বলছে সে সঙ্গে যাবে তবু তার মন যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। একদিন নির্দিষ্ট সময়ে র‍্যামি এল না। এতদিনের মধ্যে এই তার প্রথম বিচ্যুতি। ইয়াহিয়ার নির্জন বাড়িতে যন্ত্রণাবিদ্ধ অবস্থায় বিকেলটা কাটল ওলিনির। সেইদিন সে প্রথম উপলব্ধি করল একটি মেয়ের কাছে কী নিরুপায়ভাবে সে আত্মসমর্পণ করেছে। আর সে মেয়ে সামাজিক মর্যাদায় ও বিদ্যায়-বুদ্ধিতে তার তুলনায় কত তুচ্ছ! নিজেকে যখন ধীরে ধীরে র‍্যামির হাতে নিঃশেষে তুলে দিয়েছে তখন এ-সব তুলনা মনে আসেনি। র‍্যামি এত বড় দানকে গ্রহণ করল না। এই প্রত্যাখ্যানের বেদনা তাকে অসহায় করে তুলল। র‍্যামি নিকটে ঘুরে বেড়াবে, অথচ ওলিনির কাছে আসবে না, এমন পরিবেশে বাস করা তার পক্ষে অসম্ভব। ওলিনি অসুস্থতার ওজর দেখিয়ে বদলি হয়ে গেল।

চলে আসবার আগে একবার র‍্যামির সঙ্গে দেখা করে আসবার ইচ্ছা ছিল ওলিনির। কসাইয়ের দোকানে দেখা হল। বলল, সে চলে যাচ্ছে। ভেবেছিল চলে যাবার সংবাদ শুনে র‍্যামি তার পিছনে পিছনে আসবে, সুযোগ মতো নির্জন কোনো জায়গায় তাদের কথা হবে, কিন্তু একটু এগিয়ে যখন ফিরে চাইল, তখন দেখল তার দিকে চেয়ে কসাই ও র‍্যামি হেসে হেসে কি যেন বলছে। কেন যে এক উজ্জ্বল জীবনধারা হাতের মুঠিতে এসেও আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে অদৃশ্য হয়ে গেল সে-প্রশ্নের উত্তর পেল না ওলিনি।

একটি ফরাসী সাপ্তাহিক পাঠকদের জিজ্ঞাসা করেছিল: কোন্ ফরাসী লেখকের রচনাবলী ২০০০ সালে সব চেয়ে বেশি সমাদৃত হবে? মঁতেরলাঁর রচনাবলীর পক্ষে পড়েছিল সর্বাপেক্ষা বেশি ভোট। আলোচ্য উপন্যাসটি ঐ মতের সমর্থন দৃঢ়তর করবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের ঘটনা অবলম্বন করে য়ুরোপীয় সাহিত্যে কয়েকটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হিংস্রতায় ভীষণতর হলেও য়ুরোপ-আমেরিকা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছে এমন প্রমাণ বেশি পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবলম্বনে রচিত যে-কটি উপন্যাস এ-পর্যন্ত বেরিয়েছে তার মধ্যে জাপানী লেখক Shohei Ooka-রচিত Fires on the Plain যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু যুদ্ধ-সাহিত্যের সংকীর্ণ গণ্ডিতে এ-বইয়ের দান আবদ্ধ থাকবে না। কারণ, যুদ্ধকে পটভূমিকায় রাখা হয়েছে, যুদ্ধের বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করেনি। শত্রুর নৃশংসতা বড় করে দেখিয়ে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলবারও চেষ্টা করেননি লেখক। শত্রুকে প্রায় নেপথ্যেই রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়িত এক জাপানী সৈন্য চরম দুঃখ-দুর্দশার তাড়নায় কি ভাবে ধীরে ধীরে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে এসেছিল, তারপরে বিবেকের দংশনে কেমন করে তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল, তার মর্মন্তুদ চিত্র লেখক এঁকেছেন। যুদ্ধ, রাজনীতি এবং নারীদেহ কেন্দ্র করে সৈনিকের উন্মত্ততা প্রাধান্য লাভ করেনি। নারী প্রায় অনুপস্থিত এই কাহিনীতে। একটি সাধারণ সুস্থ-বুদ্ধি মানুষ ক্ষুধা ও মৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণায় কেমন করে ধীরে ধীরে মনুষ্যত্ব হারাতে লাগল তার একান্ত বাস্তব কিন্তু নিষ্ঠুর বর্ণনা পড়তে পড়তে পাঠক শিউরে উঠবেন। এ বই ইউরোপ-আমেরিকায় প্রথম প্রকাশিত হলে সাড়া পড়ে যেত।

জাপানী ভাষায় বইটির নাম 'নোবি'। ইংরেজী অনুবাদ থেকেই মূল কাহিনীর উৎকর্ষ যে কতগুণ বেশি তার আভাস পাওয়া যায়। উকা জাপানী ভাষায় কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। এটি প্রথম ইংরেজী অনুবাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন ফরাসী ভাষা। সাহিত্যিক জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর তিনি ফরাসী সাহিত্যের কতকগুলি প্রসিদ্ধ বই জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন। স্তাঁদাল তাঁর প্রিয় লেখক। ১৯৪৪ সালে তিনি জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে ফিলিপাইন যান। সেখানে পর বৎসর আমেরিকানরা তাঁকে বন্দী করে। উকা বর্তমানে জাপানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলেই হয়ত উকার রচনা বাহুল্যবর্জিত, আতিশয্যবিহীন এবং মর্মস্পর্শী ও ইঙ্গিতময় হতে পেরেছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ছোট একটি দ্বীপে জাপানী বাহিনী অবতরণ করেছে। তামুরা এই বাহিনীর একজন সাধারণ সৈন্য। জাহাজ থেকে নামবার পরেই তামুরার মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়ল ক্ষয়রোগ। অস্থায়ী সামরিক হাসপাতালে গেল চিকিৎসার জন্য। কয়েক দিন পরে হাসপাতাল থেকে মুক্তি

পেয়ে সে যখন ফিরে এল তখন তার উপরওয়ালা কর্তা তো রেগে আগুন ! তামুরা তখনও অসুস্থ, তাকে দিয়ে কোনো কাজই হবে না। শুধু বসে বসে খাবে। আর এদিকে জাপানী-বাহিনীর সংকটজনক অবস্থা। খাদ্যভাণ্ডার ফুরিয়েছে। জাপানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। আক্রমণে যে চমকপ্রদ সাফল্য হবে আশা করা গিয়েছিল তা হয়নি।

আমেরিকানরা এসে পড়েছে, ফিলিপিনো অধিবাসীরা গরিলা বাহিনী গড়ে তুলেছে। এই সঙ্কটের দিনে অকর্মণ্য সৈন্যের দায়িত্ব নিয়ে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করার অর্থ হয় না। কর্তা নির্মমভাবে বললেন, 'এই শিবিরে তোমার স্থান হবে না।'

'তাহলে কোথায় যাব ?'

গর্জে উঠলেন কর্তা, 'যেখানে দু'চোখ যায়। না হয় আবার হাসপাতালে ফিরে যাও। সত্যাগ্রহ করো, যতক্ষণ ভর্তি না করে ততক্ষণ দরজা ছেড়ে উঠবে না।'

দয়া করে শিবির থেকে ছ'টি গোল আলু তাকে দিয়ে দিল। এই সম্বল করে সে আবার চলল হাসপাতালের পথ ধরে। নিশ্চিত জানে সেখানেও তার স্থান নেই ; তবু আর কোথায় যাবে ? এই একটিমাত্র পথ তার পরিচিত। পদে পদে গরিলাদের ভয়, মাথার উপর আমেরিকান বোমারু কখন গর্জন করে উঠবে ঠিক নেই। শরীর ক্লান্ত। তবু এসে পেঁছিল হাসপাতালের সামনে। সেখানে আরও কয়েকজন নিরুপায় রুগ্ণ জাপানী সৈন্য ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষও নিরুপায়। খাদ্যসংকট সেখানেও, তাই রোগী ভর্তি সম্ভব নয়। তার মতো যারা দুর্ভাগা তাদের সঙ্গ পেয়ে তামুরা অনেকটা স্বস্তি লাভ করল। কিন্তু এইটুকু সান্ত্বনাও তার কপালে সইল না। আমেরিকান বোমা হাসপাতাল ধূলিসাৎ করে দিল।

বোমার আঘাতে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে ঠিক নেই। তমুরা এবার পাহাড় ও বনের মধ্য দিয়ে পথ চলছে। গরিলা বাহিনীর অকস্মাৎ আক্রমণে যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। যে পথেই আসুক না, মৃত্যু যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে, তাতে সন্দেহ নেই। কাঁচা ঘাস-পাতা খেয়ে আর ক'দিন বাঁচবে ? যদি বাঁচেও, তবু শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে হবে। এই দ্বীপ থেকে বের হবার উপায় নেই। অনেক দিন পরে পা থেকে বুট জুতাটা খুলে তামুরা আশ্চর্য হয়ে গেল। মানুষের পা বলে চেনাই যায় না। যেন পাখির পা। এত শুকিয়েছে। হাতের অবস্থাও তেমনি। হ্যাঁ, আর দেরি নেই। এখন সে প্রায়ই দেখতে পায় পথের উপরে মৃতদেহ পড়ে আছে। একটু লক্ষ্য করলেই চিনতে পারে, এ-মৃতদেহ তার নিজের। এমনি মনের বিকারে ভুগছে আজকাল। রাত্রিতে জ্যোৎস্নায় শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না। গাছ-পালাগুলি যেন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে সামনে এসে দাঁড়ায়। ঐ কিশোর নারকেল গাছটা হঠাৎ রূপসী তম্বীর রূপ গ্রহণ করে। এই মেয়েটিকে সে ভালোবেসেছিল। কিন্তু প্রতিদান পায়নি। আর ঐ ঝাঁকড়া গাছটিকে তো আর চেনা যায় না ! ঐ তো টোকিওর সেই পুষ্টদেহী

রমণী যাকে প্রত্যাখ্যান করে বেদনা দিয়েছে। এমনি করে সে কেবল ছায়া দেখে। শস্যহীন শূন্য প্রান্তরে আলেয়া দেখা দিয়ে বিভীষিকা আরো বাড়িয়ে তোলে।

ঘুরতে ঘুরতে তামুরা একটা টিলার উপরে খুঁজে পেল পরিত্যক্ত আবাদের সন্ধান। মাটির নিচে আলু আছে। তুলে পেট ভরে খেল। রবিনসন ক্রুসোর মতো এখানেই সে স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করতে পারত। কিন্তু তার দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে মারাত্মক রোগ, আর বাহিরের শত্রু কখন অতর্কিতে আক্রমণ করবে কে জানে ?

কাঁচা আলু খেয়ে খেয়ে পেটের অসুখে ভুগছে তামুরা। আগুনের ব্যবস্থা করতে পারলে দিনগুলি ভালোই কাটত। জ্যোৎস্না রাত্রিতে টিলার উপর থেকে অনেক দূরের একটা গির্জার চূড়ার ক্রুশ দেখা যায়। ঐ ক্রুশটা তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণ সে কিছুতেই এড়াতে পারল না। বিপদ আছে জেনেও একদিন বেরিয়ে পড়ল গ্রামের পথে। নির্জন পরিত্যক্ত গ্রাম, রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে আছে। হিংস্র কুকুর তাকে এসে তাড়া করল। সব এড়িয়ে সে গির্জায় এসে পৌঁছল। কেন এই আকর্ষণ? হয়তো আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস। তবু যে ক'টা দিন বাঁচবে সে-ক'টা দিন একটু ভাল করে বাঁচতে পারলে মন্দ হয় না। পাদ্রির ঘরে প্রবেশ করল দিয়াশলাইয়ের খোঁজে। ঘর শূন্য, আগেই সব লুঠ হয়ে গিয়েছে। গভীর ক্লান্তিতে তামুরা একটা চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাত্রিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘরে মানুষের শব্দ। তামুরা উঠে এগিয়ে গেল। দু'টি ফিলিপিনো স্ত্রী-পুরুষ। তাকে দেখেই ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ হল তামুরা। তাকে দেখে ভয় পাবার কি আছে ? সে শুধু একটা দিয়াশলাই চায়। কোন্ এক অন্ধ প্রেরণায় তামুরা রাইফেল তাক করল, মেয়েটির ঠিক বুকের মধ্যে প্রবেশ করল গুলিটা। একবার চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে মেয়েটি মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পুরুষ সঙ্গীটি নিমেষে অদৃশ্য হয়েছে। একি করল তামুরা ? সে কি নিরস্ত্র একটি মেয়েকে খুন করে মনুষ্যত্ব হারাল ? সৈনিকের বর্বর আচরণের এই প্রথম দৃষ্টান্ত তার জীবনে। তার মতো লোক এমন কাজ করতে পারল ? একি ভাগ্যের পরিহাস, না তার চরিত্রের ত্রুটি ? যে ত্রুটি এতদিন গুপ্ত ছিল, যুদ্ধের বর্বরতার মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ সহজ হয়ে উঠেছে ? টিলায় ফিরে আসবার পথে নদীর জলে আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল রাইফেলটা ফেলে দিল তামুরা।

ফিরে এসে কয়েকজন প্রাক্তন সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হল। জাপানী সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোনোক্রমে পালোম্পন বন্দরে পৌঁছতে পারলে দেশে ফিরতে পারবে, এই তাদের আশা। পথে আছে আমেরিকান সৈন্যের পাহারা, অন্ধকার রাত্রিতে তা অতিক্রম করতে হবে। তামুরাও চলল সবার সঙ্গে। পথে পাওয়া গেল এক মৃত সৈনিকের বন্দুক। সেটা তুলে নিল কাঁধে। রাত্রির অন্ধকারে রাস্তা পার হতে গিয়ে আমেরিকান সেনাবাহিনীর মেশিনগানের গুলিতে তামুরার বন্ধুরা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। আবার সে শুরু করল পাহাড়ের

জঙ্গলে নিঃসঙ্গ ভ্রমণ। এখানে কোনো খাদ্য নেই। মাঠ শস্যশূন্য। কাল রাত্রির মৃত সৈন্যরা মাঠের উপর পড়ে আছে। হাত, পা, মুণ্ড ছিন্ন হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। যেন খেলার শেষে পুতুলের হাত-পা এদিক-সেদিক ছুঁড়ে ফেলেছে কোনো দুষ্টু মেয়ে।

প্রবল বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টিতে জোঁকের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তামুরা দেখল দেহের অনাবৃত অংশ জোঁকে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার রক্ত খেয়ে বেশ গোলগাল হয়ে উঠেছে জোঁকগুলি। টিপে দেখলো, নরম—হাত পিছলে যায়। বড় সুপুষ্ট কালো জামের মতো একটা জোঁক সে মুখে ছুঁড়ে দিল। তারপর থেকে তামুরার খাদ্যতালিকায় জোঁক হল প্রধান।

তামুরা লক্ষ্য করে দেখছে প্রায় সকল মৃতদেহেরই নিতম্বের মাংস নেই। এর কি অর্থ? কোনো হিংস্র জন্তু এ-অঞ্চলে তার চোখে পড়েনি। একটা আশংকা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল তার মনে। মানুষের মাংস মানুষ খাবে, এটা বুদ্ধি দিয়ে, সংস্কার দিয়ে বিশ্বাস করা অসম্ভব। কিন্তু যে ক'জন জাপানী সৈন্য হন্যে হয়ে নেকড়ের মতো বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের আকারটা শুধু মানুষের। আসলে তারা তো পশুত্বের পর্যায়ে নেমে গেছে। তামুরার মনেও কেমন একটা অস্বাভাবিক ক্ষুধা জেগে উঠল।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে দেখা পেল এক মুমূর্ষু জাপানী অফিসারের। পাশে গিয়ে বসল। প্রলাপ বকছে। জাপানের সম্রাট তাকে দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছে। হেলিকপ্টার এখানে নেমে তাকে তুলে নিয়ে যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা গেল। তামুরা মৃত-দেহের পা ধরে টানতে টানতে ঝোপের আড়ালে নিয়ে এল। ব্যাগ থেকে ধারালো বেয়নেটটা বের করে শক্ত করে ধরল ডান হাতে। কি করবে তা যেন নিজেই ঠিক জানে না! পাপের ভয় করে তার আর লাভ কি? মানুষ-হত্যার পাপ তো সে করেছে। একে সে হত্যা করেনি। প্রাণহীন একটা বস্তুর সদ্ব্যবহার যদি সে করে তাহলে অপরাধ হবে কেন? এর মধ্যেই জোঁকের ঝাঁক মৃতদেহ আক্রমণ করে ঢেকে ফেলেছে। আর দেরি নয়। বেয়নেটটা তুলতে যেতেই বাঁ হাত এগিয়ে এসে দৃঢ় মুষ্টিতে ডান হাতের কব্জিটা চেপে ধরল। বাঁ হাতটা যেন দুর্দশার নীচে চাপা-পড়া তার আত্মার ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আর সেই মুহূর্তে সে শুনতে পেল কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে বলছে, উঠে এস, উঠে এস।

তামুরা উঠে এল। ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে চেষ্টা করেও পারল না। দেহটা যেন দু'টো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ডান আর বাঁ ভাগ—পশুত্ব আর মনুষ্যত্বের অংশ। তার চোখের সামনে কত অদ্ভুত ছায়া, অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে বেড়াচ্ছে। বড় দুর্বল বোধ হয়; আর চলতে পারে না। শুয়ে পড়ল। বুনো মাছির ঝাঁক তাকে আক্রমণ করল, ঢেকে ফেলল মুখ। তবু মাছি তাড়াবার জন্য হাত তুলতে পারে না। মাছির দল তাকে খেয়ে শেষ করুক। কে একজন তাকে ডাকছে। চোখ খুলে দেখল

ভূতপূর্ব সহকর্মী নাগামাৎসু। ওঠবার শক্তি নেই, নাগামাৎসু টেনে তুলল। কার্ড-বোর্ডের মতো শক্ত কি যেন কয়েক টুকরো তার মুখে পুরে দিল সে। কিছুক্ষণ মুখে ভিজবার পর বুঝতে পারল মাংস। বেশ মিষ্টি আর একটু নোনতা। কিসের মাংস?

নাগামাৎসু বলল, বানরের।

বানর? একটাও তো তার চোখে পড়েনি এতদিনের মধ্যে। বুঝতে পারল কার মাংস, কিন্তু নিজের কাছেও স্বীকার করতে পারল না। মাংস ততক্ষণে পেটের মধ্যে চলে গেছে। মানুষের মাংস খেয়েছে, এই উপলব্ধির তাড়নায় ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে লাগল। প্রথম সে গরিলাদের হাতে বন্দী হল; গরিলাদের হাত থেকে গেল আমেরিকানদের হাতে। সেখান থেকে টোকিওর মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে।

কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দিয়ে এ বইয়ের পরিচয় দেওয়া যায় না। কারণ কাহিনীতে বাইরের ঘটনা খুব কম। বিশেষ পরিবেশে একটি হৃদয়ের ক্রমউন্মোচনেই লেখকের কৃতিত্ব। এখানে যেমন জীবন-মৃত্যুর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের রূপায়ণ আছে, তেমনি আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি, মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি। মনে দাগ রেখে যাবার মতো বই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানের সমাজে ভাঙন ধরেছে। ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে পুরনো রীতি-নীতি ও আদর্শ। পাশ্চাত্য জীবনের লঘু দিক্‌টার প্রভাব ক্রমশঃ জাপানের দৈনন্দিন জীবনে বিস্তার লাভ করছে। য়ুরোপের সাহিত্য ও শিল্পকলার আলোচনা সর্বত্রই শোনা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ বিক্রি হয় হাজার হাজার কপি। আধুনিকতম ফরাসী উপন্যাসের খবর জাপানী তরুণ-তরুণীদের নিকট অজানা নয়। বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে জাপানের রূপ বদলে যাচ্ছে। পুরনো ভিত্তি টলে উঠেছে, নতুন শক্তির আশ্রয় এখনো সে পায়নি।

এই ভাঙনের মুখে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জাপানের অভিজাত শ্রেণী। বনেদি পরিবারগুলি একে একে ভেঙে পড়েছে। এমনি একটি বনেদি পরিবারের ভাঙনের ছবি এঁকেছেন জাপানী ঔপন্যাসিক ওসামু দাজাই। The Setting Sun নাম দিয়ে উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ বেরিয়েছে। সূর্যোদয়ের দেশে সূর্যাস্তের কাহিনী। টমাস মানের 'দি বুডেন ব্রুকস'-এর কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, যদিও দু'টি উপন্যাসের মধ্যে তুলনা করা চলে না। 'বুডেন ব্রুকস্'-পরিবারে ঘুণ ধরেছিল স্বাভাবিকভাবে,—প্রাচীন হলে যে ভাঙন আসে, সেই ভাঙন। কিন্তু দাজাই যে-পরিবারের কাহিনী বলেছেন, সে-পরিবারের ভাঙনের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা দায়ী। মানের পটভূমিকা বৃহৎ এবং কাহিনী জটিল ও গুরুগম্ভীর। দাজাই-এর গল্পে জটিলতা নেই, বেগবান কাব্যময় ভাষায় মর্মস্পর্শী কাহিনীটি বলা হয়েছে। বিশেষ করে বাঙালী পাঠকের নিকট এ-বইয়ের আবেদন হবে গভীর। দুর্ভিক্ষ ও দেশ-বিভাগের ফলে আমাদের সমাজের সকল স্তরে যে ভাঙন শুরু হয়েছে তা আমরা প্রত্যহ চোখের সামনে দেখতে পাই।

ওসামু দাজাই ১৯০৯ সালে উত্তর জাপানের এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অবক্ষয়ধর্মী লেখক। দাজাই মাত্র কয়েকটি উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখেছেন। যক্ষ্মা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। জলে ডুবে তিনি আত্মহত্যা করলেন যন্ত্রণা এড়াবার জন্য। দাজাই-এর মৃতদেহ যে-দিন জল থেকে উদ্ধার করা হল সেদিন তাঁর উনচত্বারিংশ জন্মদিবস।

'দি সেটিং সান'-এর গল্প বলছে নায়িকা কাজুকো। কাহিনী যখন শুরু হল তখন তার বয়স উনত্রিশ। বাবার মৃত্যু হয়েছে কয়েক বছর পূর্বে। একমাত্র ছোট ভাই নাওজি যুদ্ধে গেছে; শুনেছে সে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন এক অঞ্চলে গেছে জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে। বহুদিন যাবৎ তার কোনো সংবাদ নেই,—বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল তবু নাওজির খবর পাওয়া গেল না।

কাজ্নুকো মা-কে নিয়ে থাকে টোকিও শহরে পৈতৃক বাড়িতে। এ-বাড়িতে তার জন্ম, এখানে বড় হয়েছে; বাবার মৃত্যু হয়েছে এ বাড়িতে। বাড়ির সঙ্গে নাড়ীর যোগ। কিন্তু জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করবার পর টোকিও ত্যাগ করবার জন্য উদ্যোগ করতে হল। মামা ওয়াদা তাদের অভিভাবক। তিনি জানালেন, তাদের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হয়ে এসেছে, তাঁর ব্যবসার অবস্থা খারাপ, সুতরাং তিনি নিজে আর্থিক সাহায্য করতে পারবেন না। এখন টোকিওর বাড়ি বিক্রি করে গ্রামাঞ্চলে কোনো শস্তা জায়গায় যেতে হবে। আর তুলে দিতে হবে ঝি-চাকর। যতই বেদনাদায়ক হোক, এ প্রস্তাব মেনে না নিয়ে উপায় নেই। মামা শহর থেকে অনেকটা দূরে ছোট একটা বাড়ি ঠিক করে দিলেন। সেখানে যাবার আয়োজন শুরু হল। মা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ান। গম্ভীর ম্লান মুখ। বনেদি সমাজের যেন শেষ প্রতিনিধি মা। তাঁর নীরব বেদনা অল্প কয়েকটি কথায় চমৎকার ফুটেছে।

নতুন বাড়িতে এসে মা অসুখে পড়লেন। শ্বশুরের ভিটে ত্যাগ করবার বেদনা তিনি সইতে পারলেন না। কাজ্নুকোর মনও ভালো নয়; এই ছোট্ট বাড়ির অপরিচিত পরিবেশে সে হাঁফিয়ে উঠছিল। তার উপর ঝি-চাকর নেই; আশানুরূপ অর্থ নেই; সংসারের দায়িত্ব তাকেই নিতে হল। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়া তো মুখের কথা নয়। সাংসারিক কাজের অভিজ্ঞতা নেই। রান্না করতে গিয়ে অসাবধানতার ফলে একদিন রাত্রিবেলা আগুন লেগে গেল। পাড়ার লোক এসে সাহায্য না করলে বাড়ি ভস্ম হয়ে যেত।

মা শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। ডাক্তার এবং ওষুধের খরচ আছে। কাজ্নুকো স্থির করল এবার থেকে সে মাঠে কাজ করবে। কিছুদিনের মধ্যেই কাজ্নুকোর মনে হল সে যেন কৃষক রমণী হয়ে গেছে। গায়ের রঙ ময়লা হয়েছে, মুখে লালিত্য নেই, তার দেহে ও চলাফেরায় গ্রাম্য ভাব সুস্পষ্ট। এখন মাঠই ভালো লাগে; উল ও কাঁটা নিয়ে ঘরে বসলে অস্বস্তি বোধ হয়। এর মধ্যেই নীল রক্ত লাল হয়ে এসেছে।

অবশ্য শারীরিক পরিশ্রম এই প্রথম নয়। যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর সাহায্যের জন্য তাকে বাধ্যতামূলকভাবে কঠোর দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয়েছে। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাধ্য করা হয়েছে কাজ করতে। জাপান যুদ্ধ জয় করবে, সকলের মঙ্গল হবে—এই লোভ দেখানো হয়েছে তাদের। তারা মাটি কেটেছে, মোট বয়েছে এবং আরো কতো কী কাজ। অভিজাত ঘরের তরুণী সে; বদলী দিয়ে সে এই কঠোর পরিশ্রমের কাজ থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছিল; পারেনি। পরিবর্তে অন্য লোক গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষ রাজী হয়নি। নিয়মিত দেহ সঞ্চালন করে কাজ্নুকোর স্বাস্থ্য কিন্তু ভালো হয়েছিল। তখন থেকেই তার আভিজাত্য হারাতে শুরু করেছে।

একদিন মা ডেকে বললেন, তোর মামার চিঠি পেলাম। খবর আছে।

—কি?

—নাওজি শীগগিরই দেশে ফিরে আসছে। ওয়াদা আরও জানিয়েছে, বাড়ি বিক্রির

সব টাকা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার ব্যাঙ্কের টাকা সরকার আটক করায় সে এক পয়সাও সাহায্য করতে পারবে না। নাওজি এলে খাবার লোক হবে তিনজন। কি করে চলবে? তোর মামা লিখেছে, তুই আবার বিয়ে কর অথবা চাকরির খোঁজ কর।

—চাকরি। কি চাকরি পাব? ঝি-গিরি?

মা তাড়াতাড়ি বললেন, না, না, তা নয়। ওয়াদার নাকি জানাশোনা এক পরিবারে ছেলেমেয়েদের তদারকের চাকরি আছে।

—ও তো ঝি-গিরিরই নামান্তর!—কান্নায় উদ্বেল হয়ে উঠল কাজুকো। এখন নাওজি আসছে—তোমার আদরের ছেলে—তাই আমাকে আর দরকার নেই। আমাকে তাড়াতে পারলে সুখী হবে। আমি সংসারের জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত, করছিও তা। তোমার কাছে থাকব, তোমার ভালোবাসায় আমার জীবন পূর্ণ হবে এই ছিল আকাঙ্ক্ষা। বেশ, তুমি যখন আর চাও না, আমি চলে যাব। আমার আশ্রয় আছে, তোমাকে ভাবতে হবে না।

কথাগুলি মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার পরই কাজুকোর অনুশোচনা হল—মা'র বিরুদ্ধে বড় নিষ্ঠুর অভিযোগ করেছে। চেয়ে দেখল; মা'র মুখের মর্যাদাব্যঞ্জক চেহারা এত বড় আঘাতেও ক্ষুণ্ণ হয়নি; আভিজাত্যের লক্ষণ।

মা শান্ত কণ্ঠে বললেন, তোর মামার কথা শুনে এতদিন চলেছি। এবার লিখে দেব আমার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের দায়িত্ব এখন থেকে আমিই নিলাম।

একদিন নাওজি হঠাৎ এসে উপস্থিত হল। সংসারের কোনো উপকার তাকে দিয়ে হবার আশা নেই। স্কুলে পড়বার সময় থেকে সে আফিং ও অন্যান্য নেশা ধরেছে। তার নেশার গুরু ছিল বিখ্যাত তরুণ লেখক উএহারা জিরো। উএহারার লেখায় অবক্ষয়ের সুর; এই সুর তার ভক্তদের উদ্বুদ্ধ করেছে নেশা ও নারী অবলম্বন করে জীবনকে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিতে। নাওজির বিরূপ জীবনযাত্রার জন্য তারা অনেকবার সংকটে পড়েছে। সে মোটা টাকা ধার করেছে, আর মা তা শোধ করেছেন। কত চেষ্টা হয়েছে নাওজিকে সংশোধন করবার, সফল হয়নি কোনো চেষ্টা।

কাজুকোর বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রধান কারণ নাওজির নেশা। নতুন শ্বশুর বাড়ি গেছে। তারপর থেকেই নাওজি কেবল টাকা চাইতে শুরু করল। বড় বিপদ, এবার দিলেই নেশা ছাড়ব; আর কক্ষণো এমন নেশা করব না। স্বামীর বাড়িতে নতুন এসেছে। টাকা সে কোথায় পাবে? আর, এত টাকা? তবু একমাত্র ছোটো ভাইয়ের অনুনয় অগ্রাহ্য করে চলেছে। কাজুকো নাওজির চরিত্র সংশোধনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবার উদ্দেশ্যে দেখা করতে গেল উএহারা জিরোর সঙ্গে। উএহারা এই সুযোগ ছেড়ে দিল না। নাওজির প্রসঙ্গ চাপা পড়ল। কাজুকোর জীবনে এই প্রথম ব্যভিচার। উএহারার স্পর্শ তার ভালো লাগেনি; আবার খুব বিরক্তিকরও মনে হয়নি। সে বাড়ি ফিরে এল একটা গোপন অভিজ্ঞতা নিয়ে। এই গোপন অভিজ্ঞতা

তার অবচেতন মনে বাসা বেঁধে রইল। এর পর থেকে স্বামীর সংগে শুরু হল মতবিরোধ এবং পরিণামে বিবাহ-বিচ্ছেদ।

নাওজি ফিরে এসেছে অনেকদিন পরে। কিন্তু তার স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। বরং সেনাবাহিনীতে থেকে চারিত্রিক উচ্ছৃংখলতা আরো বেড়েছে। ওকে দিয়ে সংসারের কোনো উপকার হবে না। অল্পদিনের মধ্যেই সে দেনা করে মা'কে আবার বিব্রত করে তুলেছে।

কাজুকোর বয়স হল ত্রিশ। জীবন বৃথাই শেষ হতে চলেছে। আভিজাত্যের খুঁটি আলগা হয়েছে। নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার আশা নেই। ঘরে-বাইরে সর্বত্র হতাশা আর অনিশ্চয়তা। সামনে কোনো পথের নিশানা নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকার চেয়ে নাওজির মতো নিজেকে যদি অধোগতির পথে ভাসিয়ে দেয় তাহলে ক্ষতি কি? নিজেকে পলে পলে ক্ষয় করে দেবার একটা নেশা আছে; একেবারে শূন্যতার চেয়ে ক্ষয় হয়ে যাবার, ভেসে যাবার অনুভূতিটা হৃদয়ের তবু যা-হোক একটা অবলম্বন হবে।

কিন্তু কাকে অবলম্বন করে সে ভাংগনের পথে যাত্রা শুরু করবে? তাদের প্রতিবেশী ষাট বছরের বৃদ্ধ শিল্পী প্রস্তাব করেছিল তার জীবন-সঙ্গিনী হতে। টাকার অভাব নেই; সুখে থাকবে। শুভ্রকেশ বৃদ্ধকে ভালো করে দেখে কাজুকো সে প্রস্তাব অস্বীকার করল। সে নীটশের সন্তানলোভী নারী; বিলাস-ব্যসনের লোভ তার নেই। সে সন্তান চায়, নিজেকে বিস্তার করতে চায় সন্তানের মধ্যে।

মনে পড়ল উএহারার কথা। তাকে ভোলা যায় না। তার লেখা উপন্যাসের মধ্যে কাজুকো উএহারাকে পায়। উপন্যাস হাতে করে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। উএহারার সান্নিধ্য অনুভব করে। তার মধ্যে আছে ধ্বংসের জীবাণু। সে জীবাণু কাজুকোর জীবনে প্রবেশ করলে ধ্বংসের পথ দ্রুত হবে।

কাজুকো উএহারাকে চিঠি লিখল। একে একে তিনখানা চিঠি। চিঠিগুলি যেন পাপড়ির মতো। ক্রমশঃ একটু একটু করে তার হৃদয়ের কথা প্রস্ফুটিত করেছে। প্রথম চিঠিতে যা ছিল ইংগিত শেষ চিঠিতে তা স্পষ্ট হয়েছে। উএহারার সন্তানের সে মা হতে চায়। উএহারা বিবাহিত; সুতরাং তাকে বিয়ে করা সম্ভব হবে না। কাজুকোর এর জন্য ভাবনা নেই। সে না হয় সকল কলংক স্বীকার করে উএহারার রক্ষিতা হয়েই থাকবে। লোকে বলে উএহারা পাষণ্ড। কাজুকোর মনে হয় উএহারা সংস্কারাচ্ছন্ন না হয়ে সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা পথ চলে। আমি যা চাই তাকে পাওয়াই সুস্থ জীবনের মূল সূত্র। কাজুকো উএহারার সন্তানের জননী হতে চায়, অন্য কারো নয়। সুতরাং এই কামনা সফল করবার জন্য সকল সংস্কার ও সংকোচ সে অগ্রাহ্য করেছে।

তিনটে চিঠির কোনো উত্তর নেই। তবু সে ধৈর্য হারায়নি; জীবনের শতকরা নিরানব্বুই ভাগই তো প্রতীক্ষা। শুধু একভাগ প্রত্যক্ষ ঘটনার সংঘাতে পূর্ণ থাকে।

ভুগে ভুগে মা মারা গেলেন। আরো শূন্য হয়ে গেল জীবন। একদিন নাওজি

তার এক নর্মসহচরীকে বাড়ি নিয়ে এল। মনের কোথায় ধাক্কা খেল কাজুকো। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে টোকিওর গাড়ি ধরল।

বহু আড্ডায় খুঁজে খুঁজে উএহারার দেখা পেল। অপরিচিত পরিবেশে সারাদিন দু'জনে ঘুরে কাটাল। রাত্রিটা কাটাল হোটেলে। সকালে ঘুম ভাঙবার পর দেখল উএহারা শুয়ে আছে তার পাশে। বয়সের প্রভাবে মুখের চেহারা অনেক জীর্ণ হয়েছে। সামনের ক'টা দাঁত নেই। মুখের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এ-রক্তের রঙ তার অজানা নয়। ক্ষয়রোগের অভ্রান্ত চিহ্ন। চাষীর ছেলে উএহারা মৃত্যুপথযাত্রী: তার সন্তানের জননী হতে চলেছে সে। আভিজাত্যের নীল রক্ত লাল হয়ে আসছে।

খানিক বাদে সংবাদ এল জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে নাওজি আত্মহত্যা করেছে। বনেদি পরিবারের অভিজাত বংশধারার সমাপ্তি ঘটল। বংশ-গৌরবের সূর্য অস্তমিত হল।

বড়দের জন্য বই লিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন এমন লেখক অনেক আছেন। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশের কিশোরদের মন জয় করবার মতো লেখক মাত্র একজন; তিনি হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেন। তাঁর গল্পগুলি সকল দেশের সাহিত্য এমন সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করেছে যে, লোকে লেখকের নাম ভুলে যায়, মনে করে গল্পগুলি বুঝি তাদের দেশেরই সম্পত্তি। অভিজ্ঞ সমালোচকেরা বলেন যে, অ্যান্ডারসেনের রূপকথার নির্ভরযোগ্য অনুবাদ কোনো ভাষাতেই হয়নি। এই ত্রুটি সত্ত্বেও এরূপ জনপ্রিয়তার কারণ কি? মোটামুটি তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। অ্যান্ডারসেন কিশোরদের ছোট বলে উপেক্ষা করতেন না; তাদের জন্য লেখবার সময় কোনো শৈথিল্য বা অযত্ন প্রশ্রয় দিতেন না; তাঁর রচনা-কৌশল এমন অভিনব যে, মনে হবে কেউ যেন সামনে বসে গল্প বলছে, বই থেকে পড়ছি না। কিশোরদের পক্ষে এই রচনারীতি সহজেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শুধু কিশোররাই তাঁর গল্পের পাঠক নয়। অ্যান্ডারসেন লেখবার সময় তাদের মা-বাবা, দাদা-দিদিদেরও মনে রেখেছেন। তাই তাঁর রূপকথাগুলি বড়দের কাছেও সমান প্রিয়। আর সবচেয়ে বড় কথা অ্যান্ডারসেনের গল্পগুলি শুধুই উদ্ভট কল্পনা-কাহিনী নয়। প্রত্যেকটি রূপকথার সঙ্গে তাঁর জীবনের কোনো ঘটনা বা গভীর অনুভূতির যোগ রয়েছে। মারমেডের চোখ দিয়ে কখনো জল পড়ে না; তাই তাদের বেদনা দুর্বিষহ; এই মারমেড তো অ্যান্ডারসেনেরই হৃদয়! যে হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করা যায় না, সহানুভূতির সঙ্গে শুনবে এমন লোক নেই। এমনি করে রূপকথার প্রত্যেকটি পশু, পাখি, পরী, রাজপুত্র, রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগ আছে। তাই গল্পগুলিতে পাওয়া যায় দরদ ও প্রাণের স্পর্শ।

অ্যান্ডারসেন বলেছেন, আমাদের জীবনই হলো সবচেয়ে বিস্ময়কর রূপকথা। অন্ততঃ অ্যান্ডারসেনের জীবন সত্যি একটি চমৎকার রূপকথা। শ্রীমতী Rumer Godden অ্যান্ডারসেনের জীবনের গল্পকে নতুন করে বলেছেন। লেখিকা ঔপন্যাসিক; তাঁর হাতে অ্যান্ডারসেনের জীবনী উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

১৮০৫ সালের ২রা এপ্রিল ডেনমার্কের ছোট্ট শহর ওডেন্সে অ্যান্ডারসেনের জন্ম হয়। তাঁর বাবার বয়স তখন মাত্র বাইশ; জুতো তৈরি করা ছিল জীবিকার্জনের একমাত্র পথ। এ কাজে বিশেষ দক্ষতা না থাকায় উপার্জন বেশি হতো না। অত্যন্ত অভাবের মধ্যে দিন চলত। অ্যান্ডারসেনের বাবা ভালো জুতো তৈরি করতে না পারলে কি হবে, অন্য গুণ ছিল তাঁর। তিনি চমৎকার গল্প বলতে পারতেন; তুচ্ছ জিনিস দিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈরি করতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। একটু বড় হবার পর থেকেই ছেলেকে কাছে বসিয়ে কাজ করতে করতে নানা গল্প করতেন। সব না বুঝলেও অ্যান্ডারসেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো নীরবে গল্প শুনত। মাত্র আট বছর বয়সে তার বাবার

মৃত্যু হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্ডারসেনের নিশ্চিন্ত শিশু-জীবনের সমাপ্তি ঘটল। মৃত্যুর পূর্বে বাবা মা-কে বলে গেছেন; অ্যান্ডারসেন যা করতে চায় তাই করতে দিও; বাধা দিও না।

অ্যান্ডারসেন লম্বা, ছিপছিপে, কুৎসিত চেহারার এবং অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে। সে অনর্গল গল্প বলতে পারে, পুতুল দিয়ে থিয়েটার করে, অভিনয় এবং গান করে একা একা। একমাত্র সঙ্গী ছিলেন বাবা; এখন আর কেউ সঙ্গী নেই। দরিদ্র ছেলেদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়ে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। সহপাঠীরা অ্যান্ডারসেনকে সুযোগ পেলেই খেপায়; রাস্তায় ছেলেরা তার পিছনে লাগে: ঐ যে আমাদের নাট্যকার যাচ্ছে! কখনো কখনো তাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে। অ্যান্ডারসেনের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতের ভয়ে রাত্রিতে তার ঘুম হয় না। তার বৃদ্ধ ঠাকুরদা এখনো বেঁচে আছেন; তিনি পাগল। পাড়ার ছেলেদের হাতে এই অহিংস বৃদ্ধ পাগলকে কিল-চড়-ঘুষি এবং আরো কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় প্রতিদিন। নিরুপায় বালককে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় এসব দৃশ্য। ছেলেরা পিছনে লাগায় ভয় হয় সে যদি ঠাকুরদার মতো পাগল হয়ে যায়? এ ভয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাড়া করেছে অ্যান্ডারসেনকে।

অ্যান্ডারসেনের স্বভাব ছিল বড় সরল। এই সারল্যের সুযোগ নিয়ে সহপাঠীরা তার উপর অত্যাচার করত। অ্যান্ডারসেন একটুতেই খুশিতে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠত; আবার একটুতেই চোখে অশ্রুধারা নেমে আসত। একদিন অ্যান্ডারসেন মাঠে গেছে পরিত্যক্ত শস্য কুড়াতে। এমন সময় জমির মালিক এসে উপস্থিত হলো উদ্যত চাবুক হাতে করে। অ্যান্ডারসেন সরল, নির্ভীক দুই চোখ তুলে প্রশ্ন করল: তুমি আমাকে মারবে? জানো না, ভগবান সব কাজের সাক্ষী। তাঁর সামনেই আমাকে মারবার সাহস হবে তোমার?

অ্যান্ডারসেনের মা মেরি আবার বিয়ে করেছেন। নতুন স্বামী কাজের লোক নয়, সুতরাং মেরিকে কাপড় কাচবার কাজ আরম্ভ করতে হলো। সারাদিন অ্যান্ডারসেন একা একা থাকে। মা-কে আশ্বাস দেয়: আমি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হবো একদিন, আমার জন্য তুমি ভেবো না।

মা বিশ্বাস করেন।

চৌদ্দ বছর বয়সে অ্যান্ডারসেন শ' দেড়েক টাকা সম্বল করে কোপেনহেগেন যাত্রা করল। সেই বিরাট শহরে পরিচিত কেউ নেই। তবু যেতে হবে। এখানে পড়ে থাকলে বড় হবে কি করে? মফঃস্বলের অনভিজ্ঞ বালক রাজধানীতে এসে প্রথম বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও শীগ্‌গিরই নিজের উদ্দেশ্য খুঁজে পেল। সে অভিনেতা হবে। রয়েল থিয়েটারে ঢুকতে পারলে খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই সহজে এক সঙ্গে পাওয়া যাবে। থিয়েটারের প্রধানা অভিনেত্রীর সন্ধান করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল। অভিনয় করে দেখাল। অভিনেত্রী হাসলেন। এ পথে তার কোনো আশা নেই। হতাশ হয়ে কেঁদে

ফেলল অ্যান্ডারসেন। একে একে থিয়েটারের সব ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করল সে। সবাই হতাশ করল; কিন্তু সকলের মনেই তার জন্য মমতা জাগে। এই বিচিত্র কুৎসিতদর্শন কিশোরের মধ্যে কি একটা অদৃশ্য আকর্ষণী শক্তি আছে যার ফলে সকলের মনেই তার জন্য সহানুভূতি জাগে। অ্যান্ডারসেন সরল বিশ্বাসে যে-কোনো লোকের সামনে গিয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে দাঁড়াতে পারে। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট নিজের অদ্ভুত আবেদন পেশ করতে সংকোচ হয় না। মূল প্রার্থনা মঞ্জুর না হলেও আর্থিক সাহায্য ও খাবার নিমন্ত্রণ পায় সম্ভ্রান্ত পরিবারে। এঁদের দয়ার উপর নির্ভর করে অ্যান্ডারসেনের দিন কাটে। রোজ দু'বেলা খেতে পায় না, তবু বেঁচে থাকাটা সম্ভব হয়েছে।

অভিজাত পরিবারে অ্যান্ডারসেন গান ও অভিনয় করে শোনায়। ছেলে মেয়েরা আনন্দ পায়; বড়রাও যোগ দেয়। ক্রমে তার নাম গিয়ে পেঁছিল রাজপ্রাসাদে। একদিন নিমন্ত্রণ এলো রাজপ্রাসাদ থেকে। রাজকুমারী ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁকে গান ও আবৃত্তি শুনিয়ে পুরস্কার পেল। মুচির ছেলের রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ। রূপকথা নয়তো কী!

নাট্যকার অথবা অভিনেতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করবে, এটাই ছিল অ্যান্ডারসেনের আকাঙ্ক্ষা। সে ডেনমার্কের সেক্সপীয়র হবে। একটা নাটক লিখে পাঠাল রয়েল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের কাছে। কয়েকদিন পরেই ফেরত এলো। অভিনয় করা তো দূরের কথা, পড়বারও অযোগ্য। ডিরেক্টরদের দয়া হলো অ্যান্ডারসেনের উপর। রাজার কাছে সুপারিশ করে তাঁরা ওর পড়বার জন্য একটা সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে প্রথম থেকে পড়া আরম্ভ করতে সংকোচ বোধ হলেও বড় হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় সে সবকিছু স্বীকার করে নিল। এতদিন আধপেটা খেয়ে শরীর শীর্ণ হয়েছে। কয়েক দিন পূর্বে একটা নাটকে তপঃক্লিষ্ট, শীর্ণদেহ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়েছিল। অ্যান্ডারসেন এই চরিত্রে অভিনয় করেছিল; তার অনাহারক্লিষ্ট দেহ ছিল যোগ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সরকারী বৃত্তি পেয়ে অনাহারের ভয় থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু স্কুলের হেডমাস্টারের ব্যবহারে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ছেলেরা তাকে ভালোবাসত। হেডমাস্টার ও তাঁর স্ত্রীর সকল অত্যাচার সহ্য করে অ্যান্ডারসেন পরীক্ষায় পাশ করল। দুটো পরীক্ষায় পাশ করবার পর সে আরম্ভ করল কবিতা লিখতে। তারপর নাটক। তার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সফল করে রয়েল থিয়েটারে নাটকের অভিনয় হলো। তার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে, কাগজে সমালোচনাও বেরিয়েছে। ভালো সমালোচনায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, বিরূপ সমালোচনা বেরুলে কাগজের উপর মুখ রেখে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে থাকে। অ্যান্ডারসেনের এখন নানা সভাসমিতি থেকে আমন্ত্রণ আসে। একটু প্রশংসায় সে ফুলে ওঠে। লোকে তার এই আত্মশ্লাঘার ছেলেমানুষী উপভোগ করে; অনেকের কাছ থেকে বিদ্রূপও শুনতে হয়। সাহিত্যাগ্রজ ও শুভানুধ্যায়ী ইনজম্যান উপদেশ দিয়ে লিখলেন,

সাহিত্যিক ও শিল্পীর পক্ষে এরূপে সামাজিক জীবন সবচেয়ে বড় শত্রু। কিন্তু অ্যান্ডারসেন সহজে জনপ্রিয়তার মাদকতা ত্যাগ করতে পারে না। মুচির ছেলের স্বপ্ন সফল হয়েছে, সে খ্যাতিলাভ করেছে।

রাজানুগ্রহ সে লাভ করেছে। প্রথম তাকে বিদেশ ভ্রমণের জন্য বৃত্তি দেওয়া হলো। ইতালীর পটভূমিকায় আত্মচরিতমূলক উপন্যাস The Improvisatore লিখে অ্যান্ডারসেন অবিসংবাদীরূপে ড্যানিশ সাহিত্যে আপনার স্থান করে নিল। এতদিন অন্যের পুরানো জামা-জুতো ব্যবহার করেছে; এবার বইয়ের লভ্যাংশ পেয়ে নতুন জামা কিনতে পারল, দু'বেলা পেট ভরে খাবার ব্যবস্থাও হবে এখন থেকে। দ্বিতীয় উপন্যাস ছেপে বেরুতে কিছু দেরি হবে, অথচ টাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদে ছেলেদের জন্য কয়েকটি রূপকথা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলল। অ্যান্ডারসেন এদের মনে করেছে তার সাহিত্য সাধনার 'বাই-প্রডাক্ট'। কিন্তু ক্রমশঃ এই রূপকথাগুলিই হয়ে উঠল সবচেয়ে জনপ্রিয়। আজ লোকে তার কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের কথা ভুলে গেছে, বেঁচে আছে অপূর্ব রূপকথাগুলি।

একই জীবনে এত দুঃখ, সংগ্রাম ও যশের সমাবেশ কদাচিৎ দেখা যায়—রাজকীয় বিবিধ সম্মান, সাহিত্য-সাধনার জন্য সরকারী বৃত্তি এবং জনসাধারণের নিকট হতে প্রভূত সম্মান ও প্রীতিলাভ করেছে অ্যান্ডারসেন। য়ুরোপের সর্বত্র জীবিতকালে অ্যান্ডারসেন যে সম্মান পেয়ে গেছে এরূপ আর কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিশোরমহল তাদের গল্পদাদুকে রাজার সম্মান দিয়েছে। শেষ বয়সে অ্যান্ডারসেন বলত, মৃত্যুর পরে দেশের সকল শিশু ও কিশোরের দল তার শবানুগমন করবে।

অর্থ, প্রতিপত্তি ও যশ পেয়েও অ্যান্ডারসেনের জীবনে সুখ ছিল না। তার জীবনে বহু লোকের কোলাহল ছিল, কিন্তু ছিল না কোনো একটি অন্তরঙ্গ হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ। মা মারা গেছেন অনেক দুঃখ পেয়ে পাগলা গারদের অন্তরালে। আপন বলবার মতো পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। অ্যান্ডারসেনের দিনলিপি থেকে দেখা যাবে বিয়ে করবার কত সাধ ছিল তার। পৃথিবীর শিশুদের জন্য এত গল্প লিখল: কোলের উপর বসিয়ে নিজের ছেলেকে গল্প শোনাবার সুযোগ দিলেন না ভগবান। মেয়েরা তাকে কৃপা করত, তার গল্প পছন্দ করত, কিন্তু কেউ ভালোবাসত না। দুষ্টু ছেলেরা রাস্তায় তাকে ওরাং-ওটাং বলে পিছু নিত; এমন বিকৃত যার চেহারা, তাকে কে ভালোবাসবে?

কিন্তু অ্যান্ডারসেন ভালোবেসেছিল। তার হৃদয় বিকৃত নয়। সহপাঠীর বোন রিবর্গকে একবার দেখেই ভালোবেসেছিল। তার প্রথম প্রেম। কিন্তু শীগগিরই জানতে পারল রিবর্গের বিয়ে আগে থাকতেই ঠিক হয়ে আছে। তবু অ্যান্ডারসেনের মনে হলো রিবর্গ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সাহসে ভর করে চিঠি লিখল। যদি

তাকে ভালোবাসে তা হ'লে পূর্বের সম্বন্ধ ভেঙে দেবার সময় আছে। রিবর্গ তৎপরতার সঙ্গে জবাব দিল, তা সম্ভব নয়। রিবর্গের এই একটিমাত্র চিঠি অ্যান্ডারসেন ছোট একটি চামড়ার ব্যাগে করে বুকের কাছে ঝুলিয়ে রেখেছে চব্বিশ ঘণ্টা দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে। মৃত্যুর পরে এই চিঠি তার বুকের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। প্রেমপত্র নয়, প্রেমের প্রত্যাখ্যান পত্র। হৃদয় কত শূন্য হলে প্রত্যাখ্যান-পত্রকেও আঁকড়ে ধরতে চায় তা সহজেই অনুমেয়।

১৮৭৫ সালের ৪ঠা আগস্ট অ্যান্ডারসেনের জীবনের রূপকথা সমাপ্ত হয়ে গেল।

বয়স যখন চোদ্দ তখনই সিড্‌নি পোর্টার অ্যাড্‌ভেঞ্চারমূলক উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছিল। যতটা লিখত তার চেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখত। পনেরো বছর বয়সে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে তাকে ওষুধের দোকানে চাকরি দেওয়া হয়েছে। সারাদিন সে বন্ধ ঘরে বসে বসে ওষুধ আর ব্যবস্থাপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে। খেলাধুলা নেই, বাইরে বেড়ানো নেই; মুক্তি শুধু কল্পনার মধ্যে। আর সময় পেলেই কাউন্টারে বসে রোগী ডাক্তার ও খদ্দেরদের কার্টুন আঁকে।

সিড্‌নির মা ও ঠাকুমার ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়েছে। তার নিজের চেহারা শক্তসমর্থ নয়। যারা তার পরিবারের ইতিহাস জানে তারা সিড্‌নির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে। ডাক্তার হল তাকে একদিন বললেন, আমি সস্ত্রীক টেক্‌সাস বেড়াতে যাচ্ছি। তুমিও চল আমাদের সঙ্গে। কড়া রোদ্দুরের দেশ, জলবায়ুটাও ভালো, তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ভালো হবে।

সিড্‌নি রাজী হল। কয়েক দিনের জন্য গিয়ে আর কিন্তু ওষুধের দোকানের কাউন্টারে ফিরে এলো না। গোরু-ভেড়া চরানো থেকে আরম্ভ করে নানারকম কাজ করতে করতে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

১৮৮৪ সালে সিড্‌নি এসে পৌঁছল অস্টিন-এ। এখানে সিড্‌নি একটা আপিসে হিসাবপত্র রাখবার চাকরি পেল। হিসাবের কাজ ভালো লাগে না, কিন্তু সে-সময়কার তুলনায় মাইনেটা ভালো—মাসিক একশ' ডলার। সিড্‌নি ছবি আঁকে, তরুণী মেয়েদের পেছনে ঘোরে, তাদের উদ্দেশ্য করে কবিতা লেখে। এমনিতে মুখচোরা, একটু দুর্বল-চিত্ত; কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে সে কখনো কখনো দুঃসাহসী হয়ে ওঠে।

শহরের সেরা সুন্দরী—অ্যাথোল এস্‌টেস্‌। তার বাবা অল্প বয়সে যক্ষ্মায় মারা গেছে। মা আবার বিয়ে করেছে। বি-পিতা নিজের মেয়ের মতোই অ্যাথোলকে যত্ন করে। অনেকের আশঙ্কা যক্ষ্মার বীজাণু তার দেহেও বাসা বেঁধেছে। তবু প্রণয়-প্রার্থীর ভিড় কম নয়। লী জিম্‌পলমান তাদের মধ্যে একজন। অবস্থা ভালো। দেখতে সুপুরুষ, নাম আছে গায়ক হিসাবে। অ্যাথোল মনে মনে তাকেই স্বামীত্বে বরণ করে রেখেছে; মা'রও তাই ইচ্ছে।

সিড্‌নি বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে অ্যাথোলকে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিল। বন্ধুরা বলেছিল, অ্যাথোল কক্ষণো রাজী হবে না। কিন্তু অ্যাথোল এই দুঃসাহসী যুবকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। বাপ-মরা মেয়ে মা'র আদর পেয়ে একগুঁয়ে ও খামখেয়ালী হয়ে উঠেছে। খেয়ালের বশেই সিড্‌নির চিঠির উত্তর দিয়েছে।

সিড্‌নির সাহিত্য-সাধনার কথা অ্যাথোলের অজানা ছিল না। বেড়াতে বেড়াতে সে সিড্‌নিকে আরো বেশি করে লিখতে উৎসাহিত করল; তার প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলল, 'তুমি একদিন বড় হবে।'

এর পর থেকে প্রায়ই ওদের দেখা হয়। একদিন চায়ের দোকানে বসে সিড্‌নি হঠাৎ বলল, 'আমরা তো বিয়ে করলেই পারি।'

পরমুহূর্তেই অপ্রস্তুত হয়ে উঠল, 'না, না, এ আমার পাগলামি। তোমার বাড়িতে মত দেবে না ; না দেবার কারণও আছে। আমার তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

'কে বললে নেই।' অ্যাথোল প্রতিবাদ করল। 'তুমি একদিন লেখক হিসাবে নাম করবে। আমি রাজী আছি।'

সিড্‌নি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে ভয় হল, হয়ত অ্যাথোলের মন বাড়ি গেলেই বদলে যাবে। সুতরাং বিয়ে করতে হলে এখনই। অ্যাথোল তাতেও হেসে সম্মতি দিল। এক বন্ধুর সাহায্যে সে রাত্রিতেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময় সিড্‌নির পকেট ছিল একেবারে শূন্য।

বিয়ের পরও টাকার অভাবটা অ্যাথোল হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছে। অল্প কয়েকটা টাকা উপরি পাওনা হিসাবে লিখে যদি কখনো পায় তাতে ওর আনন্দের সীমা থাকে না। সিড্‌নিকে লিখতে উৎসাহিত করে। স্বামীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার অবিচল আস্থা।

অ্যাথোলের একটি ছেলে হয়েই মারা গেল। এরপর হল একটি মেয়ে। অ্যাথোলের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। তার ক্ষয়রোগের লক্ষণগুলি একে একে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সিড্‌নির পক্ষে একা স্ত্রীর সেবা ও সংসারের কাজ করা বেশিদিন সম্ভব হল না। স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে সে শ্বশুর বাড়ি উঠে এল। এখানে এসে সিড্‌নি একটু স্বস্তি পেল। মোটামুটি ভালো রকমের একটা চাকরিও পেয়ে গেল এক ব্যাংকে। অ্যাথোলের মেজাজ এখন খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছে। সিড্‌নির সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে তার যে আশা ছিল তা সফল না হওয়ায় কখনো কখনো কটূক্তি করে ; আবার হয়ত পর মুহূর্তেই ক্ষমা চেয়ে নেয়।

লেখার সুযোগ এসে গেল। তার এক বন্ধুর শখ হয়েছে সাপ্তাহিক কাগজ বের করবার। সিড্‌নির উপরে অধিকাংশ লেখা ও ছবি যোগান দেবার ভার পড়ল। তাদের কাগজ The Rolling Stone-এর প্রথম সংখ্যা বেরুলো ১৮৯৪ সালের ২৮শে এপ্রিল। সিড্‌নি এই কাগজের নেশায় ডুবে গেল। কাগজ বন্ধ হয়ে গেল বছরখানেকের মধ্যেই। শত চেষ্টা করেও তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হল না। কাগজ নিয়ে মত্ত ছিল বলেই হয়ত তার ব্যাংকের কাজে গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়ল। প্রায় পাঁচ হাজার ডলারের হিসাব নেই। অনেকেরই ধারণা হল কাগজ চালাবার জন্য সে এই টাকাটা ভেঙেছে। সিড্‌নি চাকরি ছেড়ে এল। ব্যাংকের কেউ কেউ তাকে বেশ পছন্দ করত। তাদের চেষ্টায় আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করাটা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রইল।

কাগজ বন্ধ হয়ে গেল বটে, কিন্তু তার লেখা দৃষ্টি আকর্ষণ করল 'হাউস্টন্ পোস্ট'-এর সম্পাদকের। সপ্তাহে প্রায় সত্তর টাকা বেতনে সে চাকরি পেল ঐ কাগজে। শহরের

যত সব গুজব নিয়ে নিয়মিত ফীচার লিখতে হবে। কর্তৃপক্ষ তার লেখার সাফল্য দেখে শীগ্‌গিরই বেতন বাড়িয়ে দিলেন। অ্যাথোল সুখী হল। এতদিনে তার আশা সত্য হবার সূচনা দেখা দিয়েছে।

এদিকে সিড্‌নিকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পরোয়ানা বেরিয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই তার জেলকে বড় ভয়। উঁচু প্রাচীর দেওয়া জেলের পুরনো বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার পা কেঁপে উঠত। এখন সেই জেলেই তাকে বন্দী হতে হবে। অ্যাথোল ও মেয়ে মার্গারেটকে ছেড়ে সে থাকবে কি করে? এর চেয়ে আত্মহত্যা করা ভালো।

সিড্‌নি জামিনে মুক্তি পেয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য টাকা প্রয়োজন। সম্পাদক তাকে প্রায় সাতশ' টাকা অগ্রিম দিয়ে বললেন, ভালো উকিল দিয়ে তোমার কথা বলাও, নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। এত টাকা একসঙ্গে সে কখনো হাতে পায়নি। পথে বেরিয়ে তার মনে হল এ-টাকা নিয়ে তো অনেক দূরে পালিয়ে যাওয়া যায়! হাণ্ডুরাস কিংবা এমনি কোনো স্থানে উপস্থিত হতে পারলে পুলিশ ধরতে পারবে না। কিছুদিনের মধ্যে জীবিকার্জনের একটা ব্যবস্থা করতে পারবেই। তারপর অ্যাথোল ও মার্গারেটকে নিয়ে যাবে। এখানে থাকলে সারা জীবন চুরির অপবাদটা বয়ে বেড়াতে হবে। সে যে নির্দোষ, তার অগোছালো স্বভাবের জন্যই যে ভুলটা হয়েছে, এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সকলের ঘৃণার পাত্র হওয়া অপেক্ষা পরিচিত জগৎ থেকে হারিয়ে যাওয়া ভালো।

হাণ্ডুরাসের গাড়ি ধরল সিড্‌নি। পুলিশের হাত থেকে বাঁচল; কিন্তু জীবিকা অর্জনের কোনো সুবিধাই করতে পারল না। হাতে যে টাকা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। অপরিচিত, অস্বাস্থ্যকর জায়গায় শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অ্যাথোল তার পথ চেয়ে আছে; চিঠি দেয় মাঝে মাঝে। বড়দিনের সময় একটি প্যাকেট এল। নতুন শার্ট, রুমাল আর কিছু খাবার। শাশুড়ী লিখেছেন: অ্যাথোল ১০৫ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে তোমার জন্য এই প্যাকেট সাজিয়েছে। দেখতে চাও তো শীগ্‌গির এসো।

সিড্‌নি আর দ্বিধা না করে চলে এল স্ত্রীর কাছে। বেশি দিন আয়ু নেই অ্যাথোলের। সরকার পক্ষ দয়াপরবশ হয়ে মামলা স্থগিত রাখল। মৃত্যুর পূর্বে স্বামীকে নিকটে পেয়ে বড় শান্তি পেল অ্যাথোল। সিড্‌নিকে বলল, আমার মৃত্যুতে তুমি ভেঙে পড়ো না। তোমার বয়স তো মাত্র চৌত্রিশ। লেখা বন্ধ করো না। হতাশ হয়ো না। লেখার মধ্যেই রয়েছে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

একদিন ঘুমের মধ্যে অ্যাথোলের প্রাণ বেরিয়ে গেল।

এবার আরম্ভ হল তার বিশ্বাস-ভঙ্গের বিচার। পাঁচ হাজার ডলারের পরিবর্তে মাত্র ৮৫৪ ডলার সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে সিড্‌নির পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হল। এটাই সবচেয়ে লঘু দণ্ড। জেলে যাবার আগে তার প্রথম গল্প মনোনীত হবার সংবাদ এল। অ্যাথোল জেনে যেতে পারল না।

উইলিয়াম সিড্‌নি পোর্টার এখন ৩০,৬৬৪ নম্বরের কয়েদী। জেল-হাসপাতালের

ডিস্‌পেনসারিতে কাজ করতে দিয়েছে তাকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে গল্প লেখে। গোপনে সে তার লেখা একজন পরিচিত লোকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে লেখা যায় সম্পাদকের দপ্তরে। কয়েকটা লেখা ছাপা হল। নিজের নামে নয়; ছদ্মনামে। জেলের কয়েদী তো নিজের নামে লিখতে পারে না। তাই সে 'ও. হেনরি' নাম নিয়েছে।

জেলে ভালো ব্যবহার করবার জন্য চার বছর পরেই সিড্‌নি মুক্তি পেল; নতুন করে উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। মার্গারেট বড় হয়েছে; তার জন্যও টাকার প্রয়োজন। কিন্তু কি কাজ করবে? যেখানেই চাকরি করতে যাবে সেখানেই পুলিশী তদন্তের ফলে তার জীবনের কলঙ্কিত অধ্যায়টি প্রকাশিত হবে। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় কাজ করা অসম্ভব। সুতরাং যদিও তখনো কোনো বৃহৎ সাফল্যের সূচনা দেখা যায়নি তথাপি লেখাই পেশা হিসাবে গ্রহণ করা স্থির করল। অন্ততঃ কিছুকাল চেষ্টা করে দেখবে।

নিউইয়র্কের যে সম্পাদক তার কয়েকটা লেখা ছেপেছেন তাঁর কাছে অগ্রিম প্রার্থনা করে চিঠি লিখল সিড্‌নি। নিউইয়র্ক যেতে পারলে লেখক ও সম্পাদকদের সাহচর্যে রচনা উন্নত হবে। তা ছাড়া পরিচিত পরিবেশের ধিক্কার থেকে বাইরে যেতে না পারলে কিছুতেই লিখতে পারবে না। চিঠি দিল বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি টাকা আসবে সিড্‌নি তা ভাবতে পারেনি। সম্পাদকের কাছ থেকে একদিন সত্যি টাকা এল, দু'শ ডলার। মার্গারেটের জন্য সব ব্যবস্থা করে সিড্‌নি নিউইয়র্ক যাত্রা করল।

সম্পাদক একজন অপরিচিত লোককে দু'শ ডলার পাঠিয়ে বেশ চিন্তিত। যদি না আসে? যদি প্রতারণা করে? সম্পাদক এক হস্তলিপি বিশারদের কাছে সিড্‌নির হাতের লেখা পাঠিয়ে দিলেন তার চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য। বিশারদ বিচার করে বললেন, না, প্রতারণা করবার লোক নয়, টাকা মারা যাবে না।

কিছুদিনের মধ্যেই সিড্‌নি সশরীরে কাগজের অপিসে উপস্থিত হয়ে সম্পাদকের সকল আশঙ্কা দূর করে দিল। নিউইয়র্কে পৌঁছবার কিছুদিন পর থেকে বিভিন্ন কাগজে তার গল্প বেরুতে লাগল। কয়েক মাস পরে তার মাসিক আয় দাঁড়াল প্রায় সাত আটশ' টাকা। লেখায় ক্লান্তি নেই। যত আহ্বান পায় সবই গ্রহণ করে। জলের ধারার মতো স্বচ্ছন্দে লেখা বেরিয়ে আসে। কাটা-কুটি নেই, একবার যা লেখা হল সেটাই শেষ। একই সঙ্গে চার-পাঁচটা গল্প লেখে। আজ এক সম্পাদককে দু'পাতা, আর একজনকে তিন পাতা দিল; কাল আবার আরো কয়েক পাতা দেবে। এমনি করেই লেখা চলে। নিউইয়র্ক ওয়ার্লড-এর সঙ্গে সপ্তাহে একটি করে গল্প দেবার চুক্তি করল। তার জন্য পারিশ্রমিক পাবে সপ্তাহে প্রায় সাড়ে চারশ' টাকা। ও. হেনরি যত প্রসিদ্ধি লাভ করছে সিড্‌নি পোর্টারের জগৎ তত হারিয়ে যাচ্ছে। পুরনো জীবনকে সে ভুলতে চায়। তাই আরো বেশি করে কল্পনার জগতে ডুবে যায়। কিপলিং, মেস্‌ফিল্ড

এবং আরো কত লেখক তার প্রসংশায় পঞ্চমুখ। দেখা করবার জন্য কত লোক উৎসুক। কিন্তু সে কারো সঙ্গে দেখা করে না।

বছর পাঁচেক অবিশ্রান্ত লিখে চলল সিড্‌নি। সম্পাদকদের কাছ থেকে টাকা যেমন পেয়েছে প্রচুর, ব্যয়ও করেছে তেমনি। মার্গারেটের জন্য, নিজের জন্য। কিন্ত ক্রমশঃ লেখার ক্ষমতা কমে আসছে। আগের মতো তেমন সহজ ধারায় লেখা আসে না। কলম নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ভাবতে হয়। তবু এমনি করে আরো বছর তিনেক কাটল। সম্পাদকদের কাছ থেকে অনেক আগাম টাকা নিয়েছে। সর্বদা তাগিদ পায়। নানা কথা বলে তাদের ভোলাতে হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে? তারা তো আর চিরকাল চুপ করে থাকবে না? হয়ত আদালতে মামলা হবে। আত্মপক্ষ সমর্থন করবার মতো তার কিছু নেই; সুতরাং আবার নির্ঘাত জেল। সিড্‌নি শিউরে ওঠে।

জেল থেকে বাঁচতে হবে। সিড্‌নি সকল শক্তি সঞ্চয় করে লিখতে বসে, কিন্তু কলমের মুখে একটি কথাও আসে না। সময় চলে যায়; শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। দেহ ভেঙে পড়েছে; মনের একাগ্রতা নেই; মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে। সারারাত না ঘুমিয়ে বসে থাকলেও একটা লাইন লেখা হয় না। নানা দুশ্চিন্তায় ঘুম তো একেবারেই বিদায় নিয়েছে।

দিনের বেলাতেও বড় একটা বেরুতে পারে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটায়। নিজের নিবুদ্ধিতার কথা মনে পড়ে, অনুশোচনা জাগে। কেন্‌ লেখা জীবনের পেশা বলে গ্রহণ করেছিল? এ-পেশায় ছুটি নেই। শরীর অপটু হোক, কল্পনার আকাশ হারিয়ে যাক, তবু লেখা দিয়ে পাঠককে সন্তুষ্ট না করতে পারলে হাতে কিছুই আসবে না।

১৯১০ সালের ৫ই জুন হাসপাতালে সিড্‌নি পোর্টারের মৃত্যু হল। হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্য যে সামান্য ক'টা টাকার দরকার তাও কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী চাঁদা তুলে দিয়েছিল।

Dale Kramer সিড্‌নি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর করে তার প্রকৃত পরিচয় দিয়েছেন The Heart of O. Henry নামক গ্রন্থে।

গগোল

গগোলের সাহিত্য আমাদের নিকট পরিচিত ; তাঁর জীবনকে আমরা সামান্যই জানি। গগোলের প্রধান প্রধান কয়েকটি বই বাঙলায় অনুবাদ হয়েছে। লেখকের জীবনের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাঁর রচনার রস আস্বাদন করতে সুবিধা হয়। বিশেষ করে গগোলের মতো লেখকের রচনার রসোপলব্ধিতে সেই পরিচয়ের আবশ্যকতা খুব বেশি। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগের লেখকদের নাম যত করা হয়, তাঁদের লেখা ততটা পড়া হয় না। তাই এ-সব লেখকদের জীবন ও কীর্তি সম্বন্ধে নতুন বই কমই পাওয়া যায়। David Magarshack ইতিপূর্বে তুর্গেনিভ ও চেকভ-এর জীবনী লিখেছেন। সম্প্রতি তাঁর লেখা গগোলের জীবনী বেরিয়েছে।

রাশিয়ান সাহিত্যে গগোল উপন্যাস রচনায় নতুন পথ দেখালেন। রাশিয়ান উপন্যাসের জন্মদাতা গগোল—এ-কথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। য়ুরোপের অন্যান্য দেশ যখন কাব্যে ও উপন্যাসে রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন সেই সময় গগোল উপন্যাসের মধ্যে রিয়ালিজমের প্রবর্তন করলেন। গগোল রাশিয়ান উপন্যাসে যে রিয়ালিজমের ধারা শুরু করেছিলেন আজ পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ আছে।

১৮০৯ সালের ১৯শে মার্চ গগোল দক্ষিণ রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান। প্রথম দু'জন জন্মের অব্যবহিত পরেই মারা গিয়েছিল। এ-জন্য তিনি খুব আদরের ছেলে ছিলেন। কিন্তু যে স্বাস্থ্যহীনতা নিয়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল তার হাত থেকে সারা জীবন তিনি মুক্তি পাননি।

স্কুলে পড়বার সময়ই গগোল সাহিত্য-সাধনা শুরু করেন। প্রথম প্রথম তিনি কবিতা লিখতেন। সমালোচকদের বিরূপ মন্তব্যের ফলে তিনি গেলেন থিয়েটারে অভিনয় করতে। অভিনয়েও তাঁর কোনো সুবিধা হল না। এর পর গগোল কসাকদের জীবন নিয়ে গল্প লেখা শুরু করলেন। ১৮৩১ সালে তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ 'Evenings on a Farm near Dikanka' প্রকাশিত হয়। উক্রেনের জীবন নিয়ে লেখা এই নতুন ধরনের গল্পগুলি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। সম্মানিত করবার জন্য তাঁকে সেন্টপিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করা হয়। য়ুরোপের মধ্যযুগ ও লিটল রাশিয়ার ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করা ছাড়া অধ্যাপক হিসাবে তিনি আর কিছুই করতে পারেননি। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

১৮৩৫ সালে প্রকাশিত হয় Taras Bulba। এই উপন্যাসটিকে একটি গদ্যে রচিত এপিক বলা যেতে পারে। এর মধ্যে রোমান্টিসিজমও আছে। তারাস বালবা একজন দুর্ধর্ষ কসাক-দলপতি। একবার সে তার দুই ছেলে ও অনুচরদের সঙ্গে করে পোল্যান্ড আক্রমণ করল। এক ছেলে শত্রুপক্ষের একটি মেয়েকে খাদ্য দিয়ে সাহায্য

করায় এবং অন্যরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করায় তারাস বালবা তাকে হত্যা করতে দ্বিধা করল না। অপর পুত্রের মৃত্যু হল শত্রুর হাতে। তারাস বালবাকেও বিরোধীপক্ষ পুড়িয়ে মারল।

ঐ বছরই প্রকাশিত হয়েছিল গগোলের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গল্প The Cloak। এটি যে শুধু গগোলের রচনাধারায় পরিবর্তন সূচনা করেছে তাই নয়, রাশিয়ার কথা-সাহিত্যে রিয়ালিজমের সূত্রপাত হয় এই গল্প থেকেই। গগোল রোমান্টিসিজম ত্যাগ করে এই গল্পে প্রথম পুরোপুরি রিয়ালিস্ট হয়ে উঠেছেন। সাধারণ একজন কেরানীর শখ হল সে সুন্দর একটি ক্লোক কিনবে। এর জন্য অত্যন্ত কষ্ট করে সে টাকা জমাতে লাগল। খুব প্রয়োজনীয় জিনিসও না কিনে পয়সা জমাতে লাগল সে। দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করবার পর পছন্দ মত একটি ক্লোক কিনে একদিন মাত্র ব্যবহার করবার পরই সেটি হারিয়ে গেল। এই ঘটনাটি কেন্দ্র করে গগোল কেরানী জীবনের যে বাস্তব ও সূক্ষ্ম চিত্র এঁকেছেন তার সংগে একমাত্র ফ্লোবেয়ার-এর রিয়ালিজমের তুলনা হতে পারে।

পুশকিন গগোলকে দু'টি প্লট বলেছিলেন। গগোল একটিকে ব্যবহার করেন The Inspector-General-এ; আর একটি ব্যবহার করেছেন Dead Souls-এ। 'ইনস্পেক্টর-জেনারেল' রাশিয়ান সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাটক। এই তীব্র বিদ্রূপাত্মক নাটকে লেখক সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক হতচ্ছাড়া দরিদ্র যুবক সেন্টপিটার্সবার্গ থেকে ছুটিতে বাড়ি রওনা হয়েছে। কিছুদূর গিয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়ল। হোটেলে থাকা-খাওয়ার টাকা দিতে পারে না। তাকে দেনার দায়ে গ্রেপ্তার করে জেলে নেবার সময় স্থানীয় কর্মচারীদের হঠাৎ মনে হল যে, এই যুবক হয়ত ছদ্মবেশী ইনস্পেক্টর-জেনারেল; তাদের নানা কু-কর্মের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারো কারো মনে এমন বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হল যে, আসল ইনস্পেক্টর-জেনারেলের সংগে এই যুবকের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। সুতরাং তাদের কোনো ভুল হয়নি। উপরওয়ালাকে তারা সবাই খুব ভয় করত। জেলে নেবার পরিবর্তে তারা প্রত্যেকেই উপঢৌকন এনে উপস্থিত করল; আর যত্ন-আত্তির তো শেষ নেই। নিজে ভালো, এইটে প্রমাণ করবার জন্য একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল। যাতে ভালো রিপোর্ট হয় এ-জন্য সবাই ব্যগ্র। যুবক সুযোগ বুঝে ইনস্পেক্টর-জেনারেলের পার্ট বেশ ভালোই অভিনয় করল। ঘুষ ইত্যাদি নিয়ে যুবক গ্রেপ্তার এড়িয়ে যখন অনেক দূর চলে এল তখন সরকারী কর্মচারীরা জানতে পারল আসল ইনস্পেক্টর-জেনারেল তাদের কাজ দেখতে শীগ্‌গিরই আসছেন।

১৮৩৬ সালে গগোল রোমে আসেন। এখানে তিনি রচনা করেন Dead Souls. ১৮৪২ সালে এ-বই প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাশিয়ায় ট্যাক্স নির্ধারিত করা হত জমির পরিমাণ দিয়ে নয়, জমিতে কাজ করবার জন্য কতজন ক্রীতদাস আছে

তার উপরে। ক্রীতদাসের সংখ্যা সরকারী কর্মচারীরা কয়েক বছর পর পর গুণে যেত। পরবর্তী সেন্সাস না হওয়া পর্যন্ত এই গণনার ভিত্তিতে ট্যাক্স দিয়ে যেতে হবে, এই ছিল নিয়ম। ইতিমধ্যে কয়েকজন ক্রীতদাসের মৃত্যু হলেও তাদের দরুণ ট্যাক্স রেহাই পাওয়া যেত না।

সরকারী নথিপত্রে ক্রীতদাসকে 'Soul' বলে উল্লেখ করা হত। মৃত ক্রীতদাস বা Dead Souls-দের জন্যও দীর্ঘকাল যাবৎ ট্যাক্স দিয়ে যেতে হত বলে জমিদারদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল 'ডেড সোলস'-এর নায়ক চিচিকভ। এই ধুরন্ধর ব্যক্তি স্থির করল সে প্রত্যেক জমিদারের কাছে ঘুরে ঘুরে মৃত ক্রীতদাসদের কিনে নেবে। ক্রীতদাস বিক্রি করা আইনসিদ্ধ ছিল। মিথ্যা ট্যাক্স বইতে হচ্ছে বলে জমিদার সানন্দে মৃত ক্রীতদাসদের চিচিকভের নিকট বিক্রি করা হয়েছে দেখিয়ে ট্যাক্স থেকে রেহাই পাবে। চিচিকভ প্ল্যান করল এই মৃত ক্রীতদাস ক্রয় করাটা সে রেজিস্টার্ড করে রাখবে। কয়েক হাজার মৃত ক্রীতদাস কেনার দলিল রেজিস্টার্ড করা হয়ে গেলে এই দলিল দেখিয়ে সে ব্যাংক থেকে মোটা টাকা ধার করতে পারবে; আর সে টাকায় 'ডেড সোলস' নয়, জীবন্ত ক্রীতদাসই কিনতে পারবে।

সাফল্য যখন একান্ত নিকটবর্তী তখন চিচিকভের মনে কেন জানি হঠাৎ দ্বিধা দেখা দিল। এমনই তার দুর্ভাগ্য যে, সে-সময় অসাবধানতার সঙ্গে একটা উইল জাল করতে গিয়ে সে ধরা পড়ল। উকিলের মারপ্যাচে মুক্তি পেল বটে, কিন্তু তাকে শহর ত্যাগ করে চলে যেতে হল। চিচিকভের গ্রেপ্তার ও বিচারের দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে গগোল তদানীন্তন বিচার-ব্যবস্থা ও সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতাকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন।

চিচিকভ 'ডেড সোলস' সংগ্রহের জন্য রাশিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে এবং সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে তাকে মিশতে হয়েছ। চিচিকভের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে গগোল উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার জীবনের হুবহু বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। গগোল সমাজের সকল স্তরের লোকদের এনেছেন তাঁর কাহিনীতে। চিচিকভের ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে লেখার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন 'ডন কুইকসট' থেকে। 'ডেড সোলস'-এর কমিক সুরটা বাইরে থেকে প্রধান মনে হলেও এর মূল সুর কিন্তু সমাজের দুঃখ, দারিদ্র্য, অত্যাচার ও অবিচারের জন্য বেদনা।

'ডেড সোলসের' কাহিনী অসম্পূর্ণ। তার কারণ কাহিনীর প্রথম ভাগ মাত্র গগোল ছাপিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ করেও পাণ্ডুলিপি তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। ১৮৪৮ সালে গগোল জেরুজেলাম গিয়েছিলেন তীর্থভ্রমণে। সেখান থেকে ফিরে এসে কি এক বিচিত্র ধর্মের মোহ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন তাঁর মনে হল 'ডেড সোলস'-এর দ্বিতীয় ভাগে যা কিছু লিখেছেন তা পাপে পূর্ণ; সুতরাং এই বই প্রকাশ করে জনসাধারণের হাতে দিলে তিনি অপরাধী হবেন। তাই একদিন পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেললেন।

তেতাল্লিশ বছর পূর্ণ হবার মাসখানেক পূর্বে গগোলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে ডাক্তাররা চিকিৎসার নাম করে তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে। তিনি শান্তিতে ঈশ্বরের নাম করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। ডাক্তাররা তা দিল না। তারা তাঁর দেহের উপর নানা উৎপীড়ন করতে লাগল। নাকে-মুখে বড় বড় জোঁক লাগিয়ে রাখল দূষিত রক্ত দূর করবার জন্য। মৃত্যুর একদিন আগে থেকে তিনি যন্ত্রণায় কেবল চিৎকার করেছেন।

মৃত্যুর পরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত গির্জায় গগোলের দেহ নিয়ে যাওয়া হয়। শ'আড়াই বই ছাড়া গগোলের আর কোন সম্পত্তি ছিল না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচায় তাঁকে কবর দেবার ব্যবস্থা করা হয়। গগোলের মৃত্যু রাশিয়ার সর্বত্র এরূপ গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে যে সংবাদপত্রে তাঁর নাম উল্লেখ করা সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তুর্গেনিভ এই আদেশ অগ্রাহ্য করে একটি কাগজে গগোলের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিজের বাড়িতে কিছুকালের জন্য আটক রাখা হয়েছিল।

জীবনী নয় তো, জীবন্ত উপন্যাস। বিয়োগান্ত গ্রীক নাটকের মতো সমাপ্তি। সে জীবনের শুরু হলো ৭ই জুন, ১৮৪৮ সালে। শিল্পী ইউজীন হেনরি পল গগ্যাঁর জন্মদিন। গগ্যাঁর যখন জন্ম হলো তখন ফ্রান্স গৃহযুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। গগ্যাঁর বাবা ছিলেন বামপন্থী সাংবাদিক। লুই নেপোলিয়ন পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবার পর তাঁর আশঙ্কা হলো হয়তো রাজনৈতিক মতবাদের জন্য তাঁকে লাঞ্ছনা পেতে হবে। সুতরাং তিনি ফ্রান্স ত্যাগ করে সপরিবারে পেরু যাত্রা করলেন। কিন্তু জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হলো। বিধবা মেরি ছেলেমেয়ে নিয়ে পেরুর রাজধানী লিমা শহরে এসে উঠলেন এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে। ফ্রান্সে ফিরে গেলেন না।

পেরুতে কাটল কয়েক বছর। বৃদ্ধ কাকার মৃত্যু হবার পর সেখানে থাকা আর সম্ভব হলো না। মেরি পুত্র-কন্যা নিয়ে আবার ফিরে এলেন ফ্রান্সে শ্বশুরের ভিটায়। কিছু জমিজমা ছিল। তাই দিয়ে কষ্টে দিন কাটে। গগ্যাঁর বয়স তখন আট বছর। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বিধবা মায়ের সকল স্বপ্ন ছেলেকে ঘিরে। গগ্যাঁর লম্বা ছাঁদের স্পর্শকাতর অদ্ভুত আঙুলগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে মা ভাবেন, বড় হয়ে ও কী করবে? স্কুলের শিক্ষক বলেছেন, ও হয় গাধা হবে, নয়তো মস্ত বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তি হবে। প্রতিবেশীরা কেউ কেউ বলেছে, গগ্যাঁ ভাস্কর হবে। ছুরির বাঁটে কত সুন্দর সুন্দর ছবি খোদাই করেছে, দেখনি তোমরা? কি জানি, কি আছে অদৃষ্টে! মায়ের মন ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনে।

সতেরো বছর বয়সে গগ্যাঁ সে জাল ছিঁড়ে দিল নিজের হাতে। পড়াশুনা আর ভালো লাগে না, সে যাবে খালাসী হয়ে সমুদ্রগামী জাহাজে। পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছে স্পেনের রক্ত; ছেলেবেলা কেটেছে দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ উপনিবেশে। স্পেনের অশান্ত, ভবঘুরে আত্মা জেগে উঠেছে তার মধ্যে। মার চোখের জল তাকে ঠেকাতে পারল না। রোগা, লম্বা, লিকলিকে চেহারার তরুণ সমুদ্রের দুরন্ত আহ্বানে একদিন জাহাজে চড়ে বসল।

ফ্রান্স ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে চলাচলকারী জাহাজে গগ্যাঁ তৃতীয় শ্রেণীর খালাসী। বয়লারে কয়লা দেয়, কাছি টানে, ডেক ধুয়ে পরিষ্কার করে। দীর্ঘ ছ' বছর ধরে এই কাজ করল। তারপর হঠাৎ জাহাজের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলো ডাঙায়। এসে দেখল, তার কোথাও আশ্রয় নেই প্যারিসের রাজপথ ছাড়া। মা মারা গেছেন; বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তেইশ বছর বয়সে গগ্যাঁ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। তবু দুর্বল নয়। সমুদ্রের লোনা হাওয়া তার ক্ষীণদেহকে শক্ত-সমর্থ করে তুলেছে। গগ্যাঁকে দেখলেই মনে হয় যেন একটা প্রচণ্ড শক্তির উৎস হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে তার দেহের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছে। সমুদ্রের জীবন তাকে উপহার দিয়েছে একটি স্বপ্ন-কোরক।

একজন সহকর্মী নাবিকের কাছে গল্প শুনেছে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের বিচিত্র কাহিনী। রৌদ্রোজ্জ্বল সেই দ্বীপগুলিতে খাবার সংগ্রহের জন্য কাজ করতে হয় না, মেয়েরা আপনি এসে ধরা দেয়, নীতির দোহাই তাদের পায়ে বেড়ি পরায়নি। গগ্যাঁর অবচেতন মন অলক্ষ্যে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিম জীবনে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুর পূর্বে মা এক ভদ্রলোককে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন গগ্যাঁকে সাহায্য করতে। সেই ভদ্রলোকের চেষ্টায় গগ্যাঁ একটা চাকরি পেল। স্টক এক্সচেঞ্জের চাকরি। বেতন ভালো, ভবিষ্যতে উন্নতির পথ খোলা। পকেটে টাকা আছে, কিন্তু গৃহের আশ্রয় নেই। নাবিক-জীবনে মেয়েদের সম্বন্ধে বিভিন্ন বন্দরে সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। কিন্তু ভদ্রঘরের কোনো অনাত্মীয়া মেয়ের সংগে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। মেৎ-এর সংগে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল। কোপেনহেগেন থেকে মেৎ কয়েক-দিনের জন্য প্যারিস বেড়াতে এসেছে; তেইশ বছর বয়স হলো, তবু বিয়ের সম্ভাবনা নেই। সে যুগে এটা রীতিমতো হতাশার কথা। মেৎ-এর নারীহৃদয় সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল গগ্যাঁর দেহে পৌরুষের ব্যঞ্জনা দেখে। তার আকর্ষণ গভীর হলো গগ্যাঁর মুখে সমুদ্রজীবনের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে। মেৎ-এর দেহও স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল, সুন্দর গড়ন, দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠ, স্থির শান্ত চোখ। এ মেয়ের মন কাদার মতো কোমল নয়; ভাঙবে, তবু নোয়াবে না। গগ্যাঁর ভালো লাগল। প্রস্তাব জানাল জীবনসংগিনী হবার। মেৎ সানন্দে সম্মতি দিল। দুবার তাদের বিয়ে হলো; একবার ফরাসী রীতি অনুযায়ী, একবার কনের ড্যানিশ সামাজিক রীতি অনুসারে। নতুন জীবনের কতো আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মেৎ স্বামীগৃহে প্রবেশ করল! এক অদৃশ্য-চারিণী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সতীন তার জীবনে ভাগ বসাবার জন্য যে অপেক্ষা করছে, মেৎ ঘুণাক্ষরেও তা জানল না। বিয়ের কিছুকাল পরে মেৎ দেখল গগ্যাঁ ছুটির দিনে তুলি-রঙ্ নিয়ে বসে, ছবি আঁকে। পুরুষের একটা খেয়াল থাকা ভালো, মনে মনে মেৎ ভাবে। ছুটিতে স্বামীর সংগে বেড়াবার ও গল্প করবার সুযোগ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় একটু বিরক্তি বোধ করে শুধু। শিল্পী-বন্ধু সুফ্নেকারের সাহচর্য লাভ করে গগ্যাঁর খেয়াল ক্রমশঃ সাধনায় পরিণত হতে লাগল। গগ্যাঁ কোনদিন শিল্পবিদ্যালয়ে অথবা শিক্ষকের কাছে শিল্প-চর্চার সুযোগ পায়নি। স্বাভাবিক শিল্প-প্রেরণায় সে ছবি আঁকে। এ সব ছবির মূল্য কি, কে জানে! বন্ধুদের কথায় একটা প্রদর্শনীতে ছবি পাঠালো। কর্তৃপক্ষ তার একখানি ছবি প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচন করায় গগ্যাঁর উৎসাহ বাড়ল। যা ছিল অবসর বিনোদনের খেলা, তা হয়ে উঠল জীবনের একমাত্র সাধনা। চাকরিটা মনে হয় বন্ধন। যতটুকু সময় পায় প্যারিসের বিভিন্ন স্টুডিওতে ঘুরে বেড়ায়। শিল্পী-বন্ধুদের স্টুডিওতে বসে মডেল ভাড়া করে ছবি আঁকে। ১৮৮১ সালের ইম্প্রেশানিস্ট প্রদর্শনীতে Etude de Nu নামে একটি ছবি পাঠিয়ে গগ্যাঁ শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পেল। দেগা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীরা এবং প্যারিসের বিখ্যাত শিল্প-সমালোচকরা

বললেন, নগ্ন নারীমূর্তির এমন বাস্তব ছবি একমাত্র রেমব্রাঁ ছাড়া আর কেউ এ পর্যন্ত আঁকতে পারেনি। এই স্বীকৃতি গগ্যাকে ভাবিয়ে তুলল। যেদিকে তাকায় অসংখ্য ছবির মিছিল চোখে পড়ে। সেই ছবিগুলি যেন তাকে প্রার্থনা জানায়ঃ 'পটের উপর রঙ বুলিয়ে আমাদের ফুটিয়ে তোল; শুধু তোমার দেখায় আমাদের তৃপ্তি নেই; সকলে দেখুক আমাদের।' বন্দিনী রূপসীর আর্তনাদে মধ্যযুগের বীরের হৃদয় যেমন কেঁদে উঠত, গগ্যার মন তেমনি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ছবির কান্না সে শুনেছে। তার হাতে আছে ওদের মুক্তি।

কিন্তু ছবির পায়ে সর্বস্ব দান না করলে শিল্পীর অধিকার সে পাবে না। শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বড় ঈর্ষাপরায়ণ; ছবিকে ভালবাসলে আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না। স্ত্রী, সন্তান, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সবকিছু ত্যাগ করতে হবে। দীর্ঘ এগারো বৎসর সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ জীবন কেটেছে; পাঁচটি সন্তানকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে; ভালবাসে মেৎকে। গৃহস্থ জীবনের সঙ্গে শিল্পীর জীবনকে খাপ খাওয়ানো যাবে না। মেৎ ছবি ভালো চোখে দেখে না, বিশেষ করে নগ্ন নারীমূর্তি আঁকবার পর থেকে সে রীতিমত বিরূপ হয়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা একদিন বড় হবে, তারা নিজেদের জীবনের পথ বেছে নিয়ে চলে যাবে; বৃদ্ধ পিতার জন্য তো কেউ বসে থাকবে না। তাদের জন্য কি গগ্যা নিজের জীবনকে বলি দেবে? শিল্পের দাবিকে কি প্রত্যাখ্যান করবে সে? প্রত্যাখ্যান করলে জীবনের আর কি অর্থ রইলো? না, ছবি সে ত্যাগ করতে পারবে না। ছবি তার জীবন। ত্যাগ করল অর্থ, বিলাস, স্নেহ, প্রেম, গৃহসুখের আশা। এতদিন বিপথে ঘুরেছে; বয়স হলো পঁয়ত্রিশ। এখন দেখা পেল পথের। আর তো একদিনও নষ্ট করা যায় না। সময় নেই। ১৮৮৩ সালের জানুআরি মাসে চাকরি ছেড়ে তুলি হাতে ঘরে ফিরল। এবার শুধু ছবি আঁকবে। সারাক্ষণ কেবল ছবির সাধনা। মেৎ ভয়ে বিস্ময়ে কপালে করাঘাত করল।

মম্-এর উপন্যাস (The Moon and Six pence) থেকে এই ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে, গগ্যা পরিবারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে চলে গিয়েছিল। তা কিন্তু সত্য নয়; গগ্যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্রের কথা স্মরণ করেছে। শিল্পচর্চার পথে বাধা দিলে পরিবারের দাবি অগ্রাহ্য করে শিল্পের পথে এগিয়ে যাবে, এই ছিল তার সংকল্প। তার শিল্প-প্রেরণাকে সহানুভূতির চোখে দেখে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মেৎও এগিয়ে আসুক, এই ছিল তার গোপন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মেৎ সাধারণ মেয়ে; একটু জেদী এবং আত্মপরায়ণ। যে মসৃণ জীবনকে এতদিন জেনেছে তাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবার নির্বুদ্ধিতা সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না।

বছরখানেক মোটামুটি একভাবে কেটে গেল, জমানো টাকা ভেঙে। গগ্যা সারা দিন ছবি নিয়ে মত্ত। কোনদিন ছবি আঁকার মূল নীতিগুলি শেখেনি; এখন শিখতে হচ্ছে প্রথম থেকে। অদম্য তার আশা; ছবি বিক্রি করে সংসার চালাতে পারবে, এমন দিনের দেরি নেই। কিন্তু বৃথা আশা; পুঁজি নিঃশেষ হয়ে গেল। ছেলেমেয়ে নিয়ে নিশ্চিত

অনাহারের সামনে এসে দাঁড়াল। খেয়ালের বশে এমন ভালো চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি নেই; আর্থিক সাহায্য পাওয়া কঠিন। নিরুপায় হয়ে সপরিবারে গগ্যাঁ কোপেনহেগেন-এ শ্বশুর বাড়ির আশ্রয়ে এসে উঠল। মেৎএর তিরস্কার, শ্বশুর বাড়ির লোকদের বিদ্রূপ ও ঘৃণা কিছুদিনের মধ্যেই অসহ্য হয়ে উঠল গগ্যাঁর কাছে। ছ'বছরের প্রিয় পুত্র ক্লভিসকে সঙ্গে করে সে প্যারিসে ফিরে এলো। এবার তাকে নগ্ন নিষ্ঠুর ক্ষুধার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো। অনাহারে, অচিকিৎসায় ছেলে মৃত্যুশয্যায়; তার নিজের স্বাস্থ্য ভালো বলেই অনাহার সহ্য করেও চলতে পারে। নিরুপায় হয়ে বোনের কাছ থেকে ভিক্ষে করে কিছু টাকা এনে ছেলেকে একটা সস্তা বোর্ডিং হাউসে রেখে এলো।

আশ্রয় নেই, খাদ্য নেই, পরিধানের পুরানো পোশাকটা ছাড়া দ্বিতীয় পোশাক নেই। মেৎ সব জানে; তবু ধিক্কার দিয়ে চিঠি লেখে টাকা দাবি করে। গগ্যাঁ আশ্বাস দেয়, সংসার চালাবার মতো উপার্জন হলেই সবাইকে নিয়ে আসবে। কিন্তু উপার্জনের আশা কই? ইম্প্রেশানিস্ট ও সিমবলিস্ট বন্ধুরা তার শিল্পকীর্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবু ছবি বিক্রি হয় না। গগ্যাঁর মৃত্যুর পরে যে-সব ছবি হাজার হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে, তাদের দিকে ক্রেতারা ফিরেও তাকায়নি। বাঁচবার তাগিদে গগ্যাঁ দৈনিক চার ফ্রাঁ পারিশ্রমিকে প্যারিসের পথে পথে বিজ্ঞাপনের ছবিওয়ালা বড় বড় কাগজে আঠা দিয়ে এঁটে দেয়। এত করেও ফ্রান্সে শুধু নিজের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করতে পারল না গগ্যাঁ।

পানামার কাছে টোব্যাগো নামে জনমানবহীন ছোট্ট একটা দ্বীপ আছে। সেখানে বাঁচবার জন্য কাজ করবার দরকার নেই। প্রকৃতির অজস্র দান। সারা দিন নিশ্চিন্ত মনে ছবি আঁকবে। সভ্যতার কলুষ স্পর্শরহিত আদিম জীবনের মধ্যে ফিরে যাবার এতদিনের স্বপ্ন সফল হবে।

ফ্রান্স থেকে বিদায় নিল গগ্যাঁ। কিন্তু পেল না তার স্বপ্নের দ্বীপকে। ইতিমধ্যে পানামা খাল কাটা হয়েছে। খাল কাটার শ্রমিকরা সেই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। দু'মুঠি অন্নের জন্য এখানেও উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। নিরুপায় হয়ে গগ্যাঁ মার্টিনিক দ্বীপে নামমাত্র পারিশ্রমিকে মাটি কাটার কাজ আরম্ভ করল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম। রাত্রিতে মশার জ্বালায় ঘুমানো অসম্ভব। ম্যালেরিয়ার মড়ক লেগে আছে বারো মাস। শত শত লোক মরছে। এখানে গগ্যাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। কিন্তু দেশে ফিরে যাবার মতো পয়সা নেই। জাহাজে নাবিকের চাকরি নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্যারিস এসে পেঁছল।

আবার ক্ষুধার সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রাম। সে সংগ্রামে মেৎ-এর কাছ থেকে একটু প্রেমসিক্ত সহানুভূতি পেলে সকল কষ্ট সহ্য করা হয়তো সহজ হতো। মার্টিনিক থেকে ফিরে লিখল: 'পাঁচ বছর ছেলেমেয়েদের দেখি নি। কোপেনহেগেন গিয়ে ওদের একবার দেখে আসতে বড় ইচ্ছা করছে।' মেৎ লিখল, 'আগে টাকা উপার্জন করো, তারপর ওদের দেখবে।'

গগ্যাঁর সবচেয়ে বড় সমঝদার ছিল প্রসিদ্ধ শিল্পী ভ্যান গগ্। গগ্যাঁর দুরবস্থা দেখে ভ্যান গগ্ আমন্ত্রণ জানাল তার সঙ্গে থাকবার জন্য। বেশি দিন থাকা হলো না; ভ্যান গগের মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় একদিন উন্মুক্ত ছোরা নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে এলো। গগ্যাঁ চলে এলো গগের আশ্রয় ত্যাগ করে।

মেৎ-এর নির্মম ব্যবহার, শিল্পীর প্রতি ফরাসীদের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য এবং তার নিজের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থা গগ্যাঁকে সভ্যতার উপর বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। সভ্যতাবর্জিত আদিম সমাজে বাস করবার আকাঙ্ক্ষাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাছাড়া ফ্রান্স থেকে না পালালে অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকখানি ছবি বিক্রি হলো। সেই টাকা নিয়ে গগ্যাঁ তাহিটির জাহাজে উঠে বসল। যেদিন তার বিয়াল্লিশ বছর পূর্ণ হলো সেদিন গগ্যাঁ তাহিটিতে পা দিল। স্থানীয় সরল অধিবাসীরা তাকে নিজেদের মধ্যে সাদরে গ্রহণ করল। গগ্যাঁকে খাদ্য এনে দেয়; কোনো বাধানিষেধ নেই, প্রতি রাত্রিতে এক-এক জন মেয়ে তার সঙ্গে রাত কাটিয়ে যায়। এইটে তাহিটি সমাজের স্বাভাবিক আতিথেয়তা। তেহুরা নামে একটি তরুণীকে সে গৃহিণী করে ঘরে আনল। বিয়ের বন্ধন নেই। যতদিন ইচ্ছা থাকবে। গগ্যাঁ ছবি এঁকে চলেছে; ছবি শেষ হলে মেৎকে পাঠিয়ে দেয়; বিক্রি করে তার কাছে টাকা জমিয়ে রাখবে। তারপর হিসাব করা হবে। ফ্রান্সের শিল্প-রসিক মহলে তার নাম পরিচিত, কাগজে তার সম্বন্ধে আলোচনা বের হয়। তাহিটিতে বছর দুই ধরে অনেক ছবি এঁকেছে। এবার গগ্যাঁর আশা হলো প্যারিসে ফিরে গেলে ছবি থেকে একটা স্থায়ী আয় হবে।

আবার প্যারিস। মেৎ অনেক টাকার ছবি বিক্রি করেছে। প্যারিসে থাকবার ব্যয় নির্বাহের জন্য তা থেকে কিছু টাকা চেয়ে পাঠালো। মেৎ টাকা দিতে অস্বীকার করল। পরিবার প্রতিপালনের জন্য তারই আরো টাকা দেওয়া দরকার। গগ্যাঁ ভেবেছিল তাহিটিতে আঁকা নতুন আঙ্গিকের ছবিগুলির প্রদর্শনী করবে। অধিকাংশ ছবিই মেৎ-এর কাছে। প্রদর্শনীর জন্য ছবিগুলি তার হাতে দিতেও সে অনিচ্ছুক। মেৎ এবার ছবি চিনেছে।

নতুন করে জীবন আরম্ভ করবার পূর্বেই দুর্ভাগ্যক্রমে গগ্যাঁর পা ভেঙে গেল। উত্থানশক্তি রহিত হয়ে দীর্ঘকাল অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করে গগ্যাঁ তাহিটি ফিরে যাবার সংকল্প করল। শেষ বার প্যারিসে তার ছবির প্রদর্শনী করা হলো। শিল্প-রসিকরা প্রশংসা করলে কি হবে, ছবি বিক্রি হলো না। কবি মালার্মে গগ্যাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন:

"It is extraordinary that anyone can put so much mystery into so much brightness."

মেৎকে তাহিটি যাবার জন্য বলতে গিয়েছিল শেষ বারের জন্য। মেৎ অস্বীকার করেছে। মেৎ-এর কাছে যে-সব অবিক্রীত ছবি ছিল, সেগুলো গগ্যাঁকে দেখতে পর্যন্ত

দেয়নি। এবার সে তাহিটি এসে পেঁছিল রুগ্ণ, অশক্ত দেহ নিয়ে। মারাত্মক সিফিলিস রোগ নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। তেহুরা অন্য একজনকে নিয়ে ঘর করছে। গগ্যাঁ এবার ঘরে আনল পাহুরাকে। কিন্তু ভাঙা পায়ের যন্ত্রণা, সিফিলিসের ঘা, চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলল। তার উপর অর্থাভাব তো আছেই। সংবাদ এলো, তার বড় আদরের মেয়ে অ্যালাইন মারা গেছে। মেৎ অভিযোগ করেছে পিতা তার কর্তব্য পালন না করায় অবহেলায় অচিকিৎসায় অ্যালাইনের মৃত্যু হয়েছে। গগ্যাঁ জীবনের ভার আর বইতে না পেরে ১৮৯৮ সালের ফেব্রুআরি মাসে আর্সেনিক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। কিন্তু মৃত্যু হলো না ; শুধু শরীরটা আরো ভেঙ্গে পড়ল।

এত কষ্টের মধ্যেও ছবি আঁকার বিরাম নেই। তার জীবনের বেদনা ছবির উপর ছায়া ফেলে না। ছবিতে শুধু তাহিটির রৌদ্রোজ্জ্বল দৃশ্যের অপূর্ব বর্ণসুষমা।

তাহিটি থেকে গগ্যাঁ হিভা-ওয়া নামে একটি ছোট দ্বীপে এলো। এখানে বসবাসের জন্য নতুন বাড়ি করল। ছবি দিয়ে ঘর সাজাল, বাঁশের ও কাঠের খুঁটিতে নিপুণভাবে খোদাই করল নানা মূর্তি। শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। বেশি দূর হাঁটতে পারে না। কিন্তু মনের শক্তি তখনো যথেষ্ট ছিল। স্থানীয় সরল অধিবাসীদের উপর পাদ্রিরা এবং ফরাসী রাজকর্মচারীরা যে অত্যাচার করে গগ্যাঁ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কাগজে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করল। ফলে মানহানির দায়ে পড়তে হলো গগ্যাঁকে। বিচারে হাজার ফ্রাঁ জরিমানা এবং তিন মাসের জেল হলো। এই দণ্ড দেবার সুযোগ সরকার পেল না। গগ্যাঁর অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে লাগল। চোখে প্রায় দেখতে পায় না ; সর্বাঙ্গে ঘা , ভাঙ্গা পা-টা ফুলে উঠেছে ; অসহ্য যন্ত্রণায় আচ্ছন্নের মতো সর্বদা পড়ে থাকে। সেই অপরিচিত দেশে কেউ দেখবার নেই, একটা সান্ত্বনার কথা বলবার লোক নেই। ১৯০৩ সালের মে মাসে হঠাৎ একদিন সকলের অজ্ঞাতে তার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের এক কোণে অসমাপ্ত ছবি 'ব্রিটানির তুষার' দেখে মনে হয় সেই রৌদ্রের দেশে থেকেও মৃত্যুর পূর্বে গগ্যাঁর স্বদেশের তুষারের কথা বড় বেশি করে মনে পড়েছিল।

গগ্যাঁ মরে তিন মাসের জেল থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ জরিমানার টাকা আদায়ের চেষ্টা ছাড়ল না। গগ্যাঁর যত ছবি ও ভাস্কর্য ছিল জলের দামে নিলামে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হলো। ফ্রান্সে যখন এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পেঁছিল তখন গগ্যাঁকে ঘিরে একটি রোমান্টিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। য়ুরোপের সর্বত্র তার জীবন ও ছবি সম্বন্ধে অভূতপূর্ব আগ্রহের সৃষ্টি হলো। গগ্যাঁর ছবির দাম হু হু করে বাড়তে লাগল। যাদের কাছে তার ছবি ছিল, সবাই লাভবান হলো। বলা বাহুল্য, সবচেয়ে বেশি লাভবান হলো মেৎ। গগ্যাঁ কিন্তু এসব কিছুই জেনে যেতে পারল না। অনাহারক্লিষ্ট, তাহিটির হাসপাতালে ভিক্ষুক চিহ্নিত গগ্যাঁর দেহ হাজার হাজার

মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের এক ক্ষুদ্র দ্বীপের মাটির সঙ্গে অনাদরে মিশে গেল।

ইংরেজী ভাষায় গগ্যাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী অনেক দিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল না। যে দু' একটি জীবনী লেখা হয়েছিল তা আর ছাপা নেই। Lawrence & Elisabeth Hanson তাঁর নতুন জীবনী লেখেছেন ঃ The Noble Savage, a Life of Paul Gauguin. বইটি বহু তথ্যে পরিপূর্ণ এবং গগ্যাঁর কতকগুলি ছবির প্রতিলিপিতে সমৃদ্ধ। বর্তমানে গগ্যাঁর এইটি একমাত্র সুলিখিত ও সুখপাঠ্য জীবনী।

য়ুরোপের লোকেরা সুযোগ পেলেই আমাদের বিরুদ্ধে ধর্মোন্মাদনার অভিযোগ করে। কিন্তু মধ্যযুগের য়ুরোপে ধর্মের দোহাই দিয়ে নতুন চিন্তাধারা রুদ্ধ করবার জন্য যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে প্রাচ্যে তেমন দৃষ্টান্ত নেই। ভারতের জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট (৪৭৫ খৃীষ্টাব্দে) গ্যালিলিওর সহস্র বৎসর পূর্বে সৌরকেন্দ্রিক মত প্রচার করেছিলেন। তিনিই প্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ ঘুরছে। পূর্বে ধারণা ছিল পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ও অন্য গ্রহগুলি ঘুরে বেড়ায়। ভারতের পণ্ডিতরা আর্যভট্টের এই চমকপ্রদ নতুন আবিষ্কার সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছেন। এই মতকেই গ্যালিলিও যখন আর্যভট্টের আবিষ্কারের প্রায় হাজার বছর পরে প্রচার করেন তখন ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে খৃীষ্টান ধর্ম-আদালতে তাঁর বিচার হয়েছিল এবং জীবনের শেষ ভাগ নানা লাঞ্ছনার মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। গ্যালিলিওর বিচার ও শাস্তি বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

ইতালীর অন্তর্গত পিসায় ১৮ই ফেব্রুআরি, ১৫৬৪ সালে গ্যালিলিওর জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গণিতশাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। তখন স্কুলে ধর্ম ও দর্শন পড়ানো হত; ঐ পাঠ গ্যালিলিওর ভালো লাগত না। নিত্য নতুন খেলনা তৈরি করতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। পড়া শেষ করে গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তিন বছর পরে তিনি যোগ দেন পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম কয়েক বৎসর এত কম বেতন পেতেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছাড়া তাঁকে ছাত্র পড়িয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হত। এত পরিশ্রম করেও তিনি সময় পেলেই বিজ্ঞানচর্চা করতেন।

গ্যালিলিও কতকগুলি ছোটোখাটো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল একটি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আইডিয়া যে গ্যালিলিও প্রথম আবিষ্কার করেছেন তা বলা যায় না। কিন্তু গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে সর্বপ্রথম গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য কার্যকর করতে সফল হন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্যালিলিও বিশ্বের এক নতুন রূপ দেখতে পান। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তিনি সর্বপ্রথম সৌরকলঙ্ক দেখতে পেলেন; চন্দ্রের মধ্যে পর্বত উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হল; বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেল; আর জানা গেল আকাশের ছায়াপথ ঘন সন্নিবিষ্ট তারার সমষ্টি মাত্র। ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করে এই সব পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ১৬১৩ সালে তাঁর Letter on the Solar Spots প্রকাশিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই সব আবিষ্কারগুলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ বদলে দেয়। ১৫৪৩ সালে পোলিশ জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস

সৌরকেন্দ্রিক মত প্রচার করেন। আর্যভট্টের 'সূর্যসিদ্ধান্ত' আরব বণিকদের মারফৎ য়ুরোপে গিয়েছিল; কোপার্নিকাস আর্যভট্টের মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এমন ধারণা করা একেবারে অসংগত নয়। যাই হোক, কোপার্নিকাস তাঁর মতকে যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত করতে পারেননি বলে লোকে এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেনি। সুতরাং শাস্ত্রবিগর্হিত মত পোষণ করা সত্ত্বেও চার্চ কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করেনি তাঁর বিরুদ্ধে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্যালিলিওর আবিষ্কারগুলি কোপার্নিকাসের সৌর-কেন্দ্রিক মতবাদের সমর্থন করল। এই আশ্চর্য যন্ত্র সম্বন্ধে ইতালীর জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হল। গ্যালিলিও এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে সম্বর্ধনা করে কবিরা কাব্য রচনা করতে লাগলেন। পোপের রাজধানী থেকে পোল্যান্ড অনেক দূর। কোপার্নিকাসের মতবাদ পোপের রাজধানীতে কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু গ্যালিলিও তাঁর আবিষ্কারের সাহায্যে সৌরকেন্দ্রিক মত এমন জোরের সঙ্গে প্রচার করতে লাগলেন এবং সাধারণ লোকের সমর্থন তিনি এত বেশি পেতে লাগলেন যে, চার্চের কর্তৃপক্ষ স্থির থাকতে পারলেন না। সৌরকেন্দ্রিক মত শাস্ত্রবর্ণিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত; তা ছাড়া পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলকেন্দ্র—এই বিশ্বাসের পশ্চাতে জগতে মানুষের প্রাধান্যবোধ আত্মগৌরব সৃষ্টি করতে এতকাল যে সাহায্য করেছে তা-ও ত্যাগ করতে হয়। পোপ পঞ্চম পল গ্যালিলিওকে ডেকে আদেশ করলেন, তিনি ভবিষ্যতে সৌরকেন্দ্রিক মত পোষণ করতে পারবেন না, শিক্ষা দিতে পারবেন না এবং বই লিখে বা বক্তৃতা দিয়ে সমর্থন করতে পারবেন না। গ্যালিলিও নিরুপায়; পোপ তখন সর্বশক্তিমান্। ধর্মরক্ষার নাম করে যাকে ইচ্ছা পুড়িয়ে পর্যন্ত মারতে পারেন। সুতরাং গ্যালিলিও পোপের নির্দেশ পালন করতে সম্মত হলেন।

অনেক দিন গ্যালিলিও নতুন কিছু লিখে বা বক্তৃতা দিয়ে পোপের বিরুদ্ধাচরণ করলেন না। সপ্তম আরবান নতুন পোপ নির্বাচিত হলেন। গ্যালিলিও ভাবলেন, এখন সব শান্ত হয়ে গেছে, আর ভয় নেই। ১৬৩২ সালে গ্যালিলিও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই Dialogues Concerning Two Systems প্রকাশ করলেন। বইটি কথোপকথনের আঙ্গিকে রচিত; সালভিয়াতি ও সাগ্রেদো কোপার্নিকাসের সমর্থক; আর এক সরল ব্যক্তি—তার নাম সিমপ্লিসিও—টলেমির বা পৃথিবীর চতুর্দিকে সূর্য ঘোরে এই পুরনো মতের সমর্থক। এই তিন জনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সৌরকেন্দ্রিক মতের ব্যাখ্যাও সমর্থন করা হয়েছে। গ্যালিলিওর শত্রুরা পোপের নিকট রটনা করেছিল যে, এই সিমপ্লিসিও আর কেউ নয়, স্বয়ং পোপকেই গ্যালিলিও ব্যঙ্গ করেছেন।

১৬৩৩ সালে—গ্যালিলিওর বয়স যখন সত্তর—তখন আবার তাঁকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এবার তিনি মুখে সৌরকেন্দ্রিক মত অস্বীকার করেও রেহাই পেলেন না। তাঁকে কিছুদিনের জন্য কারাবাস করতে হল। পরে নিজের বাড়িতে মৃত্যু পর্যন্ত অন্তরীণ অবস্থায় তাঁকে থাকতে হয়। অবস্থার চাপে পড়ে

গ্যালিলিও বিজ্ঞানের তথ্যকে মুখে অস্বীকার করেছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে নিজের আবিষ্কৃত তত্ত্বের উপরে তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। বিচারকের সামনে বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করবার সঙ্গে সঙ্গেই চুপি চুপি তিনি নাকি বলে উঠেছিলেন, 'হায়, আদালতের নির্দেশ অমান্য করেও পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে!' জীবনের শেষ ক'বছর গ্যালিলিও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। নিজেকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দিতেন যে, এখন তিনি দেখতে পান না বটে, কিন্তু জীবনে তিনি যত দেখেছেন, তাঁর দৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত প্রসারিত হয়েছে—পৃথিবীর আর কোনো মানুষের তেমন সুযোগ হয়নি।

গ্যালিলিওর 'ডায়ালগ' বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুগান্তর এনেছে। কিন্তু পোপের আদেশে এ বই নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। বই লিখে গ্যালিলিও তাঁর জীবনে খ্যাতি ও বিপর্যয় দুই-ই লাভ করেছেন। যদিও বিজ্ঞানের বই, তবু 'ডায়ালগের' সাহিত্যিক-মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়; তখনকার দিনে পণ্ডিতরা লাতিন ভাষায় বই লিখতেন। সাধারণ লোকে বুঝত না, কিন্তু পাণ্ডিত্যের কৌলীন্য রক্ষা হত। গ্যালিলিও জনসাধারণের ভাষা ইতালিয়ানে 'ডায়ালগ' লিখলেন। তখনকার দিনে এটা খুবই দুঃসাহসের কথা ছিল বলা যায়। তা ছাড়া বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব এমন সহজভাবে (সে-যুগের তুলনায়) বলবার চেষ্টাও ইতিপূর্বে হয়নি। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের কথা প্রাঞ্জলরূপে বলেছেন। য়ুরোপের সমকালীন ও পরবর্তী লেখকদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী 'ডায়ালগ' গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল।

গ্যালিলিওর জীবন ও বিজ্ঞান-সাধনা সম্বন্ধে একটি নতুন বই বেরিয়েছে। বইটির নাম—The Crime of Galileo; লিখেছেন—George de Santillana। এ-বইটির বৈশিষ্ট্য হল গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং বিচার ও শাস্তির বিস্তৃত বিবরণ। এমন অনেক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে যা পূর্বে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়নি। লেখক ইতালিয়ান; তিনি বিচারের মূল নথিপত্র থেকে অনেক তথ্য উদ্ধার করে দিয়েছেন যা ইংরেজ লেখকের পক্ষে সম্ভব হত না। সত্যকে স্বীকার করতে আমরা যে কত কুণ্ঠিত, এ বইটি সে বিষয়ে নতুন করে সতর্ক করে দেবে।

ফ্রয়েড মানুষকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। আমাদের মনের গভীরে তিনি পেয়েছেন নতুন মহাদেশের সন্ধান। এ আবিষ্কারের মূল্য ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চেয়ে অনেক বেশি ; এই কারণে ফ্রয়েডের জীবনী প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট আগ্রহের বস্তু। ফ্রয়েড যদিও বলেছেন যে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর সাধনার যোগ নেই, তবু একথা সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ মনঃসমীক্ষণের সূত্রগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পূর্বে তিনি নিজের জীবনের ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতেন। তাঁর 'ইন্টারপ্রিটেশান অব ড্রিমস্' এবং 'থিওরি অব সেক্সুয়ালিটি' সম্বন্ধে তিনটি রচনা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। মনঃসমীক্ষার পাঠকের উপযোগী একটি নির্ভরযোগ্য জীবনীর এতদিন অভাব ছিল। আর্নেস্ট জোন্স সেই অভাব পূরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন Sigmund Freud : Life and Work। এই জীবনীর প্রথম খণ্ড The Young Freud (1856-1900) প্রকাশিত হয়েছে। জোন্স মনঃসমীক্ষণে বিশেষজ্ঞ ; দীর্ঘকাল ফ্রয়েড ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মূল চিঠিপত্র থেকে জীবনী রচনায় তিনি সাহায্য পেয়েছেন। এটি শুধুই জীবনী-গ্রন্থ নয়, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি বিশেষ মূল্যবান অধ্যায়। ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য এই প্রথম জানা গেল। লেখক ফ্রয়েডের অন্ধ স্তাবকতা করেননি ; তাঁর চরিত্রের ত্রুটি ও বৈশিষ্ট্যগুলি অসংকোচে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। খুঁটিনাটির অবতারণা করায় পুস্তকের কোন কোন অংশ অবশ্য একটু নীরস হয়ে পড়েছে।

১৮৫৬ সালের ৬ই মে মোরাভিয়ায় এক ইহুদি পরিবারে ফ্রয়েড জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় লন্ডনে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ফ্রয়েডের পিতা জেকব ছিলেন পশম-ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে অনিশ্চয়তায় জন্য ফ্রয়েড-পরিবারে আর্থিক অনিশ্চয়তা লেগেই ছিল। পিতার কাছ থেকে ফ্রয়েড পেয়েছেন স্বাধীন চিন্তা এবং মা'র কাছ থেকে পেয়েছেন গভীর অনুভূতির ক্ষমতা। তাঁর জন্মের পরে দেখা গেল খুব সূক্ষ্ম চামড়ার আবরণ দিয়ে মাথাটি ঢাকা। ইহুদিদের মধ্যে এটা শুভ লক্ষণ বলে সংস্কার ছিল। ভবিষ্যতে এ রকম শিশুরা নাকি খ্যাতি লাভ করে। অনেকেই তাঁর মাকে এসে বলত, তোমার ছেলে পরিবারের নাম উজ্জ্বল করবে। যখন ফ্রয়েডের বয়স বছর এগারো তখন একদিন চায়ের দোকানে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে ভবিষ্যদ্বাণী করল তিনি মন্ত্রী হবেন ; এই ভবিষ্যদ্বাণী বালকের চিত্ত স্পর্শ করেছিল। তাই পরবর্তী জীবনে মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। নানা লোকের মুখে ভবিষ্যদ্বাণী শুনে মা'র মন গর্বে ভরে উঠত, তাঁর অন্য সন্তানদের

বঞ্চিত করে ফ্রয়েডকে বেশি ভালোবাসতেন। ফ্রয়েড বলেছেন, যে শিশু মা'র হৃদয়ে অবিসংবাদী প্রাধান্য লাভ করতে পারে, সারা জীবন তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও বিজয়ী মনোভাব জাগ্রত থাকে এবং এর ফলে শিশু বড় হয়ে সংসারে জয়ী হতে পারে।

ফ্রয়েডের মতে তিন বছর বয়সেই মানুষের চরিত্রের মূল ভিত্তিটা স্থির হয়ে যায়। তিনি নিজের জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছেন যে, ঐ সময়কার দু' একটি অস্পষ্ট ঘটনা ছাড়া আর কিছুই মনে নেই। একবার কৌতূহলের (যৌন?) বশবর্তী হয়ে দু'বছর বয়সে পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে বকুনি খেয়েছিলেন; ঐ বয়সে রাত্রিতে প্রায়ই তিনি বিছানা ভিজিয়ে দিতেন বলে বাবার কাছে বকুনি খেতে হতো। দু' বছর বয়সেই একবার তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তুমি ভেবো না, বাবা; আমি তোমাকে একটা নতুন লাল বিছানা কিনে দেব। মা'র কাছ থেকে কখনো বকুনি খাননি। তাই পরবর্তী জীবনে ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পিতা সংসারের কঠোরতা ও শাসনের প্রতীক এবং মা জীবনের সকল মাধুর্যের প্রতীক।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ফ্রয়েড শীঘ্রই মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত হলেন। বাড়িতে বাবা পড়াতেন, তার ফলে পড়ায় এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছিল। তিনি আবার বোনদের পড়ায় সাহায্য করতেন। পনেরো বৎসর বয়স্ক বোন অ্যানাকে উপদেশ দিতেন, বালজাক ও ডুমা পড়বার বয়স এখনো তোমার হয়নি! ফ্রয়েড পাঠ্য-পুস্তকের বহির্ভূত অসংখ্য বই পড়তেন এবং তাঁর পড়ার বিষয় নির্দিষ্ট ছিল না। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য সব কিছুই ছিল তাঁর প্রিয়। ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ করে সেক্সপীয়র, তাঁর খুব ভালো লাগত। বিদ্যালয় ত্যাগ করে তিনি দশ বৎসর শুধু ইংরেজী বই পড়েছিলেন।

সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করে ফ্রয়েড ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করলেন। ডাক্তারী পাশ করবার পর চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য তা সম্ভব হলো না। গবেষণা ছেড়ে চাকরি নিতে হলো হাস-পাতাল ও ক্লিনিকে। এ পথেও উন্নতির সম্ভাবনা চোখে পড়ে না। ফ্রয়েড সর্বদাই হতাশাক্লিষ্ট হয়ে থাকতেন। মার্থা নামক একটি তরুণীর প্রেমে পড়ায় অর্থাভাবের বেদনাটা আরো তীব্র হয়ে দেখা দিল। উপযুক্ত অর্থোপার্জন না করা পর্যন্ত মার্থাকে বিয়ে করতে পারবেন না। দীর্ঘকাল তাঁরা অপেক্ষা করলেন। এই সময়টা ফ্রয়েডের জীবন প্রেম ও দারিদ্র্যের দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। মার্থাকে যে সব চিঠি লিখেছেন ফ্রয়েড, তাদের মধ্যে তিনি কি করে একটি বেশি পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করছেন, কত কষ্টে একটি পয়সা সঞ্চয় করছেন, তার বিবরণ পাওয়া যায়। মার্থার প্রতি আকর্ষণের ফলে তাঁর জীবনের পথও পরিবর্তিত হয়েছে। হাসপাতালে কাজ করবার সময় ফ্রয়েডের আকাঙ্ক্ষা ছিল চিকিৎসা-জগতে নতুন কিছু আবিষ্কার করবার। সে উদ্দেশ্যে তিনি কোকেন নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। অস্ত্রোপচারের জন্য এবং বিশেষ করে চক্ষুর চিকিৎসায়; পেটের পীড়ায় ও দুর্বলতায় কোকেন যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে ফ্রয়েড নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। তিনি কোকেনের এত ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন

যে, প্রতিদিন কোকেন খেতে আরম্ভ করেন। কোকেনের উপর গবেষণার ফলাফল যখন অর্ধেক লেখা হয়েছে তখন একদিন তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল মার্থার সঙ্গে দু'বছর দেখা হয়নি। অর্ধসমাপ্ত লেখা ফেলে তিনি চললেন মার্থার কাছে। যাবার আগে কোকেনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে দু'জন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন; বন্ধুরা তাঁর সূত্র ধরে কোকেন সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করে খ্যাতিলাভ করেছে। এ গৌরব যদি ফ্রয়েড পেতেন তা হলে তিনি কখনো মনঃসমীক্ষার পথে আসতেন কিনা সন্দেহ।

দীর্ঘকাল অপেক্ষা করবার পর ফ্রয়েড মার্থাকে বিয়ে করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা তখনো বিশেষ ভালো হয়নি। কিন্তু আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না বলে দারিদ্র্যের জীবন বরণ করবার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হলেন। বিয়ের পূর্বে এক চিঠিতে মার্থার রূপ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ফ্রয়েড যে কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:

Don't forget that 'beauty' stays only a few years, and that we have to spend a long life together. Once the smoothness and freshness of youth is gone then the only beauty lies where goodness and understanding transfigure the features, and that is where you excel.

হয়তো মার্থার প্রতি গভীর প্রেমেই ফ্রয়েডকে প্রথম মনঃসমীক্ষণের পথে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ মার্থার চিঠি পেলেই ফ্রয়েড প্রত্যেকটি শব্দ গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তেন, শব্দের পশ্চাদ্‌বর্তী মার্থার মন বুঝতে চাইতেন। চিঠি পড়লেই ফ্রয়েড বুঝতে পারতেন মার্থা কিছু গোপন করেছে অথবা সবকিছু খোলাখুলি লিখেছে। ফ্রয়েডের অনুমান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য হতো। মার্থা ধরা পড়ে কতবার আশ্চর্য হয়ে গেছে।

চাকরি ছেড়ে ফ্রয়েড স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। কিন্তু রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করবেন কি; নিজের উপরে তাঁর আস্থা ছিল না। তাঁর কেবলই মনে হতো এ পথে সাফল্য অর্জন করবার প্রতিভা তাঁর নেই। চিকিৎসায় রোগীর কোন উপকার না হলে তিনি প্রায়ই ফীসের টাকা ফিরিয়ে দিতেন। পশার জমছে না, তবু মার্থাকে বিয়ে করে ঘরে আনলেন। নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে তাঁদের বহু বৎসর কাটাতে হয়েছে। স্ত্রীকে সাপমুখো সোনার বালা দেবার আকাঙ্ক্ষা ফ্রয়েড মনে মনে পোষণ করেছেন দীর্ঘকাল, কিন্তু তা পূরণ করতে পারেননি কোনদিন। এই দুঃখের সংসারে ফ্রয়েডের প্রধান আনন্দ ছিল তাঁর ছেলে-মেয়ের সাহচর্য। তিনি তাঁর সন্তানদের শুধু ভালোবাসতেন না, মাত্রাহীন আদরও দিতেন অনেক সময়। এই আদরের জন্যই তাঁর জ্যেষ্ঠ মেয়ের জীবন রক্ষা পেয়েছিল। মেয়ের বয়স তখন পাঁচ ছ' বছর, ডিপথেরিয়ায় শয্যাশায়ী, বাঁচবার আশা নেই। ফ্রয়েড

প্রায় পাগল হয়ে গেছেন দুশ্চিন্তায়, জিজ্ঞাসা করলেন কি খেতে ইচ্ছা করে। মেয়ে কণ্টে জানালো, একটা স্ট্রবেরি খেতে ইচ্ছা করে। স্ট্রবেরির সময় নয় তখন; তবু সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করে ফ্রয়েড স্ট্রবেরি সংগ্রহ করে আনলেন। রোগীর গলা প্রায় বুজে এসেছে। লোভের বশে তাড়াতাড়ি স্ট্রবেরি খেতে যাওয়ায় প্রবল কাশি উঠে গলার শ্লেষ্মা বেরিয়ে গেল। অনেক ওষুধ খেয়েও যে ফল হয়নি, একটি স্ট্রবেরি তা করল। ধীরে ধীরে বালিকা ভালো হয়ে উঠল।

ফ্রয়েড ক্রমশঃ প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে মানসিক রোগগ্রস্তদের জন্য হাসপাতাল ইত্যাদিতে কাজ আরম্ভ করলেন। এই কাজই তাঁর ভালো লাগল এবং শিগ্‌গীরই তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন।

গ্যেটে বলেছেন, যিনি প্রতিভাবান তিনি নিশ্চয়ই সত্যের পূজারী হবেন। প্রতিভা ও সততা পার্থক্য করা যায় না; এই মাপকাঠিতে ফ্রয়েড প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী। তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নিজের জীবনের একান্ত গোপনীয় কত কাহিনী, কত নিষিদ্ধ চিন্তা অসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন। নিজের মা, বাবা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা সম্বন্ধে যেসব নিষিদ্ধ চিন্তা নিদ্রায় অথবা জাগরণে দেখা দিয়েছে তাদের সকলের সামনে প্রকাশ করবার মধ্যে দুর্জয় সাহস ও সত্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মনের অন্ধকার গহ্বরে কালো চিন্তাগুলি যতদিন লুকিয়ে থাকে ততদিন আমরা নিশ্চিন্ত, সম্মানহানির ভয় নেই। ফ্রয়েড যখন নিজের ভাবনাগুলি বিশ্লেষণ করে প্রথম প্রকাশ করলেন তখন এর জন্য যে কত বড় সাহসের প্রয়োজন ছিল আজ তাঁরই সাধনার ফলে সেকথা আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি না।

বার্নার্ড শ' (১)

একটি লোক সম্বন্ধে এত কৌতূহল আর কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে সে লোকটি যখন নারী নয়, পুরুষ—তখন বিস্ময় আরো বৃদ্ধি পায়। আমরা বার্নার্ড শ'র কথা বলছি। তাঁর চুরানব্বই বছরের সুদীর্ঘ জীবন রহস্যে মণ্ডিত। সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে তিনি যে-সব চমকপ্রদ উক্তি করেছেন তার ফলেই আমাদের মনে বার্নার্ড শ' সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে। যিনি এরূপ উক্তি করেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কি রকম ছিল তা জানবার জন্য আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। শ'র জীবন নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু কৌতূহল এখনো তৃপ্ত হয়নি।

শ' দম্পতির চল্লিশ বছরের অন্তরঙ্গ সঙ্গী St. John Ervine লিখিত Bernard Shaw, his life, work and friends-এ প্রচুর নতুন তথ্য পাওয়া যাবে। এ-বইটি ধারাবাহিক জীবনী নয়; বহু লোকের সঙ্গে শ'র সংস্পর্শের বিবরণ থেকে তাঁর জীবন জানা যায়। লেখার গুণে ছয় শ' পৃষ্ঠার বইটি সানন্দে পড়া যেতে পারে।

ডাবলিন শহরে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বার্নার্ড শ' জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ২রা নভেম্বর, ১৯৫০। শ'র জন্মের কয়েক বছর পূর্বে আয়র্ল্যান্ডে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষের ফলে কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। তাঁর বাবার আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। প্রায় আটত্রিশ বছর বয়সে শ'র বাবা বিয়ে করেছিলেন একুশ বছরের তরুণী লুসিন্ডা এলিজাবেথকে। এই দাম্পত্য-জীবন সুখের হয়নি। এলিজাবেথের হৃদয়ে আবেগ বা উত্তাপ কিছুই ছিল না। স্বামীকে এলিজাবেথ একটুও ভালোবাসতে পারেননি। এই জন্যই সন্তানদের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। বাড়ির চাকরদের উপর ছেলেমেয়ের ভার ছিল। পরবর্তী জীবনে শ' তাঁর মা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: 'She was the worst mother conceivable.' এ-রকম অসুখী দম্পতির ছেলে কি করে এত বড় প্রতিভাবান লেখক হলেন তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। বাবা প্রচুর মদ খেতেন; মা'র জীবনে এটা ছিল বড় দুঃখের কারণ। বার্নার্ড শ' ছেলেবেলাতেই মদের উপর গভীর ঘৃণা পোষণ করতেন। বড় হয়ে ডাক্তারের উপদেশ সত্ত্বেও তিনি এক ফোঁটা মদ মুখে দিতে চাননি।

এগারো বছর বয়সে শ'কে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ছাত্র হিসাবে তাঁর স্থান ছিল সকলের নীচে। শিক্ষকরা তাঁকে নিরেট মূর্খ বলে মনে করতেন; তাঁর পক্ষে লেখাপড়া শেখা অসম্ভব, এই ছিল শিক্ষকদের ধারণা। অন্য ছেলেদের শ'র সংস্পর্শে পড়া নষ্ট হবে, এটাও ছিল তাঁদের আশঙ্কা। পারিবারিক অবস্থার জন্য শ' বেশি দিন পড়তে পারেননি। বয়স যখন বছর পনেরো তখন তিনি এক জমিদার সেরেস্তায়

চাকরি শুরু করেন। এক বছরের মধ্যে নিজের কর্মদক্ষতার গুণে তিনি ক্যাশিয়ারের দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হন।

এলিজাবেথ ইতিমধ্যে স্বামীকে ত্যাগ করে লন্ডন চলে এসেছেন। তিনি গান শিখিয়ে যা উপার্জন করতেন তাতেই কোনো রকমে দিন চলে যেত। বড় মেয়ে লুসিও গানের চর্চা করত। শ' কিছুদিন পরে মা'র কাছে চলে এলেন। লন্ডনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সুযোগ পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন। বিশেষ করে ব্রিটিশ মিউজিয়াম তাঁকে আকর্ষণ করত। ১৮৭৯ সালে শ' তাঁর প্রথম উপন্যাস Immaturity সমাপ্ত করেন। কিন্তু কোনো প্রকাশকই এ-বই ছাপতে রাজী হল না। তাতে শ' হতাশ হননি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সাহিত্য-সাধনায় একদিন তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। অবশ্য এর জন্য সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন। লন্ডনে আসবার পর নয় দশ বছর যাবৎ তিনি কোনো বাঁধাধরা চাকরি না করে মা ও বোনের উপার্জনের উপর বসে খেয়েছেন বলে তাঁকে কম লাঞ্ছনা সইতে হয়নি। অল্প কিছুদিন তিনি টেলিফোন কোম্পানিতে কাজ করেছিলেন। বেকার থাকলেও শ' আলস্যে সময় নষ্ট করেননি। প্রতিদিন রুটিন বেঁধে পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখে শ' একে একে পাঁচখানা উপন্যাস লিখলেন। কিন্তু একটি উপন্যাসেরও যখন প্রকাশক পাওয়া গেল না, তখন তিনি সঙ্গীত ও নাটক সমালোচনা আরম্ভ করলেন নগদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায়।

শ'র নির্দিষ্ট কোনো আয় না থাকায় বাড়িতে সম্মান ছিল না, তাঁর নিজের মনেও শান্তি ছিল না। পরিবারের বন্ধু-বান্ধবদের তিনি এড়িয়ে চলতেন। নতুন বন্ধু-বান্ধব খুঁজে তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে তাঁর ভালো লাগত। বন্ধুর অভাব তাঁর কখনো হয়নি। শ'র চেহারা এবং বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথন অনেককেই আকৃষ্ট করত; বিশেষ করে মেয়েদের। শ' এমন ভাব দেখাতেন যে তিনি স্নেহ-প্রেম ইত্যাদি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আসলে বাহ্যিক উদাসীনতার অন্তরালে তিনি একটু ভালোবাসার জন্য বুভুক্ষু ছিলেন। পরিবারে স্নেহ-পরিবেশ না থাকায় যুবক বার্নার্ড শ'র এই গোপন বুভুক্ষা বেশ তীব্র ছিল।

মা'র কাছে গান শিখতে আসত অ্যালিস লকেট। সুন্দরী তরুণী। হাসপাতালে নার্সের কাজ করত। শ' অত্যন্ত গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন এর প্রতি। এই তাঁর প্রথম প্রেম। লকেটের প্রভাবে কিছুদিন তিনি বিচারশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন। মিস লকেটকে উদ্দেশ করে কবিতা লিখলেন; যে-সব চিঠি লিখেছেন লকেটকে তার মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষুরধার যুক্তি অনুপস্থিত; অনভিজ্ঞ প্রেমিকের অসংলগ্নতা পরিস্ফুট। বছর-খানেকের মধ্যেই শ'র এই মোহ কেটে গিয়েছিল। মিস লকেটের অনাগ্রহই তার কারণ। ১৮৮২ সালের নিকটবর্তী সময়ে দীর্ঘকাল মেয়েদের পেছনে ঘোরাঘুরি করে ভালোবাসার কথাটি বলবার রীতি ছিল। কিন্তু বার্নার্ড শ'র উদ্দাম স্বভাব; অত অপেক্ষা করে রীতি মেনে আত্মপ্রকাশ করা তাঁর সয় না। পরিচয় হবার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মনের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে মিস লকেটকে হকচকিয়ে দিলেন।

তা ছাড়া শ'র কথা বলবার ভঙ্গি এমন যে সকলের পক্ষে বোঝা কঠিন যে তিনি আন্তরিকভাবে কথা বলছেন, না এটা শুধুই ঢং। সবচেয়ে বড় কথা, শ'র নির্দিষ্ট কোন আয় ছিল না, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত; সুতরাং স্বামী হিসাবে মেয়েদের কাছে তাঁর মর্যাদা ছিল না। এ-সব কারণে শুরুতেই শ'র প্রথম প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু এর প্রভাব তাঁর মন থেকে দূরে হতে অনেক সময় লেগেছিল। তাঁর উপন্যাস An Unsocial Socialist-এর হেনরিয়েটা মিস লকেটের ছায়া।

ফেবিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর শ' প্রায় প্রথম থেকে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। সোসাইটিতে লন্ডনের বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচিত হবার সুযোগ হয়। শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত তাঁদের মধ্যে একজন। শ' সোসাইটির জন্য বিনা পারিশ্রমিকে অনেক কাজ করে দিতেন। অথচ তখন তাঁর টাকা না হলে চলে না। বেশান্ত নিজে অনেক দুঃখ পেয়েছেন বলে শ'র অবস্থাটা উপলব্ধি করলেন। পাছে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় তাঁর কাগজে শ'র উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বের করবেন বলে টাকা অগ্রিম দিতে লাগলেন। শ' বেশান্তের এই ছল ধরতে পারা মাত্র টাকা নিতে অস্বীকার করলেন।

অ্যানির সঙ্গে শ'র ঘনিষ্ঠতা অনেকদিন যাবৎ অক্ষুণ্ণ ছিল। অ্যানি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। অত্যন্ত ভাবপ্রবণ মেয়ে, যখন যা খেয়াল হত তা-ই করতেন। এমনি এক ঝোঁকের মাথায় এক গোবেচারা পাদ্রিকে বিয়ে করলেন। বিয়ের রাত্রিতেই স্বামীর ব্যবহারে তাঁর সকল স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হবার পর বিবাহ বিচ্ছেদ হল। স্বামী ছেলেকে রাখলেন, মেয়েকে নিয়ে চলে এলেন শ্রীমতী বেশান্ত। শ্রমিক নেতা চার্লস ব্র্যাডল-র সঙ্গে পরিচয় হল। সমাজ-কল্যাণের নানা কাজে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমেরিকার এক ডাক্তার 'ফ্রুটস অব ফিলসফি' নামে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। আমেরিকায় সে-বইটি নিষিদ্ধ হয়। ইংলন্ডে বইটি ছাপা হয়ে বিক্রি হচ্ছিল। এক প্রকাশক বিক্রি বাড়াবার উদ্দেশ্যে বইয়ের মধ্যে কয়েকটি ছবি সংযোজন করায় যত বিপদ ঘটল। বইটি বাজেয়াপ্ত হল। বেশান্ত ও ব্র্যাডল' বইটি ছাপালেন। কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হল। তাঁরা মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু তাঁদের দু'জনকে নিয়ে জঘন্য কুৎসা প্রচার হতে লাগল। বেশান্তের স্বামী আদালতে আবেদন করলেন যে, এমন দুশ্চরিত্রা নারীর হেফাজতে মেয়েকে রাখলে তার ক্ষতি হবে। আদালতের রায় অনুযায়ী মেয়েকে বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে হল। পেয়াদারা যে-দিন মেয়েকে নিতে এল, সে-দিন মেয়ে প্রবল জ্বরে ভুগছে। মায়ের বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে গেল; মেয়ের হৃদয়বিদারক কান্না, মা'কে ছেড়ে যাবার প্রতিবাদে হাত পা ছোঁড়া—কিছুই আইনের নির্দেশকে ঠেকাতে পারল না। মেয়েকে স্বামীর বাড়িতে দেখতে যাবার অধিকারও আর তাঁর নেই। স্বামী খোরপোষ বাবদ যে ভাতা দিতেন, দুশ্চরিত্রতার

অজুহাতে এবার থেকে তাও বন্ধ করে দেওয়া হল।

বেশান্তের নাম যখন সমগ্র ইংলন্ডে কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছে তখন বার্নার্ড শ'র সঙ্গে হল তাঁর পরিচয়। নিঃসন্দেহে শ'র প্রতি তিনি আসক্ত হয়েছিলেন। এমন কথাও শোনা যায় যে, তাঁদের মধ্যে 'ফ্রী-ম্যারেজের' এক চুক্তিপত্রের খসড়াও তিনি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু অমন সাহসী, সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিবাদী বার্নার্ড শ'ও 'বন্ধনহীন বিবাহের' প্রস্তাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এর পর থেকে শ্রীমতী বেশান্তের সঙ্গে একা দেখা করতে তিনি ভরসা পেতেন না। শ' তাঁর 'ইউ নেভার ক্যান টেল' নাটকের ক্ল্যান্ডনের মধ্যে বেশান্তকে রূপায়িত করেছেন।

বার্নার্ড শ' লিখে কিছু কিছু টাকা যখন নিয়মিতভাবে উপার্জন করতে শুরু করলেন তখন থেকে একে একে অনেক মেয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। প্রথমই নাম করতে হয় শ্রীমতী জেনী প্যাটারসনের। জেনি বিধবা, শ'র চেয়ে বয়সে প্রায় বছর পনেরোর বড়। শ'র মা'র কাছে গান শিখতে আসত, সেই সূত্রে আলাপ। জেনি নাছোড়বান্দা হয়ে শ'র পেছনে লাগল। শ'র মার্জিত রুচির সঙ্গে কোনো মিল ছিল না জেনির। পর পর অনেক মেয়ে এসেছে তাঁর জীবনে। সত্তর বছর বয়সেও মেয়েরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। বার্নার্ড শ'ও মেয়েদের প্রতি কখনো উদাসীন ছিলেন না। সকল প্রকার অভিজ্ঞতার মধ্যেই আছে জীবনের পূর্ণতা, এ-কথা তিনি বিশ্বাস করতেন।

বার্নার্ড শ' যে-সব মেয়েদের সঙ্গে মিশেছেন তাদের মধ্যে অনেককে তাঁর খুব ভালো লেগেছে। হয়ত তাদের কয়েকজনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্টও হয়েছিলেন। কিন্তু মুখ ফুটে প্রতিদান দাবি করতে তিনি পারতেন না। এই স্বভাবের জন্যই কবি উইলিয়াম মরিসের সুন্দরী সংস্কৃতিবতী কন্যা মে মরিসকে হারালেন। দু'জনেই পরস্পরকে ভালোবাসতেন, অথচ বার্নার্ড শ' কিছু না বলায় মে-র অন্যত্র বিয়ে হল। বিয়ের পরে শ' এমন ভেঙে পড়লেন যে সে ও তার স্বামী শ'কে তাদের বাড়ি নিয়ে কিছুদিন পরিচর্যা করেছিল।

এবার যাঁর সঙ্গে পরিচয় হল তিনি আলাদা জাতের মেয়ে। তিনি সম্পদ-শালিনী, কিন্তু সুন্দরী নন। মেয়েলিপনা নেই তাঁর, অথচ মানবতাবোধ রয়েছে পুরোমাত্রায়। নিজের ইচ্ছাকে কথায় ও কাজে জাহির করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর। ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে শ' অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পায়ের পাতার উপরে দু'বার অস্ত্রোপচারের ফলে ক্রাচ নিয়ে ঘরের মধ্যে একটু চলাফেরা করতেন। আঠারো মাস তাঁকে এমনি করে ক্রাচের উপর নির্ভর করে চলতে হয়েছে। শার্লট তখন য়ুরোপে বেড়াতে গেছেন। চিঠি পেয়ে ছুটে এলেন। এমন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি চলাফেরার শক্তি হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন দেখে শার্লট মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সিদ্ধান্ত স্থির করলেন। বললেন, একা একা এখানে থাকতে পারবে না, চলো আমার বাড়ি। কিন্তু এতে শার্লটের নামে অপবাদ রটবে আশঙ্কায় শ' রাজী হলেন না। একমাত্র উপায় দু'জনের

বিয়ে। তাই হল। পাত্রীর বয়স একচল্লিশ, পাত্রের বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

এমনি অকস্মাৎ শ'র বিয়ে না হলে কখনো আদৌ তাঁর বিয়ে হত কিনা সন্দেহ। বিয়ের কথা পূর্বেও দু'জনের মনে হয়েছে। বার্নার্ড শ' পিছিয়ে থাকতেন এই কারণে যে, লোকে বলবে টাকার জন্য শার্লটকে বিয়ে করেছে। তা ছাড়া শার্লটের একটি অদ্ভূত শর্ত ছিল। বিয়ের পরও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হবে না, এই ছিল তাঁর শর্ত। শ' এই শর্ত স্বীকার করেই তাঁকে বিয়ে করলেন। অথচ এই শর্ত ছিল তাঁর মতের বিরুদ্ধে। টেনিসন বলতেন, 'পুরুষ শিকারী, মেয়েরা শিকার'। শ' একেবারে উলটো কথা বলেছেন। তাঁর মতে পুরুষরাই মেয়েদের শিকার। সৃষ্টি বাঁচিয়ে রাখবার উগ্র তাড়না রয়েছে মেয়েদের রক্তে। তাদের চোখে সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার যন্ত্রমাত্র পুরুষ। নানা ছলাকলার সাহায্যে পুরুষকে তারা আকৃষ্ট করে প্রকৃতির নির্দেশে। মেয়েদের কাছে পুরুষের এর বেশি প্রয়োজন নেই। প্রাণিজগতের দৃষ্টান্ত থেকে এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। যৌন-মিলনের অব্যবহিত পরেই স্ত্রী মাকড়সা পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে; পুরুষ মৌমাছি যৌনমিলনের পরেই মরে যায়, তাতে স্ত্রী মৌমাছির গান থামে না। শ'র এই মতবাদ ব্যর্থ করে দিয়ে শার্লট ধরলেন উলটো পথ। তিনি কখনো শ'র সন্তানের জননী হবেন না এই শপথের ভিত্তিতে তাঁদের মিলন। এই অস্বাভাবিক দাম্পত্য-জীবন কিন্তু প্রেমময় ছিল। বন্ধুবান্ধব তাঁদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এই গভীর ভালোবাসা দেখে বিস্মিত হয়ে যেতেন। তবু শ'র জীবনের খানিকটা স্থান যে শূন্য ছিল সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। এই শূন্যতার তাড়নায় কখনো কখনো তিনি অন্য মেয়ের সংস্পর্শ লাভ করতে চেয়েছেন।

বিয়ের পর যে-মেয়ের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তিনি শ্রীমতী প্যাট্রিক ক্যাম্পবেল। তিনি ছিলেন অভিনেত্রী। শ'র নাটকের অভিনয় সম্পর্কে তাঁদের আলাপের শুরু হয়। ধীরে ধীরে শ' তাঁর প্রতি এরূপ গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়লেন যে ক্যাম্পবেলকে পাবার জন্য যুক্তিহীন রোমান্টিক আচরণ করতে লাগলেন। শ্রীমতী ক্যাম্পবেল শ'র সঙ্গে ফ্লার্ট করতেন, কিন্তু সত্যকার আকর্ষণ অনুভব করতেন না। তিনি বলতেন, 'আমার হৃদয়ের ক্ষীণ শিখাটি তোমার মতো অহমিকাসম্পন্ন প্রতিভার সংস্পর্শে এসে চিরদিনের জন্য নিভে যাবে, আমি তা হতে দেব না।' শ্রীমতী ক্যাম্পবেল সুস্পষ্টরূপে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। সেই অপমানের জ্বালা শ'-র যে কত তীব্র হয়ে লেগেছিল তা শ্রীমতী ক্যাম্পবেলকে লেখা কয়েকটি চিঠি থেকে জানা যায়। প্রথম চিঠিতে লিখেছেন: Very well, go. The loss of a woman is not the end of the world. The sun shines: it is pleasant to swim: it is good to work: my soul can stand alone. But I am deeply, deeply, deeply wounded.

ভাগ্যের এমনিই পরিহাস যে, পরবর্তী জীবনে শ্রীমতী ক্যাম্পবেলকে অর্থ-সাহায্যের জন্য বার্নার্ড শ'র কাছে বার বার হাত পাততে হয়েছে। শ' তাঁকে যে-সব চিঠি

লিখেছিলেন সেই সব একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্র কাগজে ছাপিয়ে কিছু টাকা উপার্জনের জন্য ক্যাম্পবেল এমনই ব্যস্ত হয়েছিলেন যে, তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা দায় হয়েছিল। 'দি অ্যাপ্‌ল কার্টের' ওরিন্থিয়ার মধ্যে আমরা এঁকে দেখতে পাই।

উইলিয়াম আর্চারের পরামর্শে ও উৎসাহে শ' নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। একে একে কয়েকটি নাটক লেখার পরও কোনো থিয়েটারই তা অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করল না। তখন তিনি নাটক যাতে পাঠকরা পড়েও উপভোগ করতে পারে সে-জন্য পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন ছাড়া দৃশ্যের বর্ণনা, ঘটনার ভূমিকা, পাত্র-পাত্রীর বর্ণনা সংযোজন করে নাটকগুলি ছাপতে শুরু করলেন। আধুনিক নাটকের এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রথম প্রবর্তক শ'। শ' নিজেই তাঁর নাটকের প্রকাশক। নিজের টাকায় বই ছেপে তিনি একজন প্রকাশককে এজেন্সি দিয়েছিলেন। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি সব বিষয় তিনি স্থির করতেন।

১৯২৫ সালে শ' নোবেল পুরস্কার পান। পুরস্কারের টাকা তিনি গ্রহণ করেননি। ঐ টাকায় অ্যাংলো-সুইডিস লিটারারি ফাউন্ডেশান স্থাপিত করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য সুইডিস সাহিত্যের ভালো ভালো বই ইংরেজীতে অনুবাদ করা। নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পরে শ' প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের আবেদন পেয়েছিলেন।

শ'র মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ভারতের মন্ত্রিসভার কার্য স্থগিত রাখা হয়। আর কোনো দেশ তাঁর স্মৃতির প্রতি এতটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে বলে জানা নেই। 'ডেইলি এক্সপ্রেস' শ'র মৃত্যুর অনেক আগেই এইচ. জি. ওয়েলসকে দিয়ে শোক-সংবাদ লিখিয়ে রেখেছিলেন। এমনই মজা যে, ওয়েলসই শ'র আগে মারা গেলেন। শ'র মৃত্যুর পরে ওয়েলসের পুরনো লেখাটাই 'ডেলি এক্সপ্রেসে' ছাপানো হল। ওয়েলস সারা জীবন শ'কে যে কত ঈর্ষা করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই শোক-সংবাদের রচনায়। শ' ওয়েলসের স্ত্রীর অসুখের সময় যথেষ্ট মনোযোগ দেননি বলে পর্যন্ত অভিযোগ ছিল।

আলোচ্য গ্রন্থটি শ'-অনুরাগীদের এমন অনেক তথ্য পরিবেশন করতে পারবে যা অন্যত্র পাওয়া যায় না।

বার্নার্ড শ' (২)

বার্নার্ড শ' পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন তাঁর জীবিতকালেই। তাঁর সম্বন্ধে এই আগ্রহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন অনেক লেখক। বার্নার্ড শ'র জীবনী এবং তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিয়ে অনেক লেখক আলোচনা করেছেন। সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রেও বার্নার্ড শ' সম্বন্ধে কম আলোচনা হয়নি। শ'-এর উপর লেখা নানা জাতের অসংখ্য বইয়ের মধ্যেও Archibald Henderson রচিত 'George Bernard Shaw : Man of the Century' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা বার্নার্ড শ'কে ঘনিষ্ঠরূপে জানতে চান এই বই তাঁদের পড়তে হবে।

আর্চিবল্ড হেন্ডারসন ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছেনে। বৈজ্ঞানিক হলেও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ। ১৯০৩ সালে তিনি একদিন You Never Can Tell-এর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলেন। বার্নার্ড শ'র নাম তখনো অপরিচিত। কিন্তু তখনই হেন্ডারসন নাট্যকারের বিরাট প্রতিভা উপলব্ধি করলেন। শ'র জীবন সম্বন্ধে তখন থেকেই তাঁর আগ্রহ জন্মে। শ'র জীবনী সংক্রান্ত সকল তথ্য তিনি সংগ্রহ করতে শুরু করেন। পরে বার্নার্ড শ'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার ফলে তথ্য-সঙ্কলনের কোনো অসুবিধা রইল না। ১৯৩২ সালে হেন্ডারসনের বই Bernard Shaw : Playboy and Prophet প্রকাশিত হয়। George Bernard Shaw : His Life and Work হেন্ডারসনের আর একখানি বই। শ' নিজে এ-দু'টি বইয়ের জন্য তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং প্রকাশের পূর্বে পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। শ' বলতেন, হেন্ডারসনই তাঁর একমাত্র 'অথরাইজড' জীবনীকার। হেন্ডারসন এত খুঁটিনাটি বিষয় সঙ্কলন করেছেন যে, কেউ কেউ তাঁকে এ-যুগের 'বসওয়েল' বলেছেন।

শ'র জন্ম-শতবার্ষিকী (১৮৫৬-১৯৫৬) উপলক্ষে হেন্ডারসন আলোচ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনীটি রচনা করেছেন। পূর্বোক্ত বই দু'টির বিষয়বস্তু এ-বইয়ের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি এ-বইয়ে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে। বিশেষ করে শ'র জীবনের শেষের ক'বছরের ঘটনা—যা হেন্ডারসন পূর্বে লেখেননি। বহু চিত্রশোভিত প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট আকারের এই বই বার্নার্ড শ' সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য কোষ-গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে। রচনার গুণে এই বিরাট বইটি স্বচ্ছন্দে পড়ে শেষ করা যায়। শ'র বহু কৌতুকজনক উক্তি এবং জীবনের ঘটনা উল্লেখ করায় পাঠক ক্লান্তি বোধ করবার সুযোগ পান না।

শ' প্রায়ই সকলের কাছে বলতেন, আমি আধুনিক নাট্যকারদের নাটক দেখি না। কিম্বা আধুনিক লেখকদের বইও পড়ি না। কিন্তু তাঁর অনেক নির্দোষ ভাঁওতার মতো এটিও একটি ছলনা। হেন্ডারসন অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, শ' সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী বহু লেখকের রচনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন এবং তাঁদের রচনা দ্বারা তাঁর নিজের রচনাও প্রভাবান্বিত হয়েছে। যে ক'জন লেখকের রচনার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল তাঁদের মধ্যে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের নাম হেন্ডারসন বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন।

শ' নিজের সম্বন্ধে বলতেন যে, তিনি হলেন 'The Jester at the Court of King Demos.' কিন্তু তাঁর কৌতুক ও পরিহাসের অন্তরালে থাকত কোনো গভীর সত্য। তাঁর কৌতুক যে শুধু মুখোমুখি কথা বলবার সময় প্রকাশ পেত তা নয়। তিনি রহস্যপূর্ণ অসংখ্য চিঠি লিখেছেন। বার্নার্ড শ' জীবনে দশ লক্ষেরও অধিক চিঠি লিখেছেন পরিচিত ও অপরিচিত লোকের কাছে। এটা ছিল তাঁর নিজের হিসাব।

শ' বলতেন, নোবেল পুরস্কার খ্যাতিমানদের দেওয়া হয়; খ্যাতি আর প্রতিভা সমার্থক নয়। সুতরাং নোবেল পুরস্কার দিয়ে প্রতিভার সম্মান করা হয় না। নোবেল পুরস্কার লটারীর মতো; যারা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খ্যাতিলাভ করেছেন শুধু তাঁরাই এই লটারীতে অংশ গ্রহণ করবার অধিকারী। ১৯২৫ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেবার পর তিনি বলেন যে, 'ঐ বছর আমি কোনো বই প্রকাশ করিনি; আমার বই বের না হওয়ায় পৃথিবী যে স্বস্তি লাভ করেছে, সে জন্যই আমাকে ঐ বছরের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।' শ' পুরস্কারের টাকা নিজে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, তাঁর পাঠক ও দর্শকরা যে অর্থ তাঁকে দেয় তাই যথেষ্ট; আর খ্যাতি এত লাভ করেছেন যে, ইতিমধ্যেই তা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। সুতরাং অতিরিক্ত অর্থ ও খ্যাতির বাসনা তাঁর নেই। নোবেল পুরস্কারের টাকা দিয়ে শ'র অভিপ্রায় অনুসারে অ্যাংলো-সুইডিস লিটারারি ফাউন্ডেশান স্থাপিত হয়। সুইডিস সাহিত্যের ক্লাসিকগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। নাট্যকার স্ট্রীন্ডবার্গের প্রতিভার উপর শ'র গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাই স্ট্রীন্ডবার্গের নাটকের অনুবাদ দিয়ে সমিতির কাজ শুরু হয়েছে।

একবার একটি মেয়েদের ক্লাব শ'র কাছে 'দি ইনটেলিজেন্ট ওম্যানস্ গাইড'-এর এক কপি উপহার চেয়ে অনুরোধ জানায়। সেই চিঠির উত্তরে শ' লিখলেন, 'যে-মহিলা সমিতি সাড়ে বারো শিলিং দিয়ে আমার একখানা বই কিনতে পারে না সেই সমিতির বেঁচে থাকবার অধিকার নেই।' কিছুদিন পরে সমিতির কাছ থেকে চিঠি এল: 'আপনার হাতে লেখা মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। ঐ মন্তব্যের বিনিময়ে আমরা দোকান থেকে এক কপি বই পেয়েছি।'

শ' উত্তর দিলেন, 'মেয়েরা কি নির্বোধ! আমার ঐটুকু হাতের লেখা দিয়ে পঞ্চাশ পাউন্ড পাওয়া যেত।'

এক ভদ্রমহিলা তাঁর সন্তানদের আনন্দোচ্ছল খেলা-ধুলোর প্রতি শ'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'যৌবন কী আশ্চর্য সময় !' বার্নার্ড শ' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'আর সেই যৌবনকে সন্তানধারণের জন্য ধ্বংস করা কী পাপ !'

নিউইয়র্কে শ'র একটি নাটক খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হবার পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে 'কেবল' এল। তিনি উত্তর পাঠালেন, 'আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন কেন? আমি তো লেখার সময়ই এমনভাবে লিখেছি যাতে সাফল্য নিশ্চয় হবে।'

সুযোগ পেলেই শ' সাংবাদিকদের আক্রমণ করতেন। দ্বিনবতিতম জন্মদিনের কয়েকদিন পূর্বে শ' একটি সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাঠ করলেন। তিনি সম্পাদককে জানালেন, 'আপনার সংবাদ একটু আগে বেরিয়ে গেছে; আমি এখনো মরিনি, আধ-মরা হয়েছি। প্রতিবাদ প্রকাশ করুন।' অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন, 'Journalism is the only profession in the world in which inaccuracy does not matter.'

তখনো শ' খুব খ্যাতি লাভ করেননি। তাঁর প্রকাশক হিসাব দাখিল করেছে। সেই হিসাবে লেখক অতিরিক্ত প্রুফ দাবি করায় এবং প্রুফে রচনার পরিবর্তন করবার জন্য দশ পাউন্ড বেশি ব্যয় ধরা হয়েছে। শ' এই হিসাব দেখে প্রকাশকের নিকট তাঁর পাওনার বিবরণ দিয়ে এক বিল পাঠালেন। তাতে লেখকের প্রুফ দেখা, টাইপ, কাগজ ও বাঁধাই নির্বাচন, টাইটেল-পেজের ডিজাইন করে দেওয়া এবং বই সম্বন্ধে প্রকাশকের সঙ্গে আলোচনা করা ইত্যাদির দফাওয়ারি চার্জ দেখানো হল। অতিরিক্ত প্রুফ সংশোধন করবার জন্যও বেশি টাকা দাবি করেছেন। কারণ ভুল ছাপা নিয়ে বই বের হলে প্রকাশকের সুনাম ক্ষুণ্ণ হত। দশ পাউন্ডের উত্তরে তিনি দু'শ একাশি পাউন্ডের বিল দাখিল করলেন। প্রকাশকের তো চক্ষুস্থির !

শ' টাকা-পয়সার ব্যাপারে খুব হিসাবী ছিলেন। কেউ যেন তাঁকে না ঠকাতে পারে সে-দিকে তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। এর ফলে তিনি এত টাকা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। একমাত্র নাটকের অভিনয় থেকে আমেরিকা তাঁকে বার্ষিক প্রায় চার লক্ষ টাকা পাঠাত। একবার শ' সাঁতার কাটতে গিয়ে স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে মরতে বসেছিলেন, রক্ষা পাবার পরে তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে, আসন্ন-মৃত্যুর ছায়ায় কোন্ কথা তাঁর সবচেয়ে বেশি করে মনে হয়েছিল? তখন তাঁর উত্তরে শ' বললেন যে, বিদেশী অনুবাদকদের সঙ্গে রয়ালটি সম্পর্কিত চুক্তিপত্রের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয়নি—এই কথাই তাঁর মনে পড়েছিল।

শ' বলেছেন, 'I have lived and worked without flesh, fish, fowl, tea, coffee, tobacco or spirits…' মদকে তিনি মনে করতেন 'the chloroform which enables the poor man to endure the painfull operation of living.'

মদ্যপান নিবারণের জন্য থিয়েটার, খেলাধুলা, বই, রেডিও, সুখী পারিবারিক জীবন ইত্যাদি আবশ্যক। মাতালদের জেলে নিয়ে খিদের সময় অন্য কোনো খাদ্য না দিয়ে শুধু মদের পাত্র এগিয়ে দিলে তাদের প্রকৃত শাস্তি হবে। শ' বলেছেন, 'The truth about the drink question is that in our dishonourable commercial civilization it is impossible for a sober man to be happy. In an honourable civilisation it would be impossible for a drunken man to be happy.'

উনত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত শ' বহু মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাঁর ঐ সময়ের প্রেমের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এ-কথা মনে করা যেতে পারে যে, 'the road of excess lead to the palace of wisdom'—ব্লেকের এই নীতি শ' অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলছিলেন। বিয়ের পরে তাঁর যৌনজীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সন্তান সম্বন্ধে তাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনেই কেমন একটা আশঙ্কার ভাব বর্তমান ছিল। শ' এক জায়গায় বলেছেন যে, আমি মেয়ে হলে কখনই হাজার পঞ্চাশেক টাকা না পেয়ে সন্তানের জন্ম দিতাম না। তিনি বলতেন, শিশু যখন সমাজের একজন নাগরিক, তখন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সমাজেরই গ্রহণ করা উচিত। ব্যক্তি কেন সেই দায়িত্ব একা বহন করবে? একটি বোর্ড থাকবে; সেই বোর্ড মাঝে মাঝে বিচার করে দেখবে কোন্ মানুষের বেঁচে থাকা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, কোন্ মানুষের নয়।

শ' আরো বলেছেন যে, মেয়েদের জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান থাকে না বলেই তারা ঠকে। শিক্ষিতা মেয়েরা নাটক, নভেল ও কবিতা খুব পড়ে, কিন্তু জীবনের যে-জ্ঞান তাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সে-জ্ঞান তারা লাভ করে না। প্রত্যেক পিতার উচিত তরুণী কন্যার হাতে 'লেডি চ্যাটার্লি'র লাভার' তুলে দেওয়া। তা হলে সত্যিকার শিক্ষা তারা লাভ করবে।

বোদ্‌লেয়ার

১৮৫৭ সালে ফরাসী সাহিত্যের দুটি যুগান্তকারী রচনা আত্মপ্রকাশ করে। একটি উপন্যাস, আর একটি কাব্যগ্রন্থ। একটি ফ্লোবেয়ার-এর 'মাদাম বোভারি'; দ্বিতীয়টি বোদ্‌লেয়ার-এর 'Les Fleurs du Mal বা পাপের ফুল।' তদানীন্তন ফরাসী সরকার এই দুজন লেখকের বিরুদ্ধেই অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন। প্রভাবশালী বন্ধু-বান্ধবের হস্তক্ষেপের ফলে ফ্লোবেয়ার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন সহজেই এবং 'মাদাম বোভারির' জনপ্রিয়তা তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই হয়েছে। বোদ্‌লেয়ারের ভাগ্য ছিল বিরূপ। 'পাপের ফুল' প্রকাশের জন্য লেখক ও প্রকাশক দু'জনেরই জরিমানা হল। ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি কবিতা বিচারক নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। বোদ্‌লেয়ার মৃত্যুর পূর্বে জেনে যেতে পারেননি যে, ভবিষ্যতে বিশ্বের কাব্য-সাহিত্যে 'পাপের ফুল' কত বড় স্থান লাভ করবে। সরকার ও সমালোচকের হাতে তাঁর কাব্যকে লাঞ্ছিত হতে দেখে গিয়েছেন বোদ্‌লেয়ার। অবশ্য তাঁর কয়েকজন অনুগত ভক্ত ছিল। কিন্তু তাদের ভালো লাগা প্রতিষ্ঠাপন্ন সমালোচক ও সাহিত্যপত্রের সজোর সমর্থন লাভ করতে পারেনি বলে ফরাসী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি।

শুধু যে বোদ্‌লেয়ারের কাব্যসাধনা দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিল তাই নয়; তাঁর জীবনের নানা ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা করেও তাঁর উপর অবিচার করা হয়েছে। Enid Starkie লিখিত Baudelaire পড়ে অনেক ভুল ধারণা দূর হবে। ইংরেজীতে বোদ্‌লেয়ার সম্বন্ধে বইয়ের সংখ্যা বেশি নয়। বোদ্‌লেয়ারের এরূপ বিস্তৃত তথ্য-সমৃদ্ধ জীবনী ইংরেজীতে আর নেই।

বোদ্‌লেয়ারের মা ক্যারোলাইনের জন্ম হয়েছিল ইংলণ্ডে। তাঁর মাতামহ ছিলেন ষোড়শ লুইর সেনা-বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনি সস্ত্রীক পালিয়ে যান ইংলণ্ডে। ক্যারোলাইন জন্মের কিছুদিন পরেই মা-বাবা দু'জনকেই হারালেন। অনাথ বালিকা আশ্রয় পেল পরিবারের পুরনো এক বন্ধুর বাড়ি। ধীরে ধীরে ক্যারোলাইন যৌবনে পদার্পণ করলেন। তাঁকে বিয়ে করবার জন্য কোনো যুবক এগিয়ে এল না। আশ্রয়দাতার বন্ধু ফ্রাঁসোয়া বোদ্‌লেয়ার হঠাৎ একদিন তাঁর পাণি প্রার্থনা করে বসলেন। মৃতদার, বৃদ্ধ, তবু সম্মতি দিলেন ক্যারোলাইন। পরের বাড়িতে এমনি করে গলগ্রহ হয়ে থাকতে আর ভাল লাগে না। তা ছাড়া ভবিষ্যতে উজ্জ্বলতর সম্ভাবনারও কোনো আশা নেই। ১৮১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁদের যখন বিয়ে হল তখন পাত্রের বয়স উনষাট, পাত্রীর বয়স ছাব্বিশ।

ক্যারোলাইনের একমাত্র সন্তান শার্ল বোদ্‌লেয়ার ১৮২১ সালের ৯ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে। ছেলেকে পেয়ে ক্যারোলাইন বেঁচে গেলেন। বৃদ্ধ স্বামীর ক্ষমতা ছিল না তরুণীর উদ্বেল ভালোবাসাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার। হৃদয়ের নিরুদ্ধ ভালোবাসা আশ্রয় করল ছেলেকে। ছেলেকে ভালোবাসার মধ্যে যেন উপলব্ধি করলেন প্রথম প্রেমের শিহরণ। আর সে ভালোবাসায় ছিল সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। অন্য কেউ ছেলেকে ধরতে পারবে না। শুধু মা আর ছেলের পরস্পরের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ। ছেলেও মাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারত না। মা'র প্রতি এই গভীর আকর্ষণ বোদ্‌লেয়ার বড় হয়েও সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বোদ্‌লেয়ারের চরিতকারদের অনেকে এর মধ্যে ঈডিপাস কমপ্লেক্সের আভাস পেয়েছেন।

বোদ্‌লেয়ারের জন্মের কয়েক বছর পরে পিতার মৃত্যু হল। আয়ের কোনো পথ না থাকায় ক্যারোলাইন সস্তা ভাড়ার একটা ছোট বাড়িতে এলেন। এখানে আসবার পর ক্যাপ্টেন ওপিক নামে এক ভদ্রলোকের ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হল। পৌরুষে প্রজ্বল চেহারা; তখনো যৌবন অতিক্রান্ত হয়নি; দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকরিতে অধিষ্ঠিত। ক্যারোলাইনের বুভুক্ষু যৌবন এই ভদ্রলোকের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেল। হৃদয়ের আশ্রয়, আর সংসারিক আশ্রয়—দুই-ই। বোদ্‌লেয়ারের বয়স যখন সাড়ে সাত, তখন ক্যারোলাইন ক্যাপ্টেন ওপিককে বিয়ে করলেন।

বোদ্‌লেয়ার প্রথম থেকেই ভদ্রলোককে সন্দেহের চোখে দেখেছে। মা'র উপরে ছিল তার একচ্ছত্র অধিকার; দেখল, সেই অধিকার হঠাৎ একদিন চলে গেল। ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে হেরে গেল। দুর্জয় অভিমান এবং নিরুপায় ক্ষোভে বালকের জীবন কালো হয়ে উঠল। বিপিতা বোদ্‌লেয়ারের যথার্থ মঙ্গলকামী ছিলেন। মার আদরে ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখে তাকে পাঠিয়ে দিলেন একটি ভালো স্কুল বোর্ডিং-এ। মা'র ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে এসে পড়ল বোর্ডিং জীবনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে। বঞ্চনার ক্ষোভ ঐ বয়সেই বোদ্‌লেয়ারকে জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ করে তুলল। কখনো কখনো অকারণেই গভীর বিষাদে সে ডুবে যেত। এই বিষাদের স্পর্শে তার মন অল্প বয়সেই পরিপক্বতা লাভ করল। পাঠ্য বই পড়তে ভালো লাগত না। ফরাসী ও ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কাব্য ছিল তার প্রিয়। স্কুলে সাহিত্য-পত্রের সবগুলি পরীক্ষার পুরস্কার বোদ্‌লেয়ার ছাড়া অন্য কেউ পেত না। কিন্তু বঞ্চনার ক্ষোভ ও বিষাদ তার মেজাজ বিগড়ে দিল। হেডমাস্টার প্রায়ই তার আচরণ সম্বন্ধে অভিযোগ পাঠাতে লাগলেন। একবার বোদ্‌লেয়ারের অপরাধ এত বেশি হল যে, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে আর রাখতে সম্মত হলেন না। অন্য এক বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিতে হল বোদ্‌লেয়ারকে।

পরীক্ষায় পাশ করবার পর মা-বাবা উপদেশ দিলেন সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করবার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে। কিন্তু বোদ্‌লেয়ার সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল চাকরি করবার ইচ্ছা তার একটুও নেই। সাহিত্য-চর্চা তার

জীবনের লক্ষ্য। মা দুঃখ পেলেন, অনেক বোঝালেন। কিন্তু বোদ্‌লেয়ার সঙ্কল্পে অটল। হুগো, ভিনি, মুসে, স‍্যাঁৎ-বুভ্ প্রভৃতির খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বোদ্‌লেয়ারের তরুণ চিত্তে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। সাহিত্য ছাড়া ছবি আঁকার ঝোঁকও আছে তার। দ্যলাক্রোয়ার ছবি তার মনের উপর মোহ বিস্তার করেছে। পরবর্তী জীবনে কতকগুলি ছবি এঁকেছিল বোদ্‌লেয়ার। শিল্প ও সাহিত্যের পথই সে বেছে নিল।

ওপিক ভাবলেন, আঠারো বছরের নবযুবককে জোর করতে গেলে হয়তো উল্টো ফলই হবে। চাকরিতে ঢোকবার বয়স এখনো যায়নি। কিছুদিন জীবনের পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াক, তারপরে অভিজ্ঞতা লাভ করে সঠিক পথ বেছে নেবে। উপদেশ দিয়ে লাভ নেই।

১৮৩৯ সালে বোদ্‌লেয়ার বাড়ি থেকে প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারের একটা বোর্ডিং হাউসে এসে উঠল। এই অঞ্চলটায় তখন ছিল ছাত্রদের বসবাস। এটা ছিল তাদের রাজ্য। বিচিত্র তাদের জীবনযাত্রা। নাচ, গান, হুল্লোড় সব সময় লেগেই থাকত। মদের গ্লাশ হাতে নিয়ে ঈশ্বর ও ধর্ম ধুলোর মত উড়িয়ে দিতে চাইত সারারাত তর্ক করে। অবৈধ প্রেমের গল্প করে বড়াই করতে সবাই ভালোবাসত। উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রতিভা সমার্থক,—এমনি একটা বিশ্বাস ছিল তাদের। ঊনবিংশ শতাব্দীর ডিকাডেন্ট জীবনের লালন-ভূমি এই লাতিন কোয়ার্টার। বোদ্‌লেয়ার অল্প দিনের মধ্যেই বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরিভাবে আয়ত্ত করল। অন্যের মতো সে-ও একজন নর্মসহচরী বেছে নিয়েছে; আর তার ফলে সিফিলিস তাকে ধরল যৌবনের প্রারম্ভেই। এই রোগের হাত থেকে জীবনে সে কখনো মুক্তি পায়নি।

একদিন লাতিন কোয়ার্টারের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বোদ্‌লেয়ার বাড়ি এল। মা তাদের কথাবার্তা শুনে চালচলন দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বুঝতে দেরি হল না তাঁর ছেলে ডুবতে বসেছে। স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে স্থির করলেন কিছু দিনের জন্য বোদ্‌লেয়ারকে প্যারিসের বাইরে অনেক দূরে কোথাও পাঠাতে হবে। তাহলে হয়ত এই সংসর্গ থেকে রক্ষা পেতে পারে। ওপিকের এক বন্ধু জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে কলকাতা যাচ্ছে। স্থির হল ঐ জাহাজে বোদ্‌লেয়ারকে কলকাতা পাঠানো হবে; সেখানে কয়েক মাস সে থাকবে। বোদ্‌লেয়ার প্রথমে অনেক আপত্তি করে শেষে কি ভেবে ভারতভ্রমণে রাজী হল। ১৮৪১ সালের জুন মাসে কুড়ি বৎসর বয়সে বোদ্‌লেয়ার ভারত যাত্রা করল।

জাহাজ এসে মরিশাস দ্বীপে থেমেছে। কিছু মেরামতির কাজ সারতে তিন সপ্তাহ লাগল। জাহাজ ছাড়বার সময় বোদ্‌লেয়ার বলল, সে ভারতে যাবে না; ক্যাপ্টেনের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করে ঐ দ্বীপেই থেকে গেল। কিছু দিন পরে অন্য এক জাহাজে ফিরে এল প্যারিস।

পর বৎসর একুশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বোদ্‌লেয়ার বাবার উইল অনুসারে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকার মালিক হল। স্বাধীনভাবে বাস করবে বলে সে এসে উঠল

এক হোটেলে। দামী আসবাবপত্র কিনে ঘর সাজাল। নগদ টাকা হাতে পেয়ে মন বেশ খুশি। বন্ধু-বান্ধব জুটতে দেরি হল না। শিল্প ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গে চলত আড্ডা। আলাপচারী হিসাবে বোদ্‌লেয়ার শীগগিরই খ্যাতি লাভ করল। বোদ্‌লেয়ারের কথাবার্তায় রুচিবোধের অভাব থাকলেও তার ক্ষমতা ছিল শ্রোতাদের চমকে দেবার। সে সময় এটাই ছিল আলাপচারীর প্রধান গুণ। হয়ত কোনো একটা বিশেষ সময়ের কথা উঠল ; বোদ্‌লেয়ার ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্য বলল, 'হ্যাঁ, যে বছর আমি বাবাকে খুন করেছিলাম।' কোনো বৈঠকে চীজ দিয়ে রুটি খেতে খেতে হয়ত বলল, 'আজকের চীজটায় শিশুর মাথার ঘিলুর স্বাদ পাচ্ছি।' প্রেমের নানা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতেও ভালোবাসত। একবার কাফেতে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে। দেখল পাশের টেবিলে বসে এক ভদ্রমহিলা নিবিষ্ট চিত্তে তার গল্প শুনছেন। হঠাৎ মহিলাকে উদ্দেশ করে বোদ্‌লেয়ার বলল, 'আপনার এমন সুন্দর দেহে আমার দাঁত বসিয়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। যদি অনুমতি করেন তাহলে কি ভাবে আপনাকে প্রেম নিবেদন করব সে কথাটা বলি। দু' হাত শক্ত করে বেঁধে আমার ঘরের সীলিং-এর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখব আপনাকে। আমি নতজানু হয়ে আপনার পুজা করব, আর তুষারশুভ্র আপনার পা দুটি চুমায় চুমায় ঢেকে দেব।'

ভদ্রমহিলা কাঁপতে কাঁপতে উঠে পালিয়ে গেলেন।

অবক্ষয় দলের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এ ধরনের আচরণ ছিল তাদের জীবনের বাহ্যিক ঢং। একে সত্য মনে করে বোদ্‌লেয়ারকে দীর্ঘকাল ভুল বোঝা হয়েছে।

জান দুভালও বোদ্‌লেয়ারের দুর্নামের একটি বড় কারণ। প্যারিসের থিয়েটারে জান ঝি-র পার্ট করত। জান দেখতে ছিল কালো। বোদ্‌লেয়ারের চরিতকাররা তাকে নিগ্রো বলে উল্লেখ করেছে। আসলে এত কালো সে ছিল না। বোধ হয় তার মা ছিল নিগ্রো মেয়ে, বাবা ফরাসী। জানের দেহে ছিল যৌবনের আশ্চর্য সুষম বিকাশ। যেন কালো আগুনের শিখা। বোদ্‌লেয়ারের কবি-মন যৌবনের অপরূপ মূর্তিমতী ছন্দ দেখে মুগ্ধ হল। জানের শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ ছিল না ; তবু তার স্পর্শে বোদ্‌লেয়ারের দেহ যেমন করে জেগে উঠত এমন আর কোনো মেয়ের স্পর্শে হয়নি। এক অনির্বচনীয় আকর্ষণে সে বাঁধা পড়ল। জানকে নিয়ে ঘর বাঁধল। বিয়ে হয়নি ; তবু বোদ্‌লেয়ার জানকে নিজের চরম দুর্দিনের মধ্যেও সাহায্য করেছে। প্রায়ই দুর্ব্যবহার করে জান চলে গেছে ; কিন্তু বোদ্‌লেয়ার টাকা পাঠাতে ভোলেনি। কখনো কখনো তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে জানকে ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে তুলনা করে কবিতা লিখেছে। তথাপি জান যখন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ল, নিজের চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বোদ্‌লেয়ার দ্বিধা করেনি। নিজের মৃত্যু আসন্ন মনে করে সে মা-কে লিখেছিল, তিনি যেন জানকে সাহায্য করেন। শিক্ষা-দীক্ষাহীন এক রক্ষিতার জন্য দীর্ঘ বিশ বছর ধরে এই জাগ্রত কর্তব্যবোধ বোদ্‌লেয়ারের প্রকৃত মানবধর্মের পরিচায়ক।

আড্ডা, মদ, আফিং, ভাঙ্ নিয়ে দিন কাটে। মাঝে মাঝে গুপ্ত রোগের আক্রমণ প্রকট হয়ে পড়ে; তখন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। জান কখনো কাছে থাকে, কখনো ঝগড়া করে চলে যায়। কাছে থাকলেও খিটমিট দূর হয় না। উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ জলের মতো খরচ হয়ে যাচ্ছে। মা বুঝতে পেরে ভয় পেলেন। ছেলের পথে বসতে দেরি নেই। আদালতে আবেদন জানিয়ে ছেলের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করা হল। বোদ্‌লেয়ার এখন থেকে নির্দিষ্ট হারে মাসোহারা পাবে, নিজের খুশি মতো টাকা খরচ করতে পারবে না। স্বাধীনতা হারিয়ে মা'র উপর ক্রুদ্ধ হল বোদ্‌লেয়ার। কিন্তু বেশি দিন রাগ করে থাকতে পারে না। ভাতার টাকা দু'দিনেই শেষ হয়ে যায়; তারপর থেকে কেবল দেনার উপরে নির্ভর।

পাওনাদাররা যখন জোঁকের মতো ঘিরে ধরে তখন মা'র কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায় থাকে না। মা ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ক্রুদ্ধ হন, অভিমান করেন, কাঁদেন; শেষ পর্যন্ত টাকা পাঠাতে হয়। পাঠান স্বামীকে লুকিয়ে। বোদ্‌লেয়ারের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। মা সব সময় ইচ্ছা থাকলেও টাকা পাঠাতে পারেন না। তখন বোদ্‌লেয়ার হতাশায় ডুবে যায়। প্রথম শ্রেণীর হোটেলে সে তার জীবন শুরু করেছিল; এখন নেমে এসেছে বস্তিতে। দামী পোশাক দূর হয়ে গায়ে উঠেছে জীর্ণ মলিন পোশাক। পথে বের হলেই পাওনা-দাররা ফেউয়ের মতো পিছু নেয়। এই দৈন্যের জীবনেও বোদ্‌লেয়ার তার আদর্শকে ভোলেনি। প্যারিসের বড় বড় লাইব্রেরিগুলিতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই নিয়ে কাটিয়েছে; মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারিতে ঘুরে ঘুরে দেখেছে ছবি ও ভাস্কর্য। হতাশা ও বেদনা ভুলবার জন্য পড়া ও লেখার মধ্যে ডুব দিয়েছে। কেননা বোদ্‌লে-য়ারের বিশ্বাস ছিল যে, 'Literature must come before everything else, before my hunger, before my pleasure, before my mother.'

এই সাধনার ফলস্বরূপ শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে বোদ্‌লেয়ারের প্রবন্ধ বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হতে লাগল। কবিতাও লেখে। প্রবীণদের কাছে সে কবিতা কুরুচির জন্য ধিকৃত হয়; তরুণের দল নতুন দিগন্তের আভাস পেয়ে মুগ্ধ হয়। কিন্তু প্রথম রচিত প্রবন্ধগুলির জন্য বোদ্‌লেয়ারের আশ্চর্য মমতা ছিল। রোগের আক্রমণটা বাড়লে মাথাটা কেমন করত; আশঙ্কা হত বুঝি পাগল হয়ে যাবে। তার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভালো। কিন্তু পারেনি তিনটি কারণে। মা, দেনা আর এই বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি রেখে সে মরতে চায়নি। প্রবন্ধগুলির সংকলন বের করবার পর মরতে তার ক্ষোভ ছিল না।

১৮৪৬ সালে এডগার অ্যালেন পো'র রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বোদ্‌লেয়ার বিস্মিত হয়ে গেল। নিজের চিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে আশ্চর্য মিল খুঁজে পেল সে। পো'র রচনা পড়ে "শিল্পের জন্যই শিল্প" এই নীতিতে তার আস্থা দৃঢ় হল। পো'র গ্রন্থাবলী অনুবাদ করতে আরম্ভ করল বোদ্‌লেয়ার। ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত খণ্ডে

খণ্ডে এই অনুবাদ বেরিয়েছে। এমন চমৎকার অনুবাদ করেছিল বোদ্‌লেয়ার যে এখন পর্যন্ত তার চেয়ে ভালো অনুবাদ ফরাসী ভাষায় হয়নি।

বোদ্‌লেয়ারের প্রতিষ্ঠা প্রধানতঃ নির্ভর করে Les Fleurs du Mal অথবা পাপের ফুল-এর উপরে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার এই সঙ্কলনটি ঘোষণা করা হয় ১৮৫০ সালে, কিন্তু বই বের হয় ১৮৫৭ সালে। এই বিলম্বের জন্য বোদ্‌লেয়ারের খুঁতখুঁতে স্বভাবই দায়ী। বারবার শব্দ প্রয়োগে ও ছন্দ যাচাই করে এবং বহুবার প্রুফ সংশোধনের দাবি জানিয়ে বোদ্‌লেয়ার দেরি করে দিয়েছে। বই প্রকাশিত হবার পর রক্ষণশীল প্রবীণদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন উঠল। বোদ্‌লেয়ার যে নরকের কীট সে সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না। কবিতা পড়ে ভিক্টর হুগো লিখলেন: "You indue the heaven of art with a macabre light, you create a new shudder."

বোদ্‌লেয়ার পাপকে বড় করতে চায়নি: পাপের বোঁটায় সুন্দরের ফুল ফোটাতে চেয়েছে। যেমন দেখেছে, ঠিক তেমনি। মাতাল, ভিক্ষুক, বারবনিতা এবং দারিদ্র্যের নোঙরামির মধ্যে সে সুন্দরের সন্ধান করেছে। তার আগে এই সন্ধানের এমন সুন্দর প্রকাশ আর কেউ করতে পারেনি। 'পাপের ফুলের' প্রভাব যে কত সুদূর-প্রসারী হবে সে কথা সেদিন কেউ উপলব্ধি করেননি। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস থেকে দেখা যায় ফরাসী ও য়ুরোপীয় কাব্যে 'পাপের ফুল' নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সুইনবার্ন, আর্নেস্ট ডাউসন, ইয়েটস, পাউন্ড, এলিয়ট প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের বোদ্‌লেয়ারের কাব্য গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

কিন্তু ফরাসী সরকার সেদিন প্রজাদের নৈতিক জীবনের শুচিতা রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। 'পাপের ফুলের' লেখক ও প্রকাশক আদালতে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হল। কিছুদিন আগে ফ্লোবেয়ার অনুরূপ অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বোদ্‌লেয়ারের বিশ্বাস ছিল কোনো প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিকের হস্তক্ষেপের ফলে অভিযোগ হয়ত আদালতে উঠবেই না। স্যঁৎ-বুভ উপদেশ দিলেন যে, বোদ্‌লেয়ার আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলবে যে, পূর্ববর্তী কবিরা জীবনের নোঙরা দিকটা ছাড়া অন্য সব দিক নিয়েই কাব্য রচনা করে ফেলেছেন, সুতরাং বোদ্‌লেয়ারের এই বিষয়ের উপর কবিতা না লিখে উপায় ছিল না। এই বিচিত্র উপদেশ ব্যতীত বোদ্‌লেয়ার কোন সাহায্য পেল না। বিচারে লেখক ও প্রকাশকের জরিমানা হল; আর নিষিদ্ধ হল 'পাপের ফুলের' ছয়টি কবিতা।

এই বিচারের ফলে বোদ্‌লেয়ারের ভবিষ্যৎ আরো কালো হয়ে উঠল। পাওনাদারদের নিষ্ঠুর তাগিদ, জ্ঞানের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক আকর্ষণ, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর জ্বালা—এই সব সে সহ্য করেছে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়। এই শেষ আশাটুকুও বুঝি গেল। ওপিকের মৃত্যু হয়েছে; মা নিজের খরচা চালিয়ে আছেন। বোদ্‌লেয়ারকে আগের মতো টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। বন্ধুদের কেউ কেউ পরামর্শ দিল বেলজিয়াম

যেতে। সেখানে হয়ত কিছু সুবিধা হতে পারে। তা ছাড়া 'পাপের ফুলের' পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ সেখানে বের করা যাবে। ফরাসী আদালতের এক্তিয়ার নেই ওখানে। বোদ্‌লেয়ার বছর দুই কাটাল বেলজিয়ামে। কোন সুবিধা হল না। প্যারিসে ফিরে আসবার দিন ঠিক হয়ে গেছে। হঠাৎ বোদ্‌লেয়ারের অর্ধাঙ্গ অবশ হয়ে গেল। কথাও বন্ধ হয়ে গেছে। ভালো শুশ্রূষার জন্য বোদ্‌লেয়ারকে আনা হয়েছে একটা নার্সিং হোমে। খবর পেয়ে মা এসেছেন। এসে দেখলেন তিনি ছেলেকে যত চিঠি লিখেছিলেন সেগুলি সযত্নে বোদ্‌লেয়ারের শিয়রের কাছে রাখা আছে। এক মুহূর্তে তিনি ছেলের সকল অপরাধ ক্ষমা করলেন। একটু সুস্থ হবার পর বোদ্‌লেয়ারকে প্যারিস নিয়ে আসা হল। যে নার্সিং হোমে বোদ্‌লেয়ার ছিল তার পরিচালনার ভার ছিল খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনীদের উপর। বোদ্‌লেয়ারের অখ্যাতি তাদের কানেও এসে পেঁছেছিল। সে চলে যাবার পর সন্ন্যাসিনীরা নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল শয়তানের প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করতে। পাদ্রি এসে জর্ডন নদীর পবিত্র জল ছিটিয়ে দিল। পাপাত্মার স্পর্শ থেকে মুক্ত হোক এই বাড়ি।

প্যারিস ফিরে এসেও বোদ্‌লেয়ারের অবস্থার কোনো উন্নতি হল না। কথা বলবার শক্তি নেই, বিছানায় উঠে বসবারও ক্ষমতা নেই। তার অনুরক্ত ভক্তরা মিলিত ভাবে সরকারের কাছে আবেদন জানাল কবিকে সাহায্য করবার জন্য। সরকার শুধু একবার পাঁচ শ' ফ্রাঁ সাহায্য অনুমোদন করলেন। ১৮৬৭ সালের ৩১শে আগস্ট মা'র বুকে মাথা রেখে পরম শান্তিতে বোদ্‌লেয়ার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। দুষ্টু ছেলে সারাদিন বিপথে ছুটোছুটি করে সন্ধ্যাবেলা যেন মা'র কোলে একান্ত নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিকটে পরিচারিকা দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে উঠল, 'মা, দেখুন আপনার মুখের দিকে কেমন করে চেয়ে আছে! কথা বলুন, নিশ্চয় শুনতে পাবে। আপনার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে!'

সবাই সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল এক আশ্চর্য প্রশান্ত হাসিতে বোদ্‌লেয়ারের রোগক্লিষ্ট মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বোদ্‌লেয়ারের বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এক অনিবার্য শক্তিতে তার কাব্যের প্রতিটি শব্দ মর্মস্পর্শীরূপে বাঙ্‌ময় হয়ে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। ছড়িয়ে পড়ল ফ্রান্সের বাইরে, য়ুরোপের বাইরে। সময় লেগেছিল। বোদ্‌লেয়ারের মৃত্যুর পর মাত্র হাজার খানেক টাকায় তার রচনাবলী নিলামে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৭ সালে ক্রেতার কপিরাইট শেষ হবার পর থেকে প্রতি বৎসর বোদ্‌লেয়ারের কাব্যগ্রন্থের দেশে ও বিদেশে একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। বোদ্‌লেয়ার কিন্তু তার কাব্যের লাঞ্ছনাটাই শুধু দেখে গেছে।

কীট্‌সের প্রণয়িনী

কবি কীট্‌সের জীবনে ও কাব্যসাধনায় যে মেয়েটি সবচেয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সম্বন্ধে খুব কম কথাই জানবার সুযোগ ছিল। অথচ কবিকে বুঝতে হলে এবং তার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির যথার্থ রসোপলব্ধির জন্য দু'জনের সম্পর্কটা জানা প্রয়োজন। জানবার উপায় ছিল না বলে ভিক্টোরীয় যুগের সমালোচকরা ফ্যানি ব্রনের উপর যথেষ্ট অবিচার করেছে। কীট্‌সের অকাল মৃত্যুর জন্য অন্যান্য কারণের সঙ্গে ফ্যানির হৃদয়হীনতার ইঙ্গিতও করা হতো। কীট্‌সের ইতালী যাবার পর থেকে তার বোনের কাছে ফ্যানি যে চিঠিগুলি লিখেছিল ১৯৩৭ সালে সেগুলি প্রকাশিত হওয়ায় ফ্যানির বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেকটা লঘু হয়ে পড়ে। শ্রীমতী জোয়ানা রিচার্ডসন এই প্রথম ফ্যানি ব্রনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখেছেন। লেখিকা এই গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে ফ্যানি সত্যি কীট্‌সকে ভালোবাসত এবং কবির প্রতি কোনো নিষ্ঠুর ব্যবহারই সে করেনি।

ফ্যানির জন্ম হয় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ৯ই আগস্ট। ১৮১৮ সালের নভেম্বর মাসে হ্যাম্পস্টেডের এক বাড়িতে প্রথম তার কীট্‌সের সঙ্গে পরিচয় হয়। কয়েক দিন দ্বিধা ও সঙ্কোচের পর সে পরিচয় দ্রুত বন্ধুত্বে পরিণত হলো। কীট্‌স শেক্‌সপীয়র, স্পেনসার, মলিয়ের ইত্যাদি পড়ে শোনায়, ফ্যানি তন্ময় হয়ে শোনে। কখনো বা শোনে না, শুধু কীট্‌সের অপূর্ব সুন্দর ভাবদীপ্ত মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। মাস দেড়েক পরেই কীট্‌স ফ্যানির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করল। ফ্যানি সে প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হলো। অথচ সাংসারিক বুদ্ধিতে বিচার করলে ফ্যানির এ বিয়েতে রাজী হওয়া উচিত ছিল না। কীট্‌স বাবাকে হারিয়েছে অল্প বয়সে; স্কুলে থাকতে তার মা মারা গেছে যক্ষ্মায়; ছোট ভাই টম ক্ষয় রোগে ভুগছে; নিজের স্বাস্থ্য ভালো নয়। লাভের ব্যবসা ডাক্তারী ছেড়ে আরম্ভ করেছে কবিতা লিখতে। অথচ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ যে বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করেছে তাতে কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার আশা সুদূরপরাহত। সর্বোপরি, কীট্‌সের টাকা নেই। নিজের খরচই চালাতে পারে না। সত্যি ভালো না বাসলে ফ্যানির মতো সুন্দরী তরুণী এমন ছেলেকে বিয়ে করতে সম্মত হবে কেন?

বাগ্‌দানের কথা দু'একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া আর কেউ জানল না। স্থির হলো, কীট্‌সের উপার্জনের একটা পথ ঠিক হলে বিয়ে হবে। কয়েকদিন বেশ আনন্দে কাটল,—দুজনে মিলে বেড়ানো, গল্প, সাহিত্য আলোচনা। তারপর একদিন কীট্‌সের ক্ষয়রোগ প্রকাশ পেল। ফ্যানিকে বিয়ে করে সুখের নীড় রচনার স্বপ্নে যখন মশগুল

হয়েছিল, তখন এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ কীট্‌সের সকল আশা চূর্ণ করে দিল ; সে হয়ে উঠল দুর্বল, অবুঝ। ফ্যানি রোজ তাকে দেখতে যায়, কিন্তু এটুকুতে কীট্‌স সন্তুষ্ট নয় ; সে যখন রোগশয্যায় শুয়ে, তখন ফ্যানি অন্য কারো সঙ্গে বেড়াবে, নাচবে, হেসে গল্প করবে, এটা কীট্‌স সইতে পারে না ; এমনি সর্বগ্রাসী তার প্রেম। তার রোগজীর্ণ মন নানা অন্যায় সন্দেহ করে ফ্যানিকে অপমানিত করেছে, কিন্তু ফ্যানি কীট্‌সের অবস্থা বুঝে সব মুখ বুঁজে সয়ে গেছে। এই সময় কীট্‌স ফ্যানিকে উদ্দেশ করে যে কবিতা ও চিঠিগুলি লিখেছে তার মধ্যে ব্যর্থ প্রেমের চরম হতাশা ফুটে উঠেছে। হতাশা কীট্‌সকে অনেক সময় নিষ্ঠুর করেছে, সন্দেহ হয়েছে ফ্যানির চরিত্রের উপর। এমন হীন অভিযোগের সুযোগ নিয়েও ফ্যানি দূরে সরে যায়নি।

বাগ্‌দানের পর প্রায় এক বছর দশ মাস পার হয়ে গেল। কীট্‌সের আরোগ্য লাভের আশা দেখা যায় না। শীতের আগেই কীট্‌সকে ইতালী যেতে ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছে। ফ্যানি অনেক অনিশ্চয়তা, অনেক সন্দেহ সয়েছে। কীট্‌স ইতালী যাবার আগে তাদের বিয়েটা হয়ে যাক, এই তার ইচ্ছা। কিন্তু কীট্‌স আপত্তি করল ; এই শরীরে বিয়ের প্রহসন করে লাভ কি? ফ্যানি তখনো নাবালিকা ; বিয়েতে মা'র মত চাই ; মা শেষ পর্যন্ত অমত করলেন। ১৮২০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কীট্‌স ফ্যানির কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে ইতালীর পথে যাত্রা করল।

ইতালী যাত্রার পূর্বে কয়েকদিন ফ্যানিদের বাড়ি কীট্‌স অতিথি হয়েছিল। ফ্যানি একদিন তার যে সেবা ও যত্ন করেছে কীট্‌স তা মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত ভোলেনি। যাত্রার পূর্বে ফ্যানি তার বাক্স গুছিয়ে দিয়েছে, আর কীট্‌সকে দিয়েছিল কয়েকটা ছোট উপহার। কীট্‌সও তার প্রিয় বইগুলি এবং সেভার্নের আঁকা তার নিজের ছবি ফ্যানিকে দিয়ে গেল। বিদেশে গিয়ে কীট্‌সের সর্বদা এই কটি দিনের কথা মনে করে ক্ষোভ হতো। মিথ্যা আশায় অচেনা জায়গায় না এসে ফ্যানির অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ ছিল।

ফ্যানির নাম শুনলে কীট্‌সের এমন উত্তেজনা উপস্থিত হয় যে, দুর্বল দেহ টাল সামলাতে পারে না। তাই সে ইতালী এসে ফ্যানিকে চিঠি লেখে না। লন্ডনে কীট্‌সের বন্ধুরা চিঠি পায়, ফ্যানি তাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। একদিন ফ্যানির চিঠি এলো কীট্‌সের হাতে ; খামের উপরে ফ্যানির হাতের লেখা দেখেই সে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যার জের চলেছিল কয়েক দিন ধরে। কীট্‌স তার বন্ধু সেভার্নকে ডেকে বলল, এ চিঠি আমি পড়তে পারব না ; মৃত্যুর পরে আমার বুকের উপর রেখে কবর দিও। কীট্‌সের এই নির্দেশ পালন করা হয়েছিল। কীট্‌সের কাছে ফ্যানি শেষ চিঠিতে কি লিখেছিল কে জানে? অ-খোলা চিঠির মর্ম চিরদিনের জন্য অজানা থেকে গেল।

কীট্‌সের মৃত্যুসংবাদ ফ্যানি ধীরভাবেই গ্রহণ করল। সে ছিল চাপা স্বভাবের মেয়ে। তাছাড়া তার প্রেম অন্য কেউ বুঝত না। যার সঙ্গে বিয়ে হয়নি, যার মৃত্যু

আসন্ন জানাই ছিল, তার জন্য এত শোক কেন? ফ্যানি তাই কীট্‌সের বোনকে লিখেছিল, অন্য সকলে তোমার দাদার কথা ভুলে যাক, শুধু আমার বেদনাটা বেঁচে থাক। কীট্‌সের মৃত্যুর ছ'বছর পর পর্যন্ত ফ্যানি বিধবার কালো পোশাক পরেছে, চুল ছেঁটেছে ছোট করে। ফ্যানি রূপবতী ছিল, তাকে বিয়ে করবার লোকের অভাব ছিল না। কীট্‌স ফ্যানি সম্বন্ধে বলেছিল: The richness, the bloom, the full form, the enchantment of love after my own heart. পঞ্চাশ বছর বয়সেও ফ্যানি সম্পর্কে এই কথাগুলি প্রযোজ্য ছিল। সুতরাং কীট্‌সের মৃত্যুর পর থেকে অনেক পাণিপ্রার্থীকে যে ঠেকাতে হয়েছে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। কীট্‌সের মৃত্যুর বারো বছর পরে ফ্যানি লুই লিন্ডোকে বিয়ে করে। তা-ও বোধ হয় কীট্‌সের সঙ্গে লিন্ডোর সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিল বলে। বিয়ের পর ফ্যানি স্বামীর সঙ্গে য়ুরোপের বহু জায়গায় ঘুরেছে; কীট্‌সের দেওয়া উপহারগুলি সর্বদা কাছে রেখেছে, তার কাছে লেখা কীট্‌সের চিঠির তাড়া স্বামীর দেখে ফেলবার আশঙ্কা সত্ত্বেও সে কখনো হাতছাড়া করেনি। ফ্যানি যত্ন না করলে ইংরেজী সাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদ্‌গুলি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত। কীট্‌সকে ফ্যানি কখনো ভোলেনি। একদিন কীট্‌স ফ্যানিকে বলেছিল, তোমার যদি ছেলে হয় তা হলে তার নাম 'জন' রেখো না; এ নামটা বড় অপয়া; আমার 'জন' নাম থেকেই তা বুঝতে পারছ! তোমার ছেলের নাম রেখো 'এডমান্ড', বড় ভাল নাম। ফ্যানির একথা মনে ছিল; ছেলের নাম রেখেছিল এডমান্ড (অর্থ = rich protection)।

পরিণত বয়সে ফ্যানি হাম্পস্টেডে ফিরে আসে। এখানেই কীট্‌সের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। একে একে কীট্‌সের বন্ধুরা মারা গেছে। সেভার্ন তখনো ইতালীতে কীট্‌সের সমাধির কাছাকাছি থাকে, আর এখানে আছে ফ্যানি। ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে ফ্যানির মৃত্যু হয়! মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল। ইতালী যাত্রার পূর্বে কীট্‌স সেভার্নের আঁকা তার ছবি ফ্যানিকে উপহার দিয়ে গিয়েছিল। সারা জীবন যত্ন করে রেখে মৃত্যুর পূর্বে ফ্যানি সে ছবি স্বামীর হাত দিয়ে এক বন্ধুর কাছে বিক্রি করতে পাঠাল; সঙ্গে দিল এই চিরকুট: It would not be a light motive that would make me part with it. ফ্যানির জীবনীকার এই কারণের উপর আলোকপাত করতে পারেননি। দারিদ্র্য কি এতদিনের সযত্ন-লালিত প্রেমকে শেষ পর্যন্ত পরাভূত করতে সক্ষম হলো?

মন্তেসরি

পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষিত লোকের নিকট মারিয়া মন্তেসরির নাম পরিচিত। কিন্তু সে পরিচয় শুধু যে অসম্পূর্ণ তা-ই নয়, অনেকাংশে ভুলও। সাধারণত মন্তেসরিকে শিশু-শিক্ষার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য সম্মান দেওয়া হয়। এই নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার তাঁর কৃতিত্বের আংশিক পরিচয় মাত্র। শিশু-মনকে সমগ্রভাবে আবিষ্কার করবার গৌরব তাঁর প্রাপ্য। এর পরের ধাপ হিসাবে এসেছে শিশু-শিক্ষার নতুন পদ্ধতি।

মারিয়া মন্তেসরির ঘনিষ্ঠ সহযোগী E.M. Standing তাঁর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে একটি তথ্যসমৃদ্ধ বই লিখেছেন—'Maria Montessori, Her Life and Work.' লেখক মন্তেসরির সঙ্গে ত্রিশ বছর কাজ করেছেন। সুতরাং তাঁর বিবরণ যে নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মন্তেসরি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ নিজে দেখে দিয়েছেন। এরূপ একটি বইয়ের এতদিন অভাব ছিল। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দু' একটি শিশু আছে এবং তাদের শিক্ষার কথা ভাবতে হয়। শিক্ষাবিদ্ ছাড়া সাধারণ পাঠকও এ-বইটি থেকে শিশু-মন ও শিশুদের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারবেন।

আর জানা যাবে মন্তেসরির জীবনী। মারিয়া মন্তেসরি ১৮৭০ সালের ৩১শে আগস্ট ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বছরই ইতালীর বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে সংযুক্ত রাষ্ট্র স্থাপন করা হয়। মারিয়ার বাবা ছিলেন প্রাচীনপন্থী; নতুন কাজে হাত দিতে গিয়ে বাবার কাছ থেকে প্রায়ই বাধা পেয়েছেন। মা কিন্তু বরাবর সাহায্য করেছেন মেয়েকে। মফঃস্বলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে বারো বছর বয়সে মারিয়া রোম নগরীতে এলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। কয়েক বছর পরে ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবেন, তা স্থির করা প্রয়োজন হল। মা-বাবার ইচ্ছা মারিয়া শিক্ষয়িত্রী হবেন। কিন্তু মারিয়া প্রবল আপত্তি জানালেন। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস মারিয়া সেদিন নিজেকে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কল্পনাও করতে পারলেন না। গণিতশাস্ত্রে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি বললেন, ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বেন। মেয়েদের পক্ষে তখন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু সকল বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে ছেলেদের টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন। কয়েকদিন পড়ে ইঞ্জিনীয়ারিং তাঁর ভালো লাগল না। জীববিদ্যা পড়বার আগ্রহ হল। কিন্তু বেশি দিন রইল না এই আগ্রহ। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করলেন।

মেয়েদের পক্ষে ডাক্তারী পড়া তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। অন্য কোনো মেয়ে তখনো ডাক্তারী পড়তে আসেনি। শিক্ষাবিভাগের কর্তারা মারিয়াকে জানিয়ে দিলেন তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা সম্ভব নয়। বাড়িতে বাবা ডাক্তারী পড়ার ঘোর বিরোধী। তথাপি সকল বাধা অতিক্রম করে মারিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে সক্ষম হলেন। ইতালীতে তিনিই চিকিৎসাবিদ্যার প্রথম ছাত্রী।

কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে ছেলেরা তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে লাগল। সব তিনি চুপ করে সহ্য করেননি; অনেক সময় তাঁকে ছেলেদের বিরুদ্ধে একাই দাঁড়াতে হয়েছে। তাঁর সবচেয়ে অসুবিধা হত শব ব্যবচ্ছেদে। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁকে ব্যবচ্ছেদ করতে দেওয়া হত না। কারণ তখন একে অত্যন্ত নীতিবিগর্হিত কাজ বলে মনে করা হত। সকলের কাজ হয়ে যাবার পর মারিয়া একা একা শব ব্যবচ্ছেদ করতেন। সাধারণতঃ রাত্রিতেই তাঁর কাজ করবার সুযোগ আসত। গলিত শবের সারির মধ্যে রাত্রিবেলা কাজ করতে করতে একদিন হঠাৎ ডাক্তারী পড়বার সকল উৎসাহ তাঁর দূর হয়ে গেল। তিনি ব্যবচ্ছেদাগার থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। ডাক্তারী পড়া এই শেষ। দ্রুতপায়ে বাড়ি ফিরছেন; পার্কের পাশে এক ভিখারিণী তাঁকে থামিয়ে ভিক্ষা চাইল। মারিয়া চেয়ে দেখলেন ভিখারিণীর ছোট ছেলেটি পথের উপর বসে এক টুকরো রঙ্গীন কাগজ নিয়ে খেলা করছে। ছেলেটির মুখের গভীর আনন্দের ছাপ দেখে তাঁর মনে আকস্মিক ভাবান্তর ঘটল। এক তুচ্ছ খেলনা নিয়ে ছেলেটি যদি মত্ত হয়ে থাকতে পারে তাহলে তিনি শব ব্যবচ্ছেদ কেন করতে পারবেন না? তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যবচ্ছেদাগারে আবার ফিরে গেলেন। ১৮৯৬ সালে মারিয়া ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতালীর তিনিই প্রথম মহিলা ডাক্তার। এর ফলে সহজেই তিনি ইতালীর নারীসমাজে নেতৃত্বের আসন লাভ করেন। ১৮৯৬ সালে ইতালীর নারীদের প্রতিনিধি হয়ে বার্লিনের মহিলা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন; ১৯০০ সালে তিনি প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছিলেন লন্ডন সম্মেলনে।

ডাক্তারী পাশ করবার পর মারিয়া রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকের সহকারী নিযুক্ত হন। কাজ উপলক্ষে তাঁকে উন্মাদ আশ্রমগুলিতে গিয়ে পাগলদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হত। তখন জড়বুদ্ধি হাবা ছেলেদেরও রাখা হত পাগলদের সঙ্গে। এই সব ছেলেরা পাগলা গারদে কয়েদীর মতো বন্দীদশা যাপন করত। কোনো অপরাধ নেই, শুধু বুদ্ধি কম এই জন্য এদের এরূপ দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে দেখে মারিয়া খুব ব্যথিত হলেন। তাঁর চেষ্টায় গভর্নমেন্ট স্বল্পবুদ্ধি ছেলেদের জন্য একটা স্কুল করলেন; পরিচালনার ভার পড়ল মারিয়ার উপর। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর অল্পবুদ্ধি ছেলেরা লেখা-পড়ায় আশ্চর্য উন্নতি করল। যারা এদের সম্বন্ধে সকল আশা ত্যাগ করেছিল তারা এদের রূপান্তর দেখে বিস্মিত হয়ে গেল।

এর পরে রোমের বস্তি অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের একটি বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য আহ্বান এল। মারিয়া এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। বস্তির ষাটটি দুরন্ত ছেলে নিয়ে

স্কুল আরম্ভ হল। প্রথম তো স্কুলে ছাত্ররা আসতেই চায় না। অনেক করে যখন তাদের আনা হল তখন তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই চোখ অশ্রুসিক্ত। এখানেই শিশুর মন নিয়ে মারিয়ার প্রথম পরীক্ষা শুরু হয়।

'Montessori discovered that children possess different and higher qualities than those we usually attribute to them. It was as if a higher form of personality had been liberated, and a new child had come into being.'

মারিয়া শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধের বিকাশ লক্ষ্য করলেন, তাই শিশুদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ জাগানোই হল তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মূল নীতি। মারিয়া দেখলেন ছেলেরা আনন্দ পেলে যে-কোনো বিষয়ে গভীর মনঃসংযোগ করতে পারে। তারা একই জিনিসকে বার বার করতে ভালোবাসে। শৃঙ্খলাবোধ তাদের মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে। তাদের খেলা ও পড়া নিজেরা বেছে নিতে পছন্দ করে। তারা খেলার চেয়ে কাজ ও কোলাহল অপেক্ষা শান্তি ভালোবাসে। প্রচলিত ধারণার বিরোধী হলেও ডাঃ মন্তেসরি পরীক্ষা করে এসব সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন।

ডাঃ মন্তেসরির এ-সব পরীক্ষার কথা অল্পদিনের মধ্যেই সর্বত্র প্রচার লাভ করে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি এ-বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন। শিক্ষা-জগতে শিশু-মন সম্বন্ধে তাঁর নতুন আবিষ্কার বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে।

১৯৩৯ সালে ডাঃ মন্তেসরি মাদ্রাজে মন্তেসরি শিক্ষাকেন্দ্রে বক্তৃতা দিতে আসেন। হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় এবং তিনি ইতালিয়ান নাগরিক বলে ভারতে থাকতে বাধ্য হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বন্দী করেননি ; ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে তিনি মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর বিখ্যাত বই 'The Absorbent Mind' ভারতে রচিত।

১৯৫২ সালের মে মাসে ডাঃ মন্তেসরি পরলোক গমন করেন।

'শেষের কবিতা'র অমিত নিবারণ চক্রবর্তীর পরিচয় দেবার সময় বলেছিল :

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে
পরিচিত জনতার সরণীতে।

নোবেল কমিটিও ঠিক এই কথাই বলতে পারেন। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা এক অপরিচিত কবিকে সম্মানিত করে পৃথিবীর পাঠকদের বিস্মিত করেছেন বলা যেতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যের অনুবাদ-শাখা বিশ্বসাহিত্যের দর্পণ। উল্লেখযোগ্য সব বই-ই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়। কিন্তু সালভাতোর কোয়াসিমোদোর কোনো বই এখনও অনুবাদ হয়নি। শুধু অল্প কয়েকটি কবিতার অনুবাদ হয়েছে। তা-ও ভাবানুবাদই বেশি।

ইংরেজী অনুবাদ নেই বলে কোয়াসিমোদো আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু স্বদেশেও তিনি উপেক্ষিত ছিলেন দীর্ঘকাল। ইতালিয়ান কবিতা সঙ্কলন, ইতালিয়ান সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতিতে তাঁকে স্থান দিতে সম্পাদক ও লেখকরা কার্পণ্য করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত ইতালিয়ান সাহিত্যের ইতিহাসে (ইংরেজী ভাষায়) তাঁর দান সম্বন্ধে কোনো বিবরণ নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত সমালোচকরা কোয়াসিমোদোকে তৃতীয় শ্রেণীর কবি হিসাবে চিহ্নিত করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তিনি শক্তিশালী কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

কিন্তু স্বীকৃতি এসেছে অনেক বিলম্বে। নব নব সৃষ্টির প্রেরণা আর নেই। কোয়াসিমোদো ভাষাবিদ্। প্রাচীন ও আধুনিক কতকগুলি ভাষা তিনি জানেন। সেই সব ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন কয়েক বছর যাবৎ। তাঁর মৌলিক সৃষ্টির ধারা শুকিয়ে এসেছে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা করেন। একজন ইতালিয়ান সমালোচক দুঃখ করে বলেছেন :

> "Now the perspective is changed. The moment in which he steps into the anthologies is a delicate one for a poet. It means that an age and a manner are sufficiently defined to be treated as closed and spent, and the poet is faced by the choice of silence, repetition or renovation."

সালভাতোর কোয়াসিমোদো সিসিলির অন্তর্গত সাইরাকিউস বন্দরে ১৯০১

খ্রীস্টাব্দের ২০শে আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। বহুদিন যাবৎ তিনি মিলানে বসবাস করছেন। তিনি ইতালিয়ান সাহিত্যের অধ্যাপক।

কোয়াসিমোদোর প্রথম পর্বের কবিতা জাপানী কবিতার মতো তিন চার লাইনের টুকরো টুকরো রচনা। এসব কবিতা সিসিলির পটভূমিকায় একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। তাই এ জাতীয় কবিতা পাঠকদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। মিলানে বাস করে এখনও তিনি সিসিলির কৈশোর পরিবেশের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন।

যুদ্ধের প্রবল সংঘাতের ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন। দেশের লোকের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল। ধর্ম, বিবেক ও মানবতার আদর্শ পদদলিত করে যাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের জন্য তাঁর হৃদয় মমতায় পূর্ণ হয়ে উঠল। এই মমতাই তাঁর দ্বিতীয় পর্বের কবিতার উৎস। Giorno dope Giorno ("দৈনন্দিন"—১৯৪৭) এবং La vita non e sogno ("জীবন স্বপ্ন নয়"—১৯৪৯) কবিতা দু'টিতে এই মমতাবোধের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পাওয়া যায়।

এই নতুন উপলব্ধি কোয়াসিমোদো প্রকাশ করেছেন নিম্নলিখিত বক্তব্যে : A poet is a poet when he does not renounce his presence in a given land, in an exact time, politically defined. And poetry is liberty and truth of that time and not abstract modulations of one's feelings.

কোয়াসিমোদো তাঁর ঐ সময়কার একটি কবিতায়ও এই অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন :

And how were we to sing
with the alien foot upon our heart,
among the dead abandoned in the squares
on the ice-hard grass, at the lamb-like
lament of children, at the black cry
of the mother who walked toward her son
crucified on the telegraph-pole ?

বোরিস পাস্তেরনাকের রচনা দেশ ও সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কান্বিত নয় বলে কোয়াসিমোদো সমালোচনা করেছেন : I think Pasternak is as far from this generation as the moon is from us.

প্রথম পর্বের রচনায় কোয়াসিমোদো প্রধানতঃ তাসোকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তখন তিনি দক্ষিণের স্বপ্নবিলাসে মগ্ন। অনেক কবিতাই ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু 'তিন্দারিতে ঝড়' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত পরিবেশের জন্য নিবিড় বেদনাবোধ চমৎকার ফুটেছে। অনুবাদের মাধ্যমেও জন্মভূমির জন্য প্রবাসী কবির বেদনা অনুভব করা যায়।

কোয়াসিমোদোর প্রথম পর্বের দু'টি কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত হলেও কবিতা দু'টি ভাবগর্ভ। প্রথমটি 'প্রাচীন শীত', দ্বিতীয়টি 'কখনো সন্ধ্যা হয় না।'

১

Desire of your clear hands in the half-light of the flame: they smelt of oakwood and roses; of death. Ancient winter.

The birds looked for their grain and were suddenly of snow; similarly words; a little sun, an angel's glory, and then the mist; and the trees, and us made of air in the morning.

২

Each one stands alone on the heart of the earth pierced through by a ray of sunlight: and in on time it's evening.

কবির বেদনাবোধ আরও গভীর হয়েছে পরবর্তী কালে। 'নীচু সানাই' কবিতাটি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঃ

আমার অনেক প্রত্যাশার এই নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে,
তুমি বাধা দিতে এসো না, টুঁটিচাপা যন্ত্রণা।
একটু সময়ের জন্য থামো।
শীতল সানাই চিরহরিৎ পাতার আনন্দ ছড়াচ্ছে, কিন্তু আমার নয় সেই আনন্দ।
সুখের স্মৃতি আমার মুছে গেছে;
এখন আমার জীবনে নেমেছে সন্ধ্যা।
যে হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি সবুজ সম্পদ তার রস আজ শুকিয়ে গেছে।
দূর আকাশে রঙ্-বদলানো ডানার ঝাপটানি দেখছি চেয়ে চেয়ে;
আমার অকর্ষিত হৃদয় উধাও হয়ে যায়;
পেছনে ফেলে আসা দিনগুলিকে মনে হয় ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপ।

কোয়াসিমোদো দীর্ঘকাল কেন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি তার একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি জনসাধারণের জন্য কবিতা লেখেননি। তিনি বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত পাঠকদের কবি। "বিশুদ্ধ কাব্য" (poesia pura) রীতিতে তিনি বিশ্বাসী। ফরাসী সাহিত্যে মালার্মে ও ভ্যালেরি এই রীতি শুরু করেন। ইতালিয়ান সাহিত্যে উনগারেত্তি ও মোনতেল তা প্রবর্তন করেছেন। কোয়াসিমোদো তাঁদের মূলত অনুসরণ করলেও তাঁর রচনারীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। নোবেল কমিটি তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন "for his lyrical poetry, which with classical fire expresses the tragic experience of life in our time."

পূর্বেই বলেছি, কোয়াসিমোদোর রচনার ইংরেজী অনুবাদ খুব কমই হয়েছে। The Penguin Book of Italian Verse-এ কোয়াসিমোদোর নয়টি কবিতার অনুবাদ (মূল সহ) আছে। উপরে উদ্ধৃত কবিতার একটি ছাড়া অন্য সবগুলি ঐ বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্মী মেয়ের স্মৃতিচারণ

সিমন দ্য বোভোয়ার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের মনে বিশেষ কৌতূহল আছে। কৌতূহল নানা কারণে। তিনি সার্ত্র-এর ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী। তাঁর রচনায় যে বুদ্ধির দীপ্তি ও চিন্তার স্বচ্ছতা দেখা যায় তার প্রকৃত উৎস কোথায়? হোটেলবাসিনী, অবিবাহিতা এবং একান্ন বছর বয়সেও রূপসী এই লেখিকা নিজেকে ঘিরে রহস্যের সৃষ্টি করেছেন। সেই রহস্য কিছুটা উম্মোচিত হবে তাঁর আত্মচরিত Memoirs of a Dutiful Daughter পাঠ করলে।

সম্পূর্ণ হবে না, কারণ সার্ত্র-এর সঙ্গে পরিচয় হবার পরই কাহিনী শেষ হয়েছে। এখানে আমরা লেখিকা ও অস্তিত্ববাদের সমর্থক সিমনকে দেখতে পাই না। জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কেমন করে তিনি বৃহত্তর জীবনের প্রবেশ পথে এসে উপস্থিত হয়েছেন 'মেময়রস্ অব এ ডিউটিফুল ডটার' তারই ইতিহাস।

সিমনের ব্যক্তিগত জীবনের আকর্ষণ যত বড়ই হোক সাহিত্যের বিচারে তা গৌণ। তাঁর স্মৃতি-কথা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। 'দি সেকেন্ড সেক্স' ও 'দি মান্দারিনস্'-এর প্রাখর্য এখানে নেই; কিন্তু স্মৃতি-রোমন্থনের স্নিগ্ধ মাধুর্যে বইটি সহজেই পাঠকের মন স্পর্শ করে।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে সিমনের জন্ম হয়। তাঁদের বংশ-মর্যাদা যত বড় ছিল, আর্থিক সংগতি সে পরিমাণ ছিল না। তাঁর বাবা প্যারিসে ওকালতি করতেন; কিন্তু কাজের চেয়ে তাঁর বেশি উৎসাহ ছিল অভিনয়ে। বই পড়তেও খুব ভালোবাসতেন। সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে সিমনকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলের পড়া তিনি কখনো অবহেলা করেননি। খেলার সময়ও সিমন কখনো লঘুচিত্ততার পরিচয় দেননি। সর্বদা নিয়ম-কানুন মেনে চলেছেন। তাঁর পুতুলরা আবোল-তাবোল বকতো না; তাদের কথাবার্তা ছিল বয়স্ক মানুষের মতো যুক্তিপূর্ণ। সিমনের পুতুলের সংসারে স্বামীর স্থান ছিল না। মা সন্তান মানুষ করছে দেখা যেত; কিন্তু বাবা সব সময়ই বিদেশে। স্ত্রীকে স্বামীর ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হয়,—একথা সিমন পুতুল খেলার বয়সেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং তখনই সঙ্কল্প করেছিলেন তিনি বিয়ে করে স্বামীর দাসত্ব করবেন না। তবে শিক্ষিকা হিসাবে শিশুদের মানুষ করে তোলবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধা নেই।

স্কুলের সহপাঠিনী জাজা ছাড়া সিমনের অন্য কোন বন্ধু ছিল না। একটু বড় হবার পর খেলার আগ্রহ কমে গেল। সংগী হল বই। পড়বার নেশা পেয়ে বসল তাকে। কিন্তু যে বই খুশি পড়বার অধিকার ছিল না। বাবার চেয়ে গোঁড়া নীতিবাদী

ছিলেন মা। তিনি যে বই অনুমোদন করে দিতেন শুধু সে বই পড়া চলত। যে পাতাগুলি অবাঞ্ছিত মনে হত মা সেগুলি পিন দিয়ে আটকে দিতেন। মনে আছে, ওয়েলসের 'দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডসের' একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় মা নিষিদ্ধ করেছিলেন। পিন খুলে সিমন মার নির্দেশ কখনো অমান্য করেননি।

বই তাঁর কাছে একটি নতুন জগতের দ্বার মুক্ত করে দিল। ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বইগুলি পড়তে লাগলেন একে একে। উপন্যাসের নায়িকাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখতে তাঁর ভালো লাগত। 'মিল অন দি ফ্লস'-এর নায়িকা ম্যাগি টুলিভারের সঙ্গে তিনি নিজের ঘনিষ্ঠ মিল খুঁজে পেয়েছিলেন।

মা'র উপদেশ সিমনকে ছেলেবেলা থেকেই ধর্মভীরু করেছিল। মাসে দু'বার তিনি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতেন। কিন্তু বই পেয়ে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে গেল। ধর্ম এবং ঈশ্বরের স্থান অধিকার করল বই। ভালো বই তাঁর কাছে বাইবেলের মর্যাদা পেল। যে বই ভালো লাগত তা বরাবর পড়তেন; বই থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন; ভালো ভালো অংশগুলি খাতায় লিখে রাখতেন; পড়তে পড়তে কত বাক্য ও অনুচ্ছেদ মুখস্থ হয়ে যেত। বই পড়ে কখনো চোখের জলে বুক ভেসে যেত; কখনো মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠত। সিমন ভাবতেন, বই যতদিন আছে ততদিন জীবনের সুখ তো আমার হাতের মুঠোয়। সুখের জন্য আর কিছুর উপরই নির্ভর করতে হবে না।

এত বই পড়লেও সিমনের লেখা ছিল খুব কাঁচা। বন্ধু জাজা একবার ঠাট্টা করে বলেছিল, 'তোর চিঠি তো নয়, মনে হয় ক্লাসের রচনা-খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে ডাকে দিয়েছিস্।' সিমনের তুলনায় ক্লাসের অনেক মেয়ের ভাষা বেশ ভালো ছিল। মনের গভীরতম অনুভূতির কথা পচছন্দমতো ভাষায় প্রকাশ করা তাঁর কাছে কঠিন মনে হত। বারেসের কথা বারবার তিনি বলতেন: why have words, when their brutal precision bruises our complicated souls?

মনের অনুভূতিকে যথার্থরূপে শব্দে প্রকাশ করা এত কঠিন উপলব্ধি করেও মাত্র পনেরো বছর বয়সেই সিমন সঙ্কল্প করলেন তিনি লেখিকা হবেন। একদিন তাঁর এক বন্ধু অ্যালবাম এগিয়ে দিল; তাতে কতকগুলি প্রশ্ন ছিল, তার জবাব দিতে হবে। একটা প্রশ্ন: ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি কি হতে চাও? সিমন উত্তর লিখলেন: বিখ্যাত লেখিকা। তিনটি কারণ তাঁকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রথমত, বইয়ের অপূর্ব জগৎ যাঁরা সৃষ্টি করেন তাঁদের প্রতি সিমনের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। দ্বিতীয়ত, বাস্তব জীবনে তাঁর বেশি লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। লেখার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, লেখার মধ্যে নিজেকে নব নব রূপে সৃষ্টি করা যায়, প্রসার করা যায়।

এদিকে স্কুলের পড়ায় সিমন সবাইকে পেছনে ফেলে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগলেন। মা-বাবার দুঃখ, সিমন যদি ছেলে হত তাহলে কত উন্নতি করতে পারত।

বাবা বলতেন, আমার মেয়ের মাথা পুরুষের মতো, পুরুষের মতো তার চিন্তা-ভাবনা ; সে তো মেয়ে নয়,—ছেলেই।

পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে দেখার চেয়ে বড় সম্মান মেয়েদের আর নেই। পুরুষের পাশে দাঁড় করে মেয়েদের বিচার করা হয়। তাদের নিজেদের মূল্য দিয়ে বিচার করবার রীতি নেই। এরই বিরুদ্ধে সিমন 'দি সেকেন্ড সেক্স'-এ বিদ্রোহ করেছেন।

মেয়ে খুব বেশি পড়ুক তা মা'র ইচ্ছা ছিল না। সম্ভ্রান্ত ফরাসী পরিবারে তখন মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেবার আগ্রহ নিন্দনীয় ছিল। তথাপি নিজের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাবার সমর্থন যুক্ত হওয়ায় পড়া বন্ধ করতে হয়নি।

দেহ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যৌন চেতনা জাগতে লাগল। নানা বিষয়ে কৌতূহল। দু' একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে যৌন-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা হত। মা যখন একদিন মেয়েদের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটি কথা বলতে এলেন তখন সিমন বললেন, 'এসব কথা আমি জানি।'

দূর সম্পর্কের আত্মীয় জাকের প্রতি সিমন গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। জাকও ছাত্র ; প্যারিসের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। আধুনিক লেখকদের যে-সব বই বাড়িতে নিষিদ্ধ তাদের সঙ্গে সিমন পরিচিত হলেন জাকের সহায়তায়। জাকের সঙ্গে গল্প করতে, বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত। ভাবতেন, এই বুঝি ভালোবাসা। মা জাককে পছন্দ করতেন না। মেয়েকে ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে বাধা দিতেন। মেয়েদের অসহায়তার কথা উপলব্ধি করে সিমন ক্ষুব্ধ হতেন ; বাধা পেয়ে জাকের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেড়েই চলল।

কিন্তু তাঁর প্রতি জাকের আকর্ষণ মুখর নয়। সিমন চিঠি লেখেন, জাকের কাছ থেকে জবাব আসে না। পুরুষের চরিত্র অনুভূতির সংযমের উপরেই নির্ভর করে, এই ছিল জাকের বিশ্বাস। একদিন সে সিমনকে শুনিয়েছিল গ্যেটের কথা : I love you ; is that any business of yours ? এই নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও সিমনের মনে জাকের প্রভাব শিথিল হয়নি। কিন্তু জাক যখন কয়েকবার পরীক্ষায় ফেল করবার পর উত্তর আফ্রিকায় চাকরি নিয়ে চলে গেল তখন ভরসা করবার আর কিছুই রইল না।

শুধু বই নিয়ে যৌবনের স্বপ্ন পূর্ণ হয় না। একটি সঙ্গীর জন্য মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। সিমন হয়ত দেখতে পেলেন একটি তরুণ একটি তরুণীর কাঁধের উপর হাত দিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে পথ চলছে। অমনি তাঁর মনে হত এমন একটি তরুণ সঙ্গী তিনিও যদি পেতেন ! কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সঙ্গী তিনি কেন পেলেন না ? যে-সব মেয়েদের বিয়ে হয় তারা বোধহয় অন্য জাতের। ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির দীপ্তি যে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে তার জন্যই তিনি একা। অথচ জাক বলত সকলের মতো হওয়াতেই আছে সুখ : The secret of happiness and the very height of artistic achievement is to be like everybody else, yet to be like no one on earth.

সকলের মতো হয়েও নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার কৌশল সিমন শেখেননি।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তিনি প্যারিসের রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মদের গ্লাশ হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন; গল্প করতেন নানা ধরনের লোকের সঙ্গে। এমনি শিথিল জীবন যাপনের ফলে তাঁকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। একবার একটি লোক গাড়ি করে সিমনকে শহরের বাইরে নির্জন জায়গায় নিয়ে এল। তখন অনেক রাত হয়েছে। সিমন তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে পালিয়ে শেষ ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে এলেন। আর একদিন কয়েকজন উচ্ছৃংখল চরিত্রের যুবক রেস্তোরাঁয় তাঁকে খাওয়ালো। গল্প করতে করতে রাত হল অনেক। বাড়ি ফেরার জন্য তিনি পথে বেরিয়ে এলেন। যুবকরাও এসেছে তাঁর সঙ্গে। তারা বলল, বাঃ পয়সা খরচা করে আমরা খাওয়ালাম, আর তুমি ফাঁকি দিয়ে বাড়ি চলে যাবে? তা হবে না, চলো আমাদের সঙ্গে। বে-গতিক দেখে সিমন রাস্তা দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলেন। ওরাও ছুটছে। সেদিন কি হত বলা যায় না। হঠাৎ পুলিশ এসে পড়ায় সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন।

জাক আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে সিমনের বন্ধুত্ব ভুলে গেল; বিয়ে করল অন্য একটি মেয়েকে। জাজা ভালোবেসেছিল তার এক সহপাঠীকে। পারিবারিক সংস্কার তাদের মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় সে মৃত্যু বরণ করল। এই দুটি ঘটনা গভীরভাবে আঘাত করেছিল সিমনকে। বিশেষ করে জাজার করুণ মৃত্যু তাঁর মন থেকে প্রেম ও বিবাহের স্বপ্ন দূর করে দিল। তিনি বললেন, জাজা তাঁর মৃত্যু দিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

পুরনো বন্ধুরা বিদায় নিল। এবার আলাপ হল সার্ত্র-এর সঙ্গে। শুরু হল তার জীবনের নতুন অধ্যায়। সার্ত্র বললেন, from now on, I'm going to take you under my wing. সিমনও সানন্দে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। সার্ত্র তাঁকে লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন; বলেছেন, অন্য সব ত্যাগ করে উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য আপ্রাণ সাধনা করতে। কারণ, When one has something important to tell the world, it is criminal to waste one's energies on other occupations. The work of art or literature was, in his view, an absolute end in itself; it was a law unto itself, and its creator was a law unto itself...

লেখিকা প্রশংসনীয় সংযমের সঙ্গে নিজের কথা বলেছেন। আত্মম্ভরিতা, ভাবালুতা অথবা বাচালতা নেই কোথাও। নির্লিপ্ত দর্শকের মতো জীবনকে তিনি দেখেছেন।

ইলিয়া এরেনবুর্গের কাছে কথাটা শুনেছেন শ্রীমতী বোভোয়ার। স্ট্যালিন নাকি একবার কয়েকজন লেখকের সংগে আলাপ-আলোচনার সময় বলেছিলেন ঃ বড় লেখক হবার পথ দু'টি। এক, শেক্সপিয়রের মতো মর্মস্পর্শী ট্র্যাজিক ফ্রেস্কো আঁকা ; দ্বিতীয়, ছোট ছোট ঘটনার যথার্থ বর্ণনা দিয়ে জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলা—যেমন করেছিলেন চেকভ। স্ট্যালিন আরও বলেছিলেন যে, তিনি লেখক হলে চেকভের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন।

শ্রীমতী বোভোয়ার তাঁর নিজের পথ সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। হয়ত দুটির একটি পথও তাঁর নয়। তবে তাঁর জীবনস্মৃতির তৃতীয় খণ্ড বহু তুচ্ছ বিবরণে ভারাক্রান্ত। অসংখ্য বন্ধুর নাম, পরিচিত ব্যক্তি ও জায়গার নাম এবং রেস্তোরাঁ, থিয়েটার, ভ্রমণ ইত্যাদির কথায় পূর্ণ। এই বিবরণগুলি কাঁটার মতো মুখ উঁচিয়ে আছে ; লেখিকা তাদের সংহত করে জীবনের একটি সামগ্রিক মনোজ্ঞ ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। পড়তে পড়তে মনে হয়, সমকালীন জীবনের যে ইতিহাস লেখিকা দিয়েছেন তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার ছাড়া কিছু নয় ; কখনো বা সেই সময়কার তথ্যনিষ্ঠ নীরস দিনলিপি থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। ঘটনা এবং জীবনধারা ব্যক্তিগত দৃষ্টির রঙ পায়নি। আত্মজীবনীর মূল্য বহুলাংশে নির্ভর করে এই রঙের উপরে। প্রথম খণ্ডে ("মেমোয়র্স অব এ ডিউটিফুল ডটার") এর অভাব ছিল না। এই জন্য এবং আরও কয়েকটি কারণে এটি যে শ্রেষ্ঠ খণ্ড তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। দ্বিতীয় খণ্ডের ("দি প্রাইম অব লাইফ") বিষয়বস্তু এমন যে পাঠক স্বভাবতঃই আকর্ষণ অনুভব করেন। কেননা, এই খণ্ডে আছে লেখিকার যৌবনের কাহিনী, সার্ত্রের সহচরীরূপে সাহিত্যের ও বুদ্ধির জগতে প্রবেশের কথা। সে যৌবন এক দিকে যেমন বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, অন্যদিকে তেমনি নাৎসী অভিযানের নৃশংসতায় পীড়িত।

আলোচ্য খণ্ডের (Force of Circumstance) কালব্যাপ্তি ১৯৪৪ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত। বই শুরু হয়েছে নাৎসী-রাহুমুক্তির অব্যবহিত পর থেকে। ফ্রান্সের সর্বাঙ্গে তখন যুদ্ধের ক্ষত ; সেই ক্ষত নিরাময় করে নতুন ফ্রান্স গড়ে তোলবার জন্য গলিস্ট, কম্যুনিস্ট, ক্যাথলিক প্রভৃতি বিভিন্ন দল হাত মিলিয়েছে। সার্ত্র জার্মান বন্দী-শিবির থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন। একদল লোক প্রচার করছে যে, নাৎসীরা তাঁকে মুক্তি দিয়েছে তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করবার পুরস্কার হিসাবে। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীরা রাশিয়ার শৌর্যে এবং দুঃখবরণের সংকল্পে মুগ্ধ। কিন্তু সার্ত্র কিংবা সিমন দ্য বোভোয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য হননি। কারণ সার্ত্রের ধারণা ছিল

মার্ক্সবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিতে নারাজ। নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তিনি এতই সচেতন ছিলেন যে কোনো দার্শনিক তত্ত্বের আকর্ষণে তাকে ছোট করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জার্মান আধিপত্যের প্রথম বলি হয়েছিল ফ্রান্সের শিল্প ও সাহিত্য। দেশের মুক্তির পর নতুন নতুন বই প্রকাশকের দপ্তরে এল। সাত্র্র "দি এইজ অব রিজন" এবং বোভোয়ারের "দি ব্লাড অব আদার্স" যুদ্ধপরবর্তী যুগে প্রথম প্রকাশিত বইগুলির অন্যতম। সাত্র্ এবং তাঁর সহযোগী তরুণ লেখকরা অস্তিত্ববাদের যে তত্ত্ব প্রচার করতে আরম্ভ করলেন যুদ্ধোত্তর চিন্তাধারায় তা' ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য দান।

বোভোয়ারের স্মৃতিকথার শেষ খণ্ডটি দু'টি বিশেষ কারণে ঔৎসুক্য সৃষ্টির দাবি রাখে। প্রথমত বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধে ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের অভিমত কি তা জানা যাবে লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পটভূমিকায়। তিনি আফ্রিকা, কিউবা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ ঘুরেছেন এবং তাদের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরাধীন দেশের প্রতি স্বভাবতঃই তাঁর সহানুভূতি গভীর। এই সহানুভূতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল আলজেরিয়ায় ফরাসী সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তাঁরই নেতৃত্বে প্যারিসে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বেশ বিস্তারিত করে লিখেছেন বোভোয়ার। বিশেষ করে সেখানকার লেখকদের কথা। পাস্তেরনাক বড় কবি কিন্তু "ডক্টর জিভাগো" মহৎ উপন্যাস নয়,—তাঁর এই সিদ্ধান্তের সংগে অনেকেই একমত হবেন। রাশিয়ায় নব নব কর্মপ্রচেষ্টা বিস্ময়কর। নানা দিকে রাশিয়া অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে সত্য, কিন্তু জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর হয়নি। দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাব মেটেনি। গৃহিণীদের ঘুরে বেড়াতে হয় সামান্য গৃহস্থালির জিনিসের জন্য। আকাশ জয়ের লোভ ত্যাগ করতে না পারলে রাশিয়ার দারিদ্র্য দূর হবার আশা সুদূরপরাহত, —এই হল লেখিকার অভিমত।

আলজেরিয়ায় ফরাসী সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে কামু কোনো বিবৃতি দেননি বলে বোভোয়ার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নোবেল পুরস্কার আনতে গিয়ে স্টকহোলমে কামু বলেছেনঃ 'আই লাভ জাস্টিস; বাট আই উইল ফাইট ফর মাই মাদার বিফোর জাস্টিস।' মাতৃভূমি বলেই ক্যামু ফ্রান্সের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে নয়। ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করলে ফ্রান্সের বিপক্ষে যেতে হত।

চীনের প্রতি লেখিকার গভীর সহানুভূতি পরিস্ফুট। নবতন্ত্রের পরে চীন নানা ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে। বুভুক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যতটা সাফল্য লাভ করেছে তাকে মিরাকল্ বলা চলে; বিশেষ করে ভারত, ব্রেজিল প্রভৃতি বুভুক্ষু দেশ যা করতে পেরেছে তার তুলনায়। চীনের সমালোচকদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন। চীনা কমিউন প্রথা সম্বন্ধে কেউ কেউ বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করায় লেখিকা ক্ষুব্ধ। চীনের কুক্ষিগত হওয়ায় যাঁরা তিব্বতের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তাঁরা বোভোয়ারের কাছ থেকে পেয়েছেন ব্যঙ্গোক্তি।

প্রসংগক্রমে বার তিনেক ভারতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতার পথে চলন্ত কঙ্কালের কথাও আর পাঁচজন সাধারণ বিদেশী লেখকের মতো বলেছেন (পৃ. ৬৫৪)। এই বই পড়ে মনে হয় ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী মহলে ভারতের কোনো স্থান নেই। পৃথিবীর চল্লিশ কোটি লোক যে এক অভিনব উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করল তার কোনো প্রভাবই ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী লেখকের মনে পড়েনি। তাহলে বুদ্ধিজীবীর যা অন্যতম মূলধন, সেই ইতিহাসচেতনার প্রমাণ কই ?

৪৬২ পৃষ্ঠায় এই বাক্যটি পড়ে চমক লাগে : 'আই গ্রীটেড দ্য পোপ্‌স ডেথ উইদ এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অব প্লেজার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্যাট অব জন ফস্টার ডালেস।' নিশ্চয়ই এঁরা দুজন লেখিকার ব্যক্তিগত শত্রু ছিলেন না যে শত্রুনিপাতের মেয়েলি আনন্দে তিনি উৎফুল্ল হবেন। আদর্শগত বিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু তার জন্য আগে বা পরে কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে এরূপ একটি আকস্মিক উক্তি করলে পাঠকের রুচিকে পীড়িত করা হয়।

পরিশিষ্টের অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠায় লেখিকা নিজেকে যতটা উন্মুক্ত করেছেন সমগ্র গ্রন্থে তার চেয়ে বেশি পরিচয় নেই। তাঁর সম্বন্ধে পাঠকদের মধ্যে যে-সব গুজব প্রচলিত আছে তাদের উত্তর দেওয়া হয়েছে পরিশিষ্টে। গুজবের অধিকাংশই তাঁর সংগে সার্ত্রের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। যেমন, একটি বহুলপ্রচলিত ধারণা ছিল যে বোভোয়ারের সব বই আসলে সার্ত্র-ই লিখে দিয়েছেন। গুজব রটনার অন্যতম কারণ ছিল তাঁদের দু'জনের অসাধারণ বন্ধুত্ব। তাঁরা পরস্পরকে জীবনের সংগী হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রেমকে বন্দী করেননি। এবং তাঁদের এই প্রেম ঈর্ষাকাতরতা থেকে মুক্ত। বোভোয়ার এবং সার্ত্র—এই দুজনেরই অন্য বন্ধু এবং বান্ধবীও আছে। এক বন্ধুর সংগে অনেকদিন পরে পুনর্মিলনের কথা বলতে গিয়ে বোভোয়ার অসঙ্কোচে ঘোষণা করেছেন : 'আওয়ার বডিজ মেট ইচ্‌ আদার এগেইন উইদ জয়।' একে অন্যের পরগামিতাকে স্বাভাবিক হিসাবে মেনে নিয়েছেন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে এমন নির্লিপ্ততা দুর্লভ। সুতরাং পাঠকের মনে তাঁদের বন্ধুত্বের শর্ত ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানবার জন্য কৌতূহল জাগে। দুঃখের বিষয় লেখিকা তা মেটাননি।

বোভোয়ার সগৌরবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর জীবনের অন্যতম সাফল্য হল সার্ত্রের সংগে বন্ধুত্ব। শুধু বন্ধুত্ব নয়, একাত্মবোধ। ত্রিশ বছরে একদিন মাত্র তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে। দু'জনের চিন্তার জগৎ এক। তাই বলে সাহিত্যকর্ম অভিন্ন নয়। যেন এক জমিতে দু'জাতের শস্য। তাঁদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বোভোয়ারের মতে এই : 'সার্ত্র ইজ ইডিওলজিক্যালি ক্রিয়েটিভ, আই অ্যাম নট।'

যাঁরা সার্ত্রের আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড পড়েছেন তাঁরা আর একটি পার্থক্য লক্ষ্য করবেন। সার্ত্র কম কথায় অনেক বেশি বলেন, বোভোয়ার বেশি পাতা ভরিয়েও অনেক কম বলেন।

অচ্ছুৎ

উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার এক ধাঙড় পরিবারের ছেলে হাজারি। বংশ-পরম্পরায় তারা আবর্জনা পরিষ্কার করে আসছে; থাকে অস্পৃশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক্ পাড়ায়। ছেলেবেলা থেকেই হাজারি তার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু ছেলেরা দূর থেকে চিৎকার করে পথিকদের সাবধান করে দিত, "অচ্ছুৎ আসছে।" সৌভাগ্যক্রমে তাকে গ্রামের সেই আবহাওয়ায় বেশিদিন থাকতে হয় নি। তার বাবা সপরিবারে দেরাদুন, মুসৌরি, সিমলা প্রভৃতি শহরে ঘুরে ঘুরে সাহেবদের বাড়ি চাকরি করতে আরম্ভ করল। মা-ও কাজ নিল আয়ার। বালক হাজারি ছোট ভাই-বোনদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য বাড়ি থাকত। সকাল বেলা জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখত দল বেঁধে ফুট-ফুটে ছেলেমেয়ের দল ইস্কুলে যাচ্ছে। তারও আকাঙ্ক্ষা হতো অমনি ইস্কুলে যেতে। কিন্তু তার উপায় কী? কিছুদিন পরেই তাকে টেনিস ক্লাবে বল কুড়াবার কাজ নিতে হলো। আর একটু বড় হয়ে হাজারি কাজ করতে লাগল বিভিন্ন হোটেলে। নিজেদের বাড়িতে যে সব লোক তাকে অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা করেছে তারাই হোটেলে বসে অম্লানবদনে হাজারির হাত থেকে নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে।

শহরের সামাজিক পরিবেশ ছিল অপেক্ষাকৃত মুক্ত। এখানে সারাক্ষণ জন্মের পরিচয়টা কাঁটা হয়ে বিঁধত না। তবু দরিদ্রের কোথায় বা সম্মান আছে! হাজারি দেখেছে মনিবের কাছে বাকী মাইনে চাইতে গিয়ে শাদা গেঞ্জির উপর জুতোর ছাপ নিয়ে তার বাবা ঘরে ফিরেছে। পুত্রের কাছে এই লাঞ্ছনা গোপন করবার জন্য কত ছলনাই না করত তার বাবা! এ সম্বন্ধে তার নিজের অভিজ্ঞতাও কম নয়। হোটেলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি; খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। এক টুকরো অ-বিক্রেয় বাসি রুটি এবং একটু চা খাবার আয়োজন করছে, এমন সময় হঠাৎ মালিক এসে হাত থেকে ক্ষুধার গ্রাসটুকু টেনে নর্দমায় ফেলে দিয়ে মাথায় এক চাঁটি বসিয়ে দিল। অভিযোগ,—চুরি করে খেয়ে হোটেলের সর্বনাশ করছে।

হাজারির সৌভাগ্য সে অনেক সহৃদয় প্রভু পেয়েছে তার কর্মজীবনে। তাঁদের উৎসাহে ও সাহায্যে সে লেখা-পড়া শিখতে লাগল কাজের ফাঁকে ফাঁকে। তারপর এক বিদেশীর অর্থানুকুল্যে পড়তে গেল প্যারিস। যেন রূপকথা। সেই ধাঙড়ের ছেলে তার আত্মজীবনী লিখেছে। বইটির নাম Autobiography of an Indian Outcaste. ছোট্ট ভূমিকা লিখেছেন গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মী পোলক। লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তাঁর প্রথম জীবনের অপমানের জন্য কোনো উষ্মা নেই, নিজের বেদনাকে নিয়ে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করা হয়নি।

এই আত্মজীবনীর কয়েকটি বিশেষ অংশ মনে দাগ রেখে যায়। হাজারি দুবেলার অন্নের সংস্থান করেছে। তারপরে মনে জাগল ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব। যে ধর্ম তাকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দেয় না সে ধর্মই কি তাকে ঈশ্বরানুভূতির পথে এগিয়ে দিতে পারবে? অথচ ঈশ্বরানুভূতি ছাড়া আত্মার দ্বন্দ্ব ঘুচবে কি করে? কারণ,

For a hungry man there is no rest but in food,
For a restless spirit there is no rest but in God.

বিদেশ-যাত্রার পূর্বে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নেবার দৃশ্যটা বড় করুণ। দূরত্বটা শুধু ভৌগোলিক নয়, হাজারি তার শিক্ষা ও মানসিকতা নিয়ে এক নতুন জগতে প্রবেশ করছে, যে জগতের সঙ্গে পিতৃপুরুষের কোনোকালে পরিচয় ছিল না, যেখানে তার মা-বাবা অন্ত্যজ। এটা শুধুই মামুলী বিদায় গ্রহণ নয়, একেবারে নাড়ীর বন্ধন ছিঁড়ে যাওয়া! ভাষার সংযমে, ভাবের গভীরতায়, গ্রন্থের এই অংশটি সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী।

পনেরো বছর বয়সে কিশোর হাজারি এক শ্বেতাঙ্গ তরুণীর প্রেমে পড়েছিল। সেই অধ্যায়টি একটি নিটোল প্রেমের কবিতার মতোই সুন্দর। হাজারি তখন এক মেম সাহেবের ভৃত্যের কাজ করত। একবার সে কর্ত্রীর সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গেল। সেখানে মিস জোয়ান এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। রোজ তারা নৌকো করে ডাল হ্রদে বেড়াতে যেত। জোৎস্না রাত্রির অপূর্ব মোহময় পরিবেশে কিশোর হাজারি পুরুষের শাশ্বত স্বপ্নের রূপায়ণ দেখল জোয়ানের মধ্যে। হাজারি সর্বদা জোয়ানের পাশে পাশে থাকে, সে ফাই-ফরমাস তামিল করবার ভৃত্য। জুতার ফিতা খুলে দেয়; গা থেকে কোট খুলে নেয়; চায়ের কাপ তুলে দেয় জোয়ানের হাতে। এত কাছে কাছে থাকে, বর্ণোজ্জ্বল দেহের সুগন্ধ নির্বোধ কিশোরকে আবেগ-চঞ্চল করে তোলে। মুখ তো বন্ধ; কিন্তু হাজারির চাঞ্চল্য কি জোয়ানের মনে সাড়া জাগায়নি? জোয়ান কাশ্মীর ছেড়ে চলে যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় দু'জনে বেড়াতে বেরিয়ে একটা পোলের উপর অনেকক্ষণ চুপ করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে আবার হোটেলে ফিরে এলো। পরদিন সকালে জোয়ান চলে যাবার পর হাজারি জানতে পারল সে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তার কর্ত্রী সম্মত হয়নি। কথাটা জেনে হাজারি কান্নায় ভেঙে পড়ল। এ কান্নার অন্তরালে একটু সান্ত্বনাও হয়তো ছিল। (বাণভট্টের 'তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী' পত্রলেখার কিন্তু চোখের জল পড়েনি।)

কয়েক বছর পরে জোয়ানকে হাজারি দেখতে পেয়েছিল দিল্লীর পলো খেলার মাঠে। জোয়ানের তখন বিয়ে হয়েছে; হাজারিকে চিনতে পারেনি। না চিনুক, তার জন্য ওর ক্ষোভ নেই। ধাঙড়ের ছেলেকে কে-ই বা চিনতে চায়?

একজন মহৎ শিল্পীর জীবন ও সাধনার কাহিনী নতুন করে জানা গেল কাল নর্দেনফকের বই থেকে।

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০ শে মার্চ। দক্ষিণ-হল্যান্ডের এক অখ্যাত গ্রামে এক দরিদ্র পাদ্রির গৃহে একটি শিশুর জন্ম হলো। বাবা-মা নাম রাখলেন ভিন্‌সেন্ট উইলেম ভ্যান খখ্‌। বৃহৎ খখ্‌ বংশের অনেকেই বড় হয়েছেন,—কেউ ব্যবসায়ে, কেউ চাকরিতে। ভিন্‌সেন্টের বাবা কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সামান্য বেতনে পাদ্রির চাকরি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। উন্নতির আশা নেই। সামান্য আয় নিয়ে ছেলে-মেয়েদের দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ানোই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। ছেলেদের ভালো করে লেখাপড়া শেখানো তো দূরের কথা, তাদের বাড়িতে বসে থাকতে দেবারও উপায় নেই।

মাত্র ষোল বছর বয়সে ভিন্‌সেন্টকে চাকরি নিতে হলো। তার তিন কাকার ছিল ছবির ব্যবসা। এক জন ছিলেন বিখ্যাত গুপিল অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার। কোম্পানির হেড আপিস প্যারিস; শাখা-আপিস আছে হেগ, বার্লিন ও লন্ডনে। প্রথম শ্রেণীর ছবির ব্যবসায়ী হিসেবে য়ুরোপের সর্বত্র তাদের নাম। কাকার সুপারিশে ভিন্‌সেন্ট কোম্পানির হেগ শাখায় সামান্য একটা চাকরি পেল। চাকরিটা সামান্য, কিন্তু তার ইঙ্গিত ছিল সুদূরপ্রসারী। দোকানের চার দিকে কেবল ছবি আর ছবি। বিখ্যাত শিল্পীদের মূল ছবি অথবা প্রতিলিপি। এই রূপ ও রঙের জগৎ অলক্ষ্যে কিশোর ভিন্‌সেন্টকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করল। রূপ ও রঙের স্বপ্ন মিশে গেল তার রক্তের সঙ্গে। এর হাত থেকে সে আর মুক্তি পায়নি জীবনে।

একে একে তিন বছর পার হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ভিন্‌সেন্টকে পাঠালেন লন্ডন-আপিসে। এক বিধবা ফরাসী মহিলা শ্রীমতী লয়ারের বাড়িতে তার থাকবার বন্দোবস্ত হলো। টাকা দেয়, তার বদলে পেয়েছে থাকবার ঘর, পায় আহার্য। ঝঞ্ঝাট নেই। দোকানে যায়, সারাদিন ছবি নিয়ে থাকে, আবার ফিরে আসে নিজের ছোট ঘরে। ভিনসেন্ট ছেলেবেলা থেকেই একটু স্বতন্ত্র, লোকে বলত মাথায় ছিট আছে। নিজেকে নিয়ে একা থাকতে ভালোবাসে, বন্ধু-বান্ধব বড় নেই কেউ। তার কার্যকলাপ অনেক সময় এমন আকস্মিক যে লোকে তা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারে না। সেই ভিনসেন্ট এখন ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছে; সূর্যের উত্তাপে যেন হিমালয়ের জমাট তুষার গলতে আরম্ভ করেছে। গৃহকর্ত্রীর

মেয়ে উরসুলার উত্তাপ লেগেছে তার মনে। উনিশ বছরের তরুণী। চমৎকার একহারা গড়ন, প্রাণের উচ্ছলতা তার চোখে-মুখে। ভিনসেন্ট মুগ্ধ হলো, ভালোবাসল তাকে। বিশ বৎসরের জীবনে এই তার প্রথম ভালোবাসা। প্রথম যৌবনের সুদৃঢ় আশাবাদ তার প্রেমের সাফল্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ জাগতে দেয়নি। উরসুলাও ব্যবহার করেছে বন্ধুর মতো। প্রতিদান সম্বন্ধে ভিনসেন্ট ছিল নিঃসন্দেহ। কিন্তু অনেক দ্বিধার পর যেদিন উরসুলাকে নিজের মনের কথা খুলে বলল সেদিন পেল দুঃসহ আঘাত। উরসুলার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে ওদের পূর্ববর্তী পেয়িং গেস্টের সঙ্গে। ভিনসেন্ট আসবার আগে তার ঘরেই সে থাকত। ওদের বিয়ে হবে কয়েক মাসের মধ্যে।

ভিনসেন্ট এত বড় আঘাত সহজে স্বীকার করে নিতে পারে না। হয়তো তার গভীর প্রেমের পরিচয় পেলে উরসুলার মন বদলাবে, হয়তো এখনো আশা আছে। সে দুঃসাহস করে এগিয়ে যেতে চায়, তাতে উরসুলার শুধু বিরক্তি বাড়ে। উরসুলা কথা বন্ধ করে দিল, তার সামনে বের হয় না। উরসুলার মা ভিনসেন্টকে বাড়ি ছেড়ে দিতে নোটিশ দিল। বাড়ি ছেড়ে তো গেল, কিন্তু মন পড়ে রইল উরসুলাকে ঘিরে। কাজে মন নেই, কর্তব্যে অবহেলার জন্য উপরওয়ালার কাছ থেকে তিরস্কার শুনতে হয়। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা কত ছবি তার চারপাশে সাজানো থাকে, হাজার হাজার টাকা তাদের দাম। শুধু একটি জীবন্ত মুখের ছবি তার হৃদয়ের আকাশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে, আর সব ছবি গেছে হারিয়ে। উরসুলাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ভিনসেন্ট রোজ একবার করে হেঁটে যায় ওকে দেখতে পাবার আশায়। এত করেও উরসুলার মন বদলাবার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কিন্তু তার সম্বন্ধে মালিকের ধারণা বদলাবার প্রমাণ পাওয়া গেল শীগ্‌গিরই। কর্তব্যে অবহেলার জন্য ভিনসেন্টকে লন্ডন থেকে প্যারিস বদলী করা হলো। ওর কাকা ভেবেছিলেন হেড আপিসে এলে ভিনসেন্টকে চোখে চোখে রাখা যাবে। ভিনসেন্ট লন্ডন ত্যাগ করে দেশে ফিরে এলো। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে ভিনসেন্ট গুপিল কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিল। ভাবল, ছ'বছর পরে ছবির সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক ঘুচে গেল চিরদিনের জন্য। জীবনের দেবতা অলক্ষ্যে হাসলেন।

ছোট একটা বইয়ের দোকানে কিছু দিনের জন্য কাজ নিল ভিনসেন্ট। তার বাবার ইচ্ছা সে পাদ্রির চাকরির জন্য ট্রেনিং নেয়। ভিনসেন্টেরও আপত্তি নেই।

শুধু উরসুলার স্মৃতি তাকে মাঝে মাঝে অস্থির করে তোলে, কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ধরে এগিয়ে যাওয়া এখনো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার এত বড় ভালোবাসা যদি এমন করে ব্যর্থ হয়ে যায় তাহ'লে জীবনের মূল্য কি? হয়তো এখনো একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। উরসুলার বিয়ে হয়নি। যদি উরসুলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে তাহ'লে হয়তো এখনো আশা আছে।

ইংরেজী সংবাদপত্র সংগ্রহ করে ভিনসেন্ট একে একে কর্মখালি দেখে দরখাস্ত করে।

কোনো জবাব পাওয়ার আশা যখন ছেড়ে দিয়েছে তখন র‍্যাম্‌সগেট স্কুল থেকে এলো আমন্ত্রণ। র‍্যাম্‌সগেট লন্ডন থেকে সাড়ে চার ঘণ্টার পথ; সেখানকার স্কুলে তাকে পড়াতে হবে ফরাসী, জার্মান ও ডাচ। এ ছাড়া ছাত্রদের তদারকের ভারও তার উপর। কিন্তু বেতন নেই এক পয়সা; শুধু থাকা-খাওয়া নিয়ে কাজ করতে হবে। ভিন্‌সেন্ট এই শর্তে রাজী হয়ে চাকরি গ্রহণ করল। বেতন না থাক, উরসুলার সান্নিধ্য তো আছে।

প্রত্যেক শনিবার স্কুলের কাজ শেষ হলেই ভিন্‌সেন্ট লন্ডনের পথ ধরে। গাড়ির ভাড়া দেবার মতো পয়সা নেই; ইংলন্ডের কুয়াশাছন্ন শীতার্ত রাত্রিতে পথ চলে চলে সে এসে দাঁড়ায় উরসুলার বাড়ির সামনে। যদি উরসুলা পথে বের হয়, জানালা খুলে বাইরে তাকায়, তাহলে একটু দেখবার সুযোগ পাবে। সেই আশায় ভিন্‌সেন্ট দাঁড়িয়ে থাকে রাত্রির ঠাণ্ডা অগ্রাহ্য করে। একদিন তার আশা সফল হলো। সুসজ্জিত ভিক্টোরিয়া গাড়ির মধ্যে দেখতে পেল উরসুলাকে। আর এক ভদ্রলোকও বসে আছে তার গা ঘেঁষে। উরসুলার স্বামী। বিবাহের উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য তারা চলেছে গির্জায়।

আর তো ইংলন্ডে থাকবার প্রয়োজন নেই। ভিন্‌সেন্ট আহত কুকুরের মতো দেশে ফিরে এলো।

ভিন্‌সেন্টের জীবনে এই প্রথম নৌকাডুবি। বেদনার সমুদ্রে ডুব দিয়ে সে নতুন মানুষ হয়ে উঠল। সাত বছর পরে এই ঘটনার উল্লেখ করে তার ভাই থিওকে সে লিখেছিল: "জীবনতরীর পাল হচ্ছে প্রেম। বিশ বৎসর বয়সে পালে বড় বেশি হাওয়া লাগে; ফলে নৌকো কখনো একেবারে ডুবে যায়, কখনো বা আবার ভেসে উপরে ওঠে। আমার বিশ বছর বয়সের প্রেম কি রকম ছিল? ঠিক জানি না; কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রম ও কঠোর দারিদ্র্যের ফলে আমার প্রেমে দেহের আকর্ষণ ছিল খুবই কম।"

প্রেমের প্রতিদান পাওয়া যে কত দুর্লভ তরুণ বয়সে তা উপলব্ধি করে ভিন্‌সেন্ট সংসারে যা-কিছু সহজলভ্য তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। নিজে এমন মর্মান্তিক বেদনা পেয়েছে বলেই সকল মানুষের বেদনার প্রতি গভীর মমতা জাগত।

ছ'বছর ছবির জগতে থেকেও যখন তাকে কাজ ছেড়ে দিতে হলো তখন তো সন্দেহ নেই যে শিল্পচর্চা তার জীবনের পথ নয়। বাবার উপদেশ অনুসারে পাদ্রির চাকরির জন্য প্রস্তুত হবে বলে স্থির করল। সে ম্যাট্রিকুলেট নয়; আগে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে ধর্মযাজকের পাঠ নিতে হবে। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে ভিন্‌সেন্ট আমস্টার্ডাম গেল; কাকার বাড়ি থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। কিন্তু কিছু দিন পরে পড়াশুনার উপর সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। ধর্মের ছায়ায় নিজে শান্তি পাবে, অন্যকে সান্ত্বনা দেবে, এই উদ্দেশ্যেই সে পাদ্রি হতে চেয়েছিল। হাতে-কলমে পাদ্রির কাজ পেলে তার ভালো লাগত। কিন্তু তা কোথায়? দিনের পর দিন কেবল গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রুর

ব্যাকরণ মুখস্থ করা। পনেরো মাস পড়েও সে যখন ম্যাট্রিকুলেশানের পাঠ আয়ত্ত করতে পারল না তখন পাশ করবার আশা ত্যাগ করে বাড়ি চলে গেল। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে বড়দিনের সময় খ্রীস্টের সেবাব্রত গ্রহণের যে আকাঙ্ক্ষা ভিন্‌সেন্টের ছিল তা সফল হলো। তার বাবার তাগিদে মিশনারি সোসাইটি ভিন্‌সেন্টকে দক্ষিণ-বেলজিয়ামের কয়লা-খনি অঞ্চল বরিনেজে পরীক্ষামূলক ভাবে পাঠাতে আপত্তি করল না। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা না পর্যন্ত ভিন্‌সেন্ট এক পয়সাও বেতন পাবে না। বাবার কাছ থেকে কিছু মাসোহারার ভরসা পেয়ে ভিন্‌সেন্ট বেরিয়ে পড়ল নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে।

বরিনেজের খনির শ্রমিকদের শ্রীহীন নগ্ন দারিদ্র্য ভিন্‌সেন্টকে অভিভূত করল। ওরা সূর্যের আলো দেখতে পায় না, সারা দিন মাটির নিচে কয়লা কাটে, তবু অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, রোগে ওষুধ নেই। তার উপর আছে মালিকদের অত্যাচার। এমন রিক্ত ও দুঃখক্লিষ্ট সমাজের মধ্যে এসে ভিন্‌সেন্ট নিজের বেদনা ভুলে গেল; মনে হলো এদের চেয়ে ভালো থাকাটা অপরাধ। একটি মোটা কোট রেখে আর সব জামা সে বিলিয়ে দিল; নিজের তক্তপোশটা দিয়ে দিল একজন রোগীকে; কুলিদের একটা অন্ধকূপ কুটিরে খড় বিছিয়ে শুয়ে থাকে রাত্রিতে। দু'টুকরো পোড়া রুটি খায় খনির মজুরদের মতো। যে সব ছেলেমেয়েরা এখনো খনিতে নামবার মতো বড় হয়নি তাদের জন্য একটা স্কুল খুলেছে ভিন্‌সেন্ট; পাড়ায় পাড়ায় রোগীর অভাব নেই; তাদের সেবার ভারও সে তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। শ্রমিকদের দাবি জানাবার জন্যও তাকেই যেতে হয় মালিকদের সঙ্গে কথা বলতে। শ্রমিকদের মনে হয় বাইবেলের পৃষ্ঠা থেকে যীশু বুঝি উঠে এসেছেন তাদের মধ্যে। তার কাজের যশ মিশনারি সোসাইটি শুনতে পেয়েছে। সোসাইটি স্থির করল এবার ভিন্‌সেন্টকে স্থায়ী ভাবে পাদ্রির কাজ দেওয়া যেতে পারে। তদন্তের জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে লোক পাঠানো হলো বরিনেজে। তদন্তের ফল হলো উলটো। ভিন্‌সেন্টের ছেঁড়া ময়লা পোশাক, অতি হীন জীবনযাত্রা পাদ্রির পদমর্যাদার বিরোধী। খনির মালিকরাও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল শান্তিভঙ্গকারী হিসেবে। সুতরাং মিশনারি সোসাইটি তার সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করল। ভিন্‌সেন্ট যদি তখনো তার জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে সম্মত হতো তাহলেও আশা ছিল। সে যীশুর শিক্ষা গ্রহণ করেছে, চার্চের শিক্ষার সঙ্গে তার মিল নেই। মা দুঃখ করে থিওর কাছে লিখলেন, "ভিন্‌সেন্ট খনির মজুরের মতো না থেকে যদি আর পাঁচজন পাদ্রির মতো বাস করতে রাজী হতো তাহলেই কাজটা পেয়ে যেত। কিন্তু ওর স্বভাব আর বদলালো না। একগুঁয়েমির জন্য সব মাটি হলো।"

আবার বাড়ি এসে বসল ভিন্‌সেন্ট। আত্মীয়স্বজন সবাই হতাশ হয়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে। যে কাজে যায়, সে কাজেই যে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে; তাকে দিয়ে কি হবে? তবু অযাচিত ভাবে অনেকে এসে অর্থোপার্জনের পথের সন্ধান দিয়ে যায়।

ভিন্‌সেন্ট শোনে, কান দেয় না। সে মনে মনে উপলব্ধি করে তার একটা বিশেষ কিছু করবার আছে ; কিন্তু তা যে কি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। জীবনের কোন এক অন্ধ শক্তি কর্মহীনতার খাঁচায় জোর করে বেঁধে রেখেছে ভিন্‌সেন্টকে। কাজের মধ্যে তার মুক্তি ; কিন্তু কোন্ কাজ ?

পাদ্রির অবৈতনিক কাজ ছাড়বার পরও ভিন্‌সেন্ট বরিনেজের খনি অঞ্চলে কিছু দিন ছিল। সারা দিন অবসর ; বসে বসে কলম দিয়ে, পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর ছবি আঁকে। খনির মজুরদের ছবি, সেখানকার নানা দৃশ্যের ছবি। মজুরদের উপর ছিল তার গভীর সহানুভূতি। তার ছবি কাঁচা হতের ; ছবির রেখা, আলো-ছায়ার প্রক্ষেপ—কিছুই হয়তো শিল্পরীতি-সম্মত নয়। কিন্তু রেখায় রেখায় দরদ ফুটে ওঠে, তাই কাঁচা ছবিও ভিন্‌সেন্টের কাছে উজ্জ্বল মনে হয়। ভিনসেন্ট পাঠশালায় পড়বার সময় খাতায় ড্রইং করত, ছাত্রবন্ধুরা সপ্রশংস দৃষ্টি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু ছবি আঁকা হবে তার জীবনের পথ, এমন কথা ভিন্‌সেন্ট কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি। একে একে জীবনের আর সবগুলো পথ যখন রুদ্ধ হয়ে গেল তার কাছে তখন বরিনেজের নিঃসঙ্গতায় স্কুলের খাতা থেকে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো ছবি এসে দাঁড়াল তার পাশে। ভিন্‌সেন্ট সাগ্রহে তাকে জড়িয়ে ধরল। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে উরসুলা কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। এখন থেকে ছবির জগৎই হোক তার জগৎ। আর দ্বিধা নয়, ভিন্‌সেন্ট এবার নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে। যত বেদনা, যত ব্যর্থতাই আসুক্ এই পথ ধরেই সে চলবে। সাতাশ বছর বয়সে ভিন্‌সেন্ট তার জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলো।

থিওকে জানাল তার লক্ষ্যের কথা। থিও ভিন্‌সেন্টের চেয়ে চার বছরের ছোট। ভিন্‌সেন্টই তাকে গুপিল কোম্পানিতে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সে ব্যর্থ হয়ে চাকরি ত্যাগ করল, কিন্তু ছোট ভাই দিন দিন উন্নতি করে চলেছে। ক' বছরের মধ্যেই থিওর পদমর্যাদা ও বেতন আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। দু'ভাই জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। ভিন্‌সেন্ট একটি চিঠিতে লিখছে : "আমি যখন তলিয়ে যাচ্ছি, তুমি তখন উপরে উঠছ ; আমার বন্ধুরা একে একে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে ; তুমি পাচ্ছ নতুন নতুন বন্ধু।"

থিও ভিন্‌সেন্টের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করল। প্রকৃতপক্ষে কয়েক বছর আগেই থিও ভিন্‌সেন্টকে আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে বলেছিল। ভিন্‌সেন্ট তখন সে কথা কানে তোলেনি। ভিন্‌সেন্ট একদিন বড় শিল্পী হতে পারবে, থিওর ছিল এই আন্তরিক বিশ্বাস। তাই সে সানন্দে ভিন্‌সেন্টকে আর্থিক সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিল। এই প্রতিশ্রুতির অর্থ যে কী তা সেদিন কেউ বোঝেনি। ভিন্‌সেন্ট যত দিন বেঁচে ছিল তত দিন পর্যন্ত থিওকে তার ভার বহন করতে হয়েছে। জীবিত কালের মধ্যে ভিন্‌সেন্ট শিল্পের সাহায্যে কখনো স্বাবলম্বী হতে পারেনি। থিও অবশ্য কোনো দিন সেজন্য দুঃখ করেনি, দাদার শিল্প-প্রতিভার উপর ছিল তার গভীর আস্থা।

ভিন্‌সেন্টের প্রথম স্টুডিও হলো এক খনির মজুরের বাড়িতে। ছোট একটি ঘর,—তার মধ্যে বাড়িওয়ালার ছেলে ও সে থাকত। আলো আসবার যথেষ্ট পথ ছিল না ; তবু সেই প্রায়ান্ধকার গর্তের মতো ঘরে বসে বসে ভিন্‌সেন্ট খনির ছবি আঁকত। সে সময়কার আঁকা ছবির দু'-একখানার বেশি নিদর্শন পাওয়া যায় না। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি 'যারা বোঝা বয়।' কয়েকজন স্ত্রীলোক কয়লা-বোঝাই বস্তা পিঠে করে ধীরে ধীরে পথ চলছে, বোঝার ভারে তাদের দেহ নুয়ে পড়েছে—এই হলো ছবির বিষয়বস্তু। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ছবি-আঁকা শেখবার আসায় ভিন্‌সেন্ট ব্রাসেলস্‌ এলো। থিওর সাহায্যে উদীয়মান শিল্পী র‍্যাপার্ড-এর সঙ্গে পরিচয় হলো। র‍্যাপার্ড-এর কাছেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্পচর্চায় ভিন্‌সেন্টের প্রথম হাতেখড়ি। বেশি দিন সেখানে শেখা হলো না। কারণ ব্রাসেল্‌স-এ থাকবার মতো টাকা নেই। ভিন্‌সেন্ট বাবার কাছে ফিরে এলো।

ভিন্‌সেন্ট ফিরে এলো নিজের সাফল্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে। শীগ্‌গিরই একদিন তার ছবি বাজারে বিক্রি হবে, টাকার জন্য পরাধীন হয়ে থাকতে হবে না, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে এসেছে। এই আশার পটভূমিকায় পরিচয় হলো তার বিধবা মামাত বোন 'কে'-এর সঙ্গে। বয়সে তরুণী, একটি ছেলে কোলে করে বিধবা হয়েছে। বাড়িতে মা-বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। সুতরাং ভিন্‌সেন্টের সারা দিনের সঙ্গী হলো 'কে'। দিন-রাত্রির সাহচর্যের ফলে ভিন্‌সেন্ট তার প্রতি আকৃষ্ট হলো গভীর ভাবে। ভিন্‌সেন্ট নিজেই লক্ষ্য করেছে তার ছবির রেখাগুলি যেন কর্কশ, মূর্তিগুলি রুক্ষ। যদি জীবনে একটি নারীর প্রেমস্পর্শ পায় তাহলে তার ছবি কোমল হবে, লাবণ্যময় হবে, মূর্তির লালিত্য ফুটে উঠবে। যদি 'কে' আসে তাহলে শুধু জীবন সফল হবে না, সার্থক হবে তার সকল শিল্প-প্রচেষ্টা।

ভিন্‌সেন্ট একদিন প্রস্তাব করল। 'কে' তখনো তার মৃত স্বামীর স্মৃতির মধ্যে ডুবে আছে। অন্য কোনো পুরুষের কথা ভাবতেও পারে না। ভিন্‌সেন্টের কথা শুনে সে চমকে চীৎকার করে উঠল, না, না, কখনো না ; এ হতে পারে না।

ভিন্‌সেন্ট দমল না। সুদৃঢ় আশাবাদ তাকে ব্যর্থতার আশঙ্কা সম্বন্ধে অন্ধ করেছে। স্পষ্ট করে 'না' বলা সত্ত্বেও বার বার উত্যক্ত করায় 'কে' ওদের বাড়ি ছেড়ে আমস্টার্ডাম চলে গেল। ছেলের ব্যবহারে মা-বাবা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। বাবার সঙ্গে ভিন্‌সেন্টের এই ব্যাপার নিয়ে গভীর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হলো। 'কে' যে একদিন মত বদলাবে সে বিষয়ে ভিন্‌সেন্ট নিশ্চিত। সে চিঠি লেখে। 'কে' না পড়েই চিঠি ফেরৎ পাঠায়। তবু আবার চিঠি লেখে ভিন্‌সেন্ট।

শেষ বোঝাপড়ার জন্য থিওর কাছ থেকে ভাড়ার টাকা চেয়ে ভিন্‌সেন্ট আমস্টার্ডাম গেল। তখন রাত হয়েছে, পরিবারের সবাই খেতে বসেছে, শুধু 'কে' নেই সেখানে। মামা বললেন, 'কে' বাইরে একটা কাজে গেছে। ভিন্‌সেন্ট বুঝল তার আসার সংবাদ পেয়েই 'কে' ভিতরে গিয়ে আত্মগোপন করেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, অনেক

অনুরোধ করেও যখন 'কে'-র দেখা পেল না তখন ভিনসেন্ট উঠে গিয়ে দাঁড়াল বাতিদানের কাছে। মোমবাতির শিখার উপর হাত রেখে সে বলল, আগুনে যতক্ষণ হাত রাখতে পারা যায় শুধু ততক্ষণের জন্য 'কে'-র সঙ্গে কথা বলতে চাই। দয়া করে ওকে ডেকে দিন।

আগুনের শিখায় তার হাতের চামড়া প্রথম কালো হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে কালো চামড়া হলো লাল। মামা-মামী কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে এই অবাক্ দৃশ্য দেখছিলেন। চেতনা ফিরে আসতেই মামা ছুটে এসে এক ফুঃ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিলেন। তবু 'কে' এলো না। পোড়া হাত আর পোড়া মন নিয়ে শীতক্লিষ্ট রাত্রিতে অন্ধকার রাজপথে এসে দাঁড়াল ভিনসেন্ট। তার মামা ভেবেছিলেন সে পাগল হয়েছে। হয়তো তাই। 'কে' যেন তার জীবনের প্রতীক; তার কাছে রয়েছে ভিনসেন্টের জীবন-কাঠি। যেখানে 'কে' নেই, সেখানে জীবন নেই। আহত জন্তুর মতো বাঁচবার জন্য সে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়েছে। সেই সংগ্রামের প্রেরণা তাকে উন্মাদ করেছে। 'কে' তার জীবনে না এলে সে বাঁচবে কি করে?

ভিনসেন্ট বাড়ি ফিরেও শান্তি পেল না। 'কে'-র সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, সেজন্য তো বাবা ক্রুদ্ধ হয়েই ছিলেন,। তার উপর গির্জায় উপাসনার জন্য যায় না বলে নতুন করে তিক্ততার সৃষ্টি হলো। ধর্মভীরু পিতা পুত্রকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করলেন। ভিনসেন্ট থিও-র আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে হেগ নগরে এলো শিল্পচর্চার জন্য। তখনকার খ্যাতনামা শিল্পী মভ্ ওদের আত্মীয়; তিনি প্রথমে ভিনসেন্টকে খুব উৎসাহ দিলেন, নিজের হাতে শিখিয়ে দিলেন দু'-একটা নতুন টেকনিক।

স্টুডিও সাজিয়ে বসল ভিনসেন্ট। থিওকে লিখল, "কাজ তো আরম্ভ করছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি প্রবল বিরুদ্ধ স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে হবে। সে স্রোত হয়তো উঠবে আমার গলা পর্যন্ত, অথবা তারও উপরে। কিন্তু আমি জয়ী হবো।"

হেগ্-এর প্রবীণ শিল্পীদের সঙ্গে একে একে পরিচয় হলো। কেউ তুলি ধরবার কৌশল সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, কেউ দেয় রঙ্ প্রয়োগের শিক্ষা, কেউ বা তার ছবির সমালোচনা করে। এক তাড়া স্কেচ্ ও ড্রইং হাতে করে ভিনসেন্ট ছবির দোকানে দোকানে ঘোরে; দোকানদার উলটে-পালটে দেখে, তার পর মুখ গম্ভীর করে বলে, এ চলবে না। তবু ভেঙে পড়ে না ভিনসেন্ট। কাজ করে যায় অক্লান্ত ভাবে।

মডেল সংগ্রহ করতে পারলে ফিগার আঁকার হাত ভালো হবে, এই ছিল ভিনসেন্টের বিশ্বাস। কিন্তু মডেলকে দেবার মতো অর্থের সংস্থান নেই তার। তবু সে আশা ছাড়ে না। সস্তা মডেল খুঁজতে খুঁজতে একদিন সে পেয়ে গেল ক্রিস্টিয়েনকে। সংক্ষেপে ভিনসেন্ট তাকে বলত সিয়েন। সে সুন্দরী নয়, মুখে বসন্তের দাগ, শরীরে লাবণ্যের ছোঁয়া নেই এতটুকু, চোখে-মুখে দুঃখক্লিষ্ট জীবনের গভীর ছাপ। এমন কি, তার যৌবনও অতিক্রান্ত। ধীরে ধীরে ত্রিশ বৎসর বয়স্কা মেয়েটি মডেলের চেয়েও বেশি

হয়ে উঠল। সিয়েন ঘরের সব কাজ করে, ভিন্‌সেন্টকে যখন তখন কফি করে দেয়, আবার প্রয়োজনের সময় মডেল হয়ে শিল্পীর সামনে বসে। ভিন্‌সেন্ট তাকে পেয়ে খুশি ; সিয়েনও আশ্রয় পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সিয়েন অনেক দিন থেকেই দেহ বিক্রয় করে উপার্জন করত। কোন্ এক অপরিচিত অতিথি অসতর্ক মুহূর্তে সন্তান রেখে গেছে তার গর্ভে। তাই সিয়েনের এমনি আশ্রয়ের বড় প্রয়োজন ছিল। ভিন্‌সেন্ট সিয়েনের সকল ইতিহাস জেনেও তাকে আশ্রয় দিয়েছে। থিওকে লিখল যে, সমাজের কাছ থেকে এত অত্যাচার পেয়েছে বলেই সিয়েন আকৃষ্ট করেছে তাকে। ভিন্‌সেন্ট সর্বহারাদের শিল্পী ; তার ছবির নায়ক-নায়িকা চাষী, মজুর, দুঃস্থ, নিপীড়িত মানুষ। নিজেও সে বেদনা কম পায়নি ; তাই দুঃখীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি বড় কারণ ছিল। 'কে'-র বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে এসে থিওর কাছে ভিন্‌সেন্ট লিখেছিল ঃ "আদর্শ প্রেমে আমার আর বিশ্বাস নেই ; ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা হারিয়েছি ; জীবন শূন্যতায় ভরে গেছে। আমি একটু ভালোবাসা চাই, একটি মেয়ের উষ্ণ স্পর্শ চাই ; তা না হলে আমি যে ফুরিয়ে যাবো, ধ্বংস হয়ে যাবো, বরফের স্তূপের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবো।"

যারা সুন্দরী, শিক্ষিতা, সভ্যসমাজের এক জন, তারা কেন আসবে এই সম্বলহীন চিত্রবিদ্যার শিক্ষানবিসের কাছে ? সিয়েন এবং তার মতো মেয়েরাই তো আসবে! ভিন্‌সেন্ট সাদরে, সর্বান্তঃকরণে সিয়েনকে গ্রহণ করল। কিন্তু পরিচিত মহলে উঠল নিন্দার ঝড়। তার শুভানুধ্যায়ী মভ এবং অন্য সব প্রবীণ শিল্পীরা ভিন্‌সেন্টকে ত্যাগ করল চরিত্রহীনতার অপবাদে। পতিতালয়ে তো অনেকেই যায়, কিন্তু পতিতাকে সঙ্গিনী করে ধিক্কৃত জীবন যাপন করে ক'জন ? ভিন্‌সেন্ট বোঝাতে চায় সে সিয়েনকে ভালোবাসে, ছেলে হয়ে গেলে ওকে বিয়ে করবে। যেখানে প্রেম নেই পাপ তো সেখানে ; তাদের মধ্যে প্রেম আছে, পাপ নেই।

ভিন্‌সেন্ট নিজে না খেয়ে সিয়েনকে ওষুধ এনে দেয়, ভালো খাবার দেয়। হাসপাতালে ছুটোছুটি করা, ডাক্তারের জন্য টাকা সংগ্রহ করা প্রভৃতি সে করেছে আনন্দের সঙ্গে। হাসপাতাল থেকে মা ও ছেলেকে নিয়ে এলো নিজের ঘরে। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করল। ছিল সে একা, এখন হলো তিন জন। সম্বল তো থিওর সেই নির্দিষ্ট মাসোহারা। অবশ্য প্রয়োজনের সময় যখনই অতিরিক্ত অর্থ চেয়েছে, থিও পাঠাতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু সেই প্রয়োজনকে তো আর দৈনন্দিন করে তোলা যায় না ? তাই মাসের শেষের দিকে কয়েক দিন উপবাসে থাকতে হয় ভিন্‌সেন্টকে। দেনাও হয়েছে অনেক। একজন পাওনাদার এক দিন বাড়ি এসে ঘুষি দিয়ে ওর নাক ফাটিয়ে দিয়ে গেল।

সিয়েন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। ভিন্‌সেন্ট সিয়েনকে ও তার বাচ্চা ছেলেকে মডেল করে ছবি আঁকে। 'দুঃখ' ছবির মডেলও সিয়েন। কিন্তু এখন অনড় হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মডেল সাজতে তার বিরক্তি বোধ হয়। এর উপর ভিন্‌সেন্ট তাকে

পেট পুরে খেতে দিতে পারে না, ভালো একটা পোশাক পরেনি কত দিন! ভিন্‌সেন্ট যদি তুলি, রঙ, আর ক্যানভাস্ কিনে পয়সা নষ্ট না করে তাহলে খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না। ভিন্‌সেন্টের চোখ বিস্ফারিত হয়। তুলি, রঙ্ আর ক্যানভাস্ নিয়ে সে খিদে ভুলে থাকতে পারে, বেদনা ভুলে যেতে পারে। তার ছবি কেউ প্রশংসা করে না, বাজারে একখানাও বিক্রি হয় না। তবু ছবি তার একমাত্র সান্ত্বনা। ছাই-চাপা আগুনের মতো হতাশার নিচে আছে তার সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস,—একদিন সে বড় হবে। ছোট ভাই থিওকে সে বলে: "তুমি আমাকে যে টাকা দিচ্ছ তা লাভের লগ্নী হয়ে থাকছে; একদিন আমার ছবি থেকে এর চেয়ে ঢের বেশি টাকা উঠে আসবে।"

সেই ছবির নেশা কেমন করে ছাড়বে ভিন্‌সেন্ট? সে আর সব ত্যাগ করতে পারে, সিয়েনকে হারাতে পারে, কিন্তু ছবির নেশা ত্যাগ করতে পারবে না। সিয়েনের দেহ সবল হয়ে উঠেছে, এখন আর আশ্রয়ের তেমন প্রয়োজন নেই। সন্ধ্যা হলেই তার রক্তে জেগে ওঠে অন্ধকার পথের আহ্বান। এত কষ্ট স্বীকার করে কেন পড়ে থাকবে ভিন্‌সেন্টের সঙ্গে? অন্ধকার পথের অপরিচিত পুরুষের পকেটে শোনা যায় টাকার ঝন্‌ঝন্। সিয়েন সপুত্র বেরিয়ে গেল ভিন্‌সেন্টের ঘর থেকে, উঠল গিয়ে কোনো একটা পতিতালয়ে। ভিন্‌সেন্ট বাধা দিল না, একটি কথাও বলল না। কি হবে? উরসুলা ফিরিয়ে দিয়েছে, 'কে' অপমানিত করেছে; সমাজের নিম্নতম স্তরের রিক্ত মেয়েটিকেও সে ধরে রাখতে পারল না। ধরে রাখবার মতো কোনো গুণ নেই তার। নিজের এই দীনতার লজ্জায় ভিন্‌সেন্ট মুখ ঢাকল।

হেগ্ আর ভালো লাগে না। পল্লী-অঞ্চলের কতকগুলি ছবি আঁকবার ইচ্ছা হলো। এত দিনে বাবার সঙ্গে একটা মিট্‌মাট হয়েছে। তাই ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাবার কাছে গেল ভিন্‌সেন্ট। তখন তার বাবা আছেন ব্র্যাবান্টের অন্তর্গত নুনেন-এ। এখানেও বেশি দিন শান্তিতে থাকতে পারল না ভিন্‌সেন্ট। নুনেনে আসবার অল্প দিন পরেই গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে মা পা ভেঙে ফেললেন। ভিন্‌সেন্ট এমন অনলস ভাবে মা'র সেবা করতে লাগল যে, লোকে বিস্মিত হয়ে গেল। এ সময় ভিন্‌সেন্টের পরিচয় হলো প্রতিবেশিনী মার্গটের সঙ্গে। মার্গট চল্লিশ বৎসরের অবিবাহিতা প্রৌঢ়া রমণী, ভিন্‌সেন্টের চেয়ে প্রায় দশ বৎসরের বড়। নুনেন-এর নিঃসঙ্গ জীবনে মার্গট হলো তার প্রতিদিনের সঙ্গী। ভিন্‌সেন্ট যেখানে ছবি আঁকতে যায়, সে-ও সঙ্গী হয়। তুলির টানে ক্যানভাসের উপর ছবি ফুটে ওঠে, মার্গট নীরবে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এবার ভিন্‌সেন্ট সাবধান হয়ে গেছে; মার্গটকে সে দূরে-দূরেই রাখে। কিন্তু মার্গটই এলো এগিয়ে, জানালো তার ভালোবাসা। নিজের বেদনা ও অপমানের কথা স্মরণ করে মার্গটের জন্য বড় মমতা হলো; ভিন্‌সেন্ট স্বীকৃতি দিল তার ভালোবাসাকে। মার্গট তার চল্লিশ বছরের কুমারী-জীবনের ভার আর বইতে পারছিল না। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সে কাউকে ভালোবাসবার সুযোগ পায়নি, অন্য কেউ তাকে ভালোবাসেনি। এখন তার জীবন

সার্থক হলো, এবার মরতে দুঃখ নেই। বিয়ের প্রস্তাবে মার্গটের বাড়ি থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠল ; কিছুতেই বিয়েতে সম্মতি পাওয়া গেল না। চরম হতাশায় জ্ঞানশূন্য হয়ে মার্গট বিষ পান করল। প্রথম তো অনেকে সন্দেহ করল ভিনসেন্টই বিষ খাইয়েছে। মার্গট বেঁচে উঠল, কিন্তু নুনেন থেকে দীর্ঘকালের জন্য বাইরে চলে গেল স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। ভাগ্য আর একবার পরিহাস করল ভিনসেন্টের সঙ্গে।

নুনেন আসবার পূর্বে ভিনসেন্ট থিওকে সত্যদ্রষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তার মতো লিখেছিল ঃ প্রথম জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছি যার ফলে আমি দীর্ঘায়ু হবো না। হয়তো বড় জোর আর আট বছর বাঁচব। সুতরাং আমার যা কিছু কাজ বছর পাঁচেকের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

এ কথা সব সময়ই মনে ছিল ভিনসেন্টের। তাই সে নুনেন-এ অক্লান্ত ভাবে ছবি এঁকেছে। চাষী-মজুরদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি, গ্রামের দৃশ্যচিত্র। এ সময়কার অনেকগুলি ছবিই পরবর্তীকালে ভিনসেন্টের শ্রেষ্ঠ ছবির অন্তর্গত বলে স্বীকৃত হয়েছে।

ভিনসেন্টের চরিত্রের মধ্যে একটা অস্থিরতা ছিল। এক পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘকাল সে থাকতে পারে না। শহর পুরনো হয়ে উঠলে যায় গ্রামে ; গ্রামে কিছু দিন থাকবার পর শহরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। নুনেনও তার কাছে শীগ্‌গিরই পুরনো হয়ে গেল। ১৮৮৫ সালের নভেম্বর মাসে ভিনসেন্ট বাড়ি ছাড়ল ; আর কখনো নুনেন-এ ফিরে আসেনি।

এলো অ্যান্টোয়ার্প। মডেল থেকে আঁকবার সুযোগ পাবে বলে স্থানীয় শিল্প-অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হলো। এখানে যত দিন ছিল তত দিন মডেল থেকে শুধু মানুষের মূর্তি এঁকেছে। নিজের ছবি আঁকবার ঝোঁকও এখান থেকেই হয়েছে। ভিনসেন্ট চাষী-মজুরদের ছবি আঁকতে ভালোবাসত, নিজেকেও তাদেরই একজন বলে মনে করত। কিন্তু তার চেহারা থেকে মধ্যবিত্তের ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ে। এইটে ছিল ভিনসেন্টের দুঃখ। আন্টোয়ার্পে একবার তাকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হয় ; ডাক্তার তার চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি বুঝি কামারের কাজ করো ?"—বড় আনন্দ হলো ভিনসেন্টের। কামার-কুমোর, মিস্ত্রি-মজুরের ছবি এঁকে এঁকে সে-ও তাদের মতো রূপান্তরিত হয়েছে, এখন আর তাকে মধ্যবিত্ত ঘরের বলে চেনা যায় না। যাদের ছবি সে আঁকে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। নিজের এই রূপান্তরকে ছবিতে ধরে রাখবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল ভিনসেন্ট। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ছবি আঁকে।

থিও টাকা পাঠায় নিয়মিত ভাবে। মাঝে মাঝে অতিরিক্ত টাকা চেয়ে আনতে হয়। হয়তো দু'দিন উপোস করে আছে, টাকা এলো থিওর কাছ থেকে—সেই টাকা নিয়ে খাবারের সন্ধানে যায় না ; যায় মডেল, তুলি, রঙ আর ক্যানভাসের খোঁজে। এক কাপ কফি এবং এক টুকুরো রুটি খেয়ে সে দিন কাটিয়ে দেয়। ছবিতে হাত দিলে ক্ষুধা-

তৃষ্ণা থাকে না। ভিনসেন্ট থিওকে লিখছে ঃ "লোকে আমাকে পাগল বলে। তারা জানে না যে এ কী নেশা!"

শিল্প-অ্যাকাডেমিতে ভিনসেন্ট বেশি দিন থাকতে পারল না। সেখানকার যুক্তিহীন কঠোর নিয়ম-কানুন সুষ্ঠু শিল্পচর্চার পরিপন্থী। থিও বয়সে ছোট হলেও ভিনসেন্টের অভিভাবকের মতো। তার সকল ব্যয় বহন করে, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দেয়। অবশ্য থিও ভিনসেন্টের ইচ্ছাকে সব সময়ই সম্মান করেছে। এবার কিন্তু ভিনসেন্ট তার ভবিষ্যৎ নিজের হাতেই তুলে নিল। থিওর সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সে চলে এলো প্যারিস। উঠল থিও-র বাসায়।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস। দশ বছর পরে ভিনসেন্ট প্যারিস এসেছে। প্যারিস পৃথিবীর সকল দেশের শিল্পীদের স্বর্গ। কত মিউজিয়াম, ছবির দোকান, ছবি আঁকার স্কুল; আর, বিভিন্ন মতবাদের কত শিল্পীর ভিড়! গুপিল কোম্পানির প্রভাবশালী কর্মী হিসেবে থিও-র সঙ্গে প্রায় সকল নামকরা শিল্পীর পরিচয়। সেই সূত্রে ভিনসেন্টের পরিচয় হলো গগ্যাঁ, সিজানে, দেগা এবং নিও-ইম্প্রেশানিস্ট দলভুক্ত শিল্পীদের সঙ্গে। জোলা প্রমুখ সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ হলো। এই পরিচয়ের ফলে ভিনসেন্ট তার শিল্পচর্চার একটা আদর্শ লাভ করল। যা সত্য তাই সুন্দর, আপাত দৃষ্টিতে ঘৃণিত মনে হলেও। মনোরম মিথ্যার চেয়ে রূঢ় সত্য বেশি সুন্দর। বেদনাও সুন্দর, কারণ বেদনা মানুষের গভীরতম অনুভূতি। শিল্পীর চোখে পতিতা ও রানী সমান। যেখানে সত্য, সেখানেই সুন্দরের আসন।

ভিনসেন্ট প্রথমেই ভর্তি হলো একটি ছবির স্কুলে। প্যারিসের নতুন শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে শিল্প-পদ্ধতি নিয়ে সব সময়ই আলোচনা চলে। প্যারিসের শিল্পীরা তার ছবির প্রশংসা করেনি। বরং তার রঙ প্রয়োগের সমালোচনা করেছে। তার রঙ 'জ্বলজ্বলে' নয়, ছবির উপরে যেন একটা কালো কুয়াশার পর্দা পড়ে থাকে। বন্ধুদের পরামর্শে ভিনসেন্ট উজ্জ্বল চড়া রঙ ব্যবহার করে ছবির প্রকৃতি বদলে দিল। যে যে-ভাবে পরামর্শ দেয় সে ভাবেই ভিনসেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। তবু সাফল্য কই? তার ছবি দোকানে বিক্রি হয় না, তার শিল্পকর্মের সমালোচনা কোনো কাগজে বের হয় না! বর্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আশার ইঙ্গিত নেই। তেত্রিশ বছর পার হয়ে গেল, পরিণতি আসবে কবে? থিও বলল, তুমি সর্বনাশ করছ, অন্য কারো কথা শুনে ভুল পথে যেও না। তুমি শুধু তোমার মতো করেই ছবি আঁকো। অন্যের পথ তো তোমার পথ নয়।

এ কথার সত্যতা ভিনসেন্ট উপলব্ধি করতে পারল। থিও-র ফ্ল্যাটে তরুণ বিখ্যাত শিল্পীদের নিত্য জমায়েত। মাত্রাহীন চীৎকার ও বিশৃঙ্খল আচরণে শান্ত-স্বভাব থিও রাত্রিতে ঘুমোতে পারে না, সারা রাত বিছানায় ছট্‌ফট করে। ভিনসেন্টের স্বভাবের এমন কতকগুলি ত্রুটি ছিল যার জন্য থিও বিরক্তি বোধ করত, লজ্জিত হতো। এই নিয়ে দু' ভাই-এর মধ্যে মাঝে মাঝে কলহ আরম্ভ হলো। দু'জনেরই মনে হলো এক

বাড়িতে না থাকাই ভালো।

থিও তার বোনকে এ সম্বন্ধে এক চিঠিতে লিখছে: "বাড়ি অসহ্য হয়ে উঠেছে। সর্বদা ঝগড়া-ঝাঁটি চলছে বলে বন্ধুরা কেউ আসতে চায় না। ভিনসেন্ট নিজেই বলেছে সে অন্য কোথাও চলে যাবে; আমি নিজের মুখ থেকে তো আর চলে যাবার কথা বলতে পারি না! আমার একমাত্র কামনা স্বভাবের দোষে ও নিজের ক্ষতি যেন ডেকে না আনে। ভিনসেন্টের মধ্যে দু'টি মানুষ বাস করে; একটি প্রতিভাবান শিল্পী ও অনুভূতি-প্রবণ ভদ্র ব্যক্তি; অন্য জন গর্বিত ও কঠোর-হৃদয়। কোন্ মুহূর্তে কাকে যে দেখতে পাবে ঠিক নেই। তোমরা হয়তো বলবে ভিনসেন্টকে আর একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করা উচিত নয়, তাহলেই সে আত্মনির্ভর হবে। ওর মধ্যে যদি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হবার সম্ভাবনা না থাকত তাহলে ওর সঙ্গে আমি সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতাম। কিন্তু স্পষ্ট সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছি বলেই শেষ পর্যন্ত ভিনসেন্টের সকল দায়িত্ব বহন করব বলে স্থির করেছি।"

থিও-র উপর অভিমান করে একদিন ভিনসেন্ট স্থির করল নিজে বাসা ভাড়া করবে। কিন্তু তার জন্য টাকা চাই। কয়েকখানি ছবি পকেটে করে সে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াল। অপরিচিত শিল্পীর ছবি কেউ নিতে চায় না, ভিনসেন্টের নাম তারা শোনেনি। শুধু একজন দোকানী মাত্র পাঁচ ফ্রাঁ দিয়ে একটি ছবি কিনল। ভিনসেন্ট তাতেই খুশি। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে, অন্ধকার গলির মুখে একটি নিশাচর মেয়ে নতুন শিকারের আশায় তার সামনে এগিয়ে এলো। মেয়েটির ক্ষুধিত মুখ তাকে যেন চাবুক মারল। তার এত কষ্টের, এত গর্বের পাঁচ ফ্রাঁ মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

১৮৮৬-'৮৭ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে ভিনসেন্ট এক রেস্তোরাঁয় তার কয়েকখানি জাপানী কাঠখোদাই-র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। অপরিচিত নতুন শিল্পীদের সম্বন্ধে প্রচার ও তাদের ছবি বিক্রির ব্যবস্থা যে কী কঠিন, ভিনসেন্ট তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। তাই সে পরিকল্পনা করল নতুন শিল্পীদের নিয়ে একটা সমবায় সমিতি গড়বে; এই সমিতি সভ্যদের ছবির প্রদর্শনী করবে, ছবি বিক্রির ব্যবস্থা করবে, দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য করবে, ইত্যাদি। য়ুরোপের সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল এই প্রস্তাবে। থিও উৎসাহ দেখাল। সমিতি সংগঠনের কাজে ভিনসেন্ট কিছুদিন আর সব কিছু ভুলে গেল। হঠাৎ একদিন খেয়াল হলো এ কী করছে সে? শিল্পী তো শুধুই ছবি আঁকবে; অন্য কাজ করতে গেলেই সে আর শিল্পী রইলো না। হোক্ না সে শিল্পের উন্নতির জন্য, তবু পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া আর কী? ভিনসেন্ট সমিতি গড়বার পরিকল্পনা ত্যাগ করল। প্যারিসও আর ভালো লাগছে না। সে চাষী-মজুরের ও মুক্ত প্রকৃতির শিল্পী। শহরের বদ্ধ আবহাওয়ায় তার ছবি খুলবে না। ভাবল, আফ্রিকা যাবে। উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে অপরূপ রঙ্ ঝরে; সেই রঙ সে ধরে আনবে ক্যানভাসে।

একদিন সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটে ফিরে থিও এক টুকরা কাগজ থেকে ভিনসেন্টের প্যারিস ত্যাগের সংবাদ পেল। যাবার আগে ভিনসেন্ট ফ্ল্যাটটি গুছিয়ে পরিচ্ছন্ন করে রেখে গেছে ; থিও যে তার বিশৃঙ্খলতার জন্য মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিল এ কথা সে জানত। যে ঘরটিতে সে ছবি আঁকত সেখানে রঙ, তুলি, ক্যানভাস ও ছবি এমন করে সাজিয়ে রেখে গেছে যে মনে হবে শিল্পী ছবি আঁকতে আঁকতে বাইরে গেছে, শীগ্‌গিরই ফিরে আসবে।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুআরি। ভিনসেন্ট দক্ষিণ-ফ্রান্সের আর্ল স্টেশনে গাড়ি থেকে নামল। আফ্রিকায় যাওয়া হলো না বটে, কিন্তু এখানেও প্রখর রোদ, চোখ-ধাঁধানো রঙের অপূর্ব সমারোহ। থিওকে চিঠি দিয়ে জানালো আপাতত সে এখানেই থাকবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই শীত চলে গেল। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলি ফুলে-ফলে ভরে উঠল। অপূর্ব দৃশ্য, প্রকৃতির এমন রূপ সে শীতের অঞ্চলে দেখেনি। স্টেশনের নিকটবর্তী ছোট হোটেলটায় উঠেছে। ঘরে ছবি আঁকবার সুযোগ নেই। সকাল হলেই রঙ্, তুলি, ইজেল ও ক্যানভাস নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সারা দিন রঙ আর রেখার ধ্যান করে সন্ধ্যায় ফিরে আসে একটি সম্পূর্ণ ছবি নিয়ে। ছবি আর ছবি ; ফলন্ত আর ফুলন্ত গাছ, শস্যভরা মাঠ, শস্য কাটা, জমি চাষ করা—এমনি কত ছবি। বিস্ময়কর গতিতে ক্যানভাসে ছবি ফুটে ওঠে। ভিনসেন্ট এই গতি সম্বন্ধে নিজেই সচেতন। সে থিওকে লিখছে ঃ "আমি এখন পেন্টিংএর ইঞ্জিন হয়েছি।" প্রখর রোদ্রে বসে ভিনসেন্ট ছবি আঁকে। মাথায় টুপি দেয় না। রোদ্রের তাপে চুল যে একে একে উঠে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। মাথার প্রতিটি কোষ দিয়ে সে সূর্যকিরণের সাত রঙ পান করে ; তারপর নিজের মনের রঙ মাখিয়ে ক্যানভাসে রূপ দেয়। ভিনসেন্ট ছবি আর রঙ নিয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, আর সব কিছু ভুলে গেছে। সে যেন বুঝতে পেরেছে বেশি দিন বাকি নেই, এর মধ্যে যা-কিছু করে নিতে হবে।

কিছুদিন পূর্বে থিওকে ভিনসেন্ট লিখেছিল ঃ "শিল্পী হিসেবে যে পরিমাণ সাফল্য লাভ করছি, একজন পরিপূর্ণ সাধারণ মানুষ হিসেবে ঠিক সেই পরিমাণ পিছিয়ে পড়ছি। বিয়ে করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঘর-সংসার করবার আকাঙ্ক্ষাটা লোপ পেয়ে যাচ্ছে ; পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই এমন নিরাসক্তি আসছে দেখে মাঝে মাঝে দুঃখ বোধ করি। দায়ী করি ছবিকে ; ছবির জন্যই তো এমন হলো ! কে যেন বলেছে, আর্টকে ভালোবাসলে নারীপ্রেম হারাতে হয়। কথাটা বড় নির্মম সত্য।"

তবু, সদ্যসমাপ্ত ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে কোনো ক্ষোভ থাকে না। ঘর পেল না, ঘরণী পেল না,—কিন্তু কিছুই কি পায়নি ? কয়েক দিনের আনন্দের বদলে সন্ধান পেয়েছে অনন্ত সৌন্দর্যের। আজকের রঙ ও রূপকে চিরকালের করবার মন্ত্রগুপ্তি পেয়েছে।

উরসুলা, তোমাকে ধন্যবাদ ! 'কে' তোমাকে ! সিয়েনের কাছে সে কৃতজ্ঞ।

তোমরাই তো বেদনা দিয়ে ওকে জীবনের বাঁধা রাজপথ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছ। তাই ভিন্সেন্ট পেয়েছে অন্য পথ—রূপসৃষ্টির পথ।

হোটেলে ছবি আঁকার বড় অসুবিধা। তাই সে একটা হলুদ রঙের বাড়িতে উঠে গেল। এখানে ভিন্সেন্টের কোনো সঙ্গী নেই; স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে আধ-পাগলা মনে করে। হাতে পয়সা থাকলে কখনো কখনো একটু ফূর্তি করতে যায়; একটি মেয়ের কাছেই যায়। তার নতুন বাড়িতে অনায়াসে দু'জন থাকতে পারে। গগ্যাঁর চিঠি পেয়েছে, সে বড় অসুবিধার মধ্যে আছে। ভিন্সেন্ট তাকে আমন্ত্রণ জানাল। গগ্যাঁর সাহচর্য লাভের আশায় ভিন্সেন্ট ব্যগ্র হলো। থিওর কাছ থেকে গগ্যাঁর আসবার ভাড়াটা সংগ্রহ করে দিল, নিজের হাতে তার জন্য একটি ঘর সাজাল। তারপর একদিন সত্যি এসে পৌঁছল গগ্যাঁ।

নতুন ছবিগুলি সম্বন্ধে ভিন্সেন্ট গগ্যাঁর মতামত জানতে চাইল। গগ্যাঁ বড় সাবধানী, দু'-একটি ছবি ভালো বলল, সাধারণ ভাবে কোনো মন্তব্য করল না। গগ্যাঁর এই নীরবতা ভালো লাগল না ভিন্সেন্টের। এখানে গগ্যাঁর এই প্রথম ছবি ভিন্সেন্টকে নিয়ে,—ভিনসেন্ট ছবি আঁকছে। গগ্যাঁর ছবি দেখে ভিন্সেন্ট বলল, "এ কি, তুমি যে আমাকে পাগলের মতো করে এঁকেছ?"

শীগগিরই দেখা গেল গগ্যাঁ ও ভিন্সেন্টের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাদের শিল্প-রীতি আলাদা; গগ্যাঁ রোমান্টিক, ভিন্সেন্ট প্রিমিটিভ পদ্ধতির পক্ষপাতী। জীবন সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ পৃথক্। আজ-কাল প্রায়ই কথায়-কথায় তর্কের ঝড় ওঠে এবং তার সমাপ্তি ঘটে প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। ভিন্সেন্টের মধ্যে কি যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করে গগ্যাঁ। একদিন রেস্তোরাঁয় বসে দু'জনে হালকা পানীয় পান করছে,—হঠাৎ ভিন্সেন্ট পানীয়ের গ্লাশটা গগ্যাঁর মুখে ছুঁড়ে মারল। ভাগ্যে গগ্যাঁ সাবধান হতে পেরেছিল, তাই লাগেনি। মাঝে মাঝে রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গগ্যাঁ দেখত ভিন্সেন্ট অন্ধকারে ভূতের মতো তার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর দেয় না, ধীরে ধীরে চলে যায়। একদিন গগ্যাঁ একা বেড়াতে বেরিয়েছে; কিছু দূর গিয়ে পরিচিত পদশব্দ শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখে ভিন্সেন্ট একটা উন্মুক্ত ঝক্‌ঝকে ক্ষুর হাতে করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। গগ্যাঁ ভয়ার্ত চোখে তাকালো, সেই চাউনি দেখে ভিন্সেন্ট নীরবে ফিরে গেল। গগ্যাঁ ভয় পেয়ে সে রাত্রিতে বাড়ি ফিরল না; উঠল গিয়ে একটা হোটেলে।

ভিন্সেন্ট মোহাচ্ছন্নের মতো বাড়ি ফিরে এলো। কি করছে, কি ভাবছে, কিছুই সে জানে না। যেন ঘুমন্ত মানুষ। এমনি মানসিক অবস্থায় ধারালো ক্ষুর দিয়ে সে ডান কানটা কেটে ফেলল। অশ্রান্ত ধারায় রক্ত ঝরছে। যত জামা-কাপড় ছিল সব দিয়ে রক্ত মুছে নিতে চাইল, কিন্তু কিছুতেই বন্ধ হয় না। নিজের হাতেই শক্ত করে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে কাটা কানটা সুন্দর করে কাগজে মুড়ে পথে নেমে এলো। সে মেয়েটির কাছে অবসর কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে যেত সে মেয়েটি তার বড় বড় কা

হাত বুলিয়ে প্রায়ই ঠাট্টা করে বলত, 'বাঃ, তোমার কান দু'টি খুব সুন্দর !' দুপুর রাত্রিতে সেই মেয়েটিকে ঘুম থেকে তুলে কাটা কানের পুলিন্দাটি উপহার দিয়ে ভিন্‌সেন্ট ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলো। এসেই অজ্ঞান হয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল।

সকাল বেলা গগ্যাঁ হোটেল থেকে এসে দেখল পুলিশ এসেছে এবং বন্ধুকে হত্যা করবার জন্য তাকেই দায়ী করেছে। কিন্তু ভালো করে পরীক্ষার পর দেখা গেল ভিন্‌সেন্টের মৃত্যু হয়নি। কয়েক দিন হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এলো ভিন্‌সেন্ট। কী একটা গভীর আতঙ্কজনক দুঃস্বপ্ন পার হয়ে এলো। আর্ল-এর সর্বত্র কান-কাটার কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। পথে বেরুলেই দুষ্টু ছেলের দল "কান-কাটা," "কান-কাটা" চীৎকার করে ভিন্‌সেন্টের পিছু লাগে। শুধু তাই নয়, বাড়িতে হয়তো তুলি নিয়ে ক্যানভাসের সামনে বসেছে, অমনি বাইরে ছেলের পাল চীৎকার শুরু করল, "ও কান-কাটা, একটা কান পেয়েছি, আর একটা কান দিয়ে যাও।" সব সময় ধৈর্য রাখতে পারে না। ছেলেদের লক্ষ্য করে তুলি, রঙের পাত্র, জামা, জুতা ইত্যাদি যা কিছু হাতের কাছে পায়, ছুঁড়তে থাকে। ছেলেরা মজা পেয়ে তাকে আরো ক্ষেপিয়ে তোলে। কোনো কোনো ছেলের গায়ে হয়তো ভিন্‌সেন্টের ছোঁড়া দু'-একটা জিনিস লেগে যায়, তাতেই আর্ল-এর নাগরিকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের আবেদনে পুলিশ বিপজ্জনক পাগল হিসেবে ভিন্‌সেন্টকে পাগলা-গারদে দিয়ে এলো। আর্ল-এ তার একটি বন্ধুও ছিল না যে, তাকে পাগলা গারদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

ভিন্‌সেন্ট থিওকে আসতে নিষেধ করল। পাগলা গারদই তার পক্ষে ভালো। বাইরে সকলেই তার শত্রু। একটা রুগ্ণ, দুর্বল মানুষের বিরুদ্ধে যারা অনায়াসে চক্রান্ত করতে পারে তাদের মধ্যে বাস করা অপেক্ষা পাগলা গারদই ভালো। তাছাড়া ডাক্তার বলেছে মাঝে মাঝে তার জ্ঞান লোপ হবার আশঙ্কা আছে। বাইরে থাকলে তখন কে দেখবে? এই রোগ ভিন্‌সেন্টের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। দীর্ঘকাল দেহ ও মনের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চলেছে, তার ফলে স্নায়ু-বিকার ঘটেছে। নানা রকম পাগলের মধ্যে নীরবে দিন কাটে। ডাক্তারকে অনেক অনুরোধ করে ছবি আঁকার অনুমতি পায়; ছবির মধ্যেই তার জীয়নকাঠি। জানালার ফাঁক দিয়ে হয়তো দেখা যায় একটা ফলন্ত জলপাই গাছের ডাল, কিংবা শস্য-ভরা মাঠের এক ফালি; তাই সে আঁকে। ছবির হাত একটুও খারাপ হয়নি। তিন মাস পর পর একবার জ্ঞান হারায়; অজ্ঞান অবস্থায় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বুলি আওড়ায়, কখনো কাঁদতে চায়, কিন্তু পারে না; এই না-পারার অসহ্য যন্ত্রণায় তার দেহ আকুঞ্চিত হয়ে ওঠে। যখন ভালো থাকে তখনও তিন মাস পরে যে দৈত্যের আবির্ভাব ঘটবে তারই আতঙ্কজনক মূর্তিতে মনের আকাশ কালো হয়ে থাকে। বার বার তার মনে প্রশ্ন জাগে, এমন ভাবে বেঁচে লাভ কী?

এই দুঃসময়ের মধ্যেই ভিন্‌সেন্ট তার শিল্প-জীবনের একমাত্র সম্মান লাভ করল। বেলজিয়ান আর্ট সোসাইটি তাদের প্রদর্শনীতে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল তাকে। থিও তার হয়ে দু'খানা ছবি পাঠিয়ে দিল প্রদর্শনীতে। একখানা ছবি বিক্রি হলো চারশ ফ্রাঁ-তে। জীবনে তার এই একমাত্র সাফল্য। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। পাঁচ বছর আগে এই সাফল্য এলে ভিন্‌সেন্টের জীবনের ইতিহাস অন্য রকম হতো।

থিও-র সঙ্গে পরামর্শ করে ভিন্‌সেন্ট অভারে যাওয়া স্থির করল। দক্ষিণ-ফ্রান্স থেকে প্যারিসের কাছাকাছি শিল্পীদের সংস্পর্শে আসা সহজ হবে। মানসিক ব্যাধির সুযোগ্য চিকিৎসক ও কলারসিক ডাঃ গ্যাচেট অভারে থাকেন। তিনি ভিন্‌সেন্টের ভার নিতে রাজী হয়েছেন।

ভিন্‌সেন্ট অভারের পথে প্যারিস এসে পেঁছিল। একাই এসেছে। ইতিমধ্যে থিও বিয়ে করেছে, একটি ফুটফুটে ছেলেও হয়েছে। সেই লক্ষ্মীছাড়া ফ্ল্যাটটা এখন পেয়েছে লক্ষ্মীশ্রী। দেয়ালে দেয়ালে থিও টাঙিয়ে রেখেছে তার কতকগুলি ছবি। পাছে এই শান্তির সংসারে হঠাৎ কোনো উৎপাত সৃষ্টি করে সেই ভয়ে ভিন্‌সেন্ট তাড়াতাড়ি বিদায় নিল। যাবার সময় থিও-র ছেলের কপালে গভীর মমতায় একটি চুমো দিয়ে গেল।

অভারের সব চেয়ে সস্তা হোটেলে গিয়ে উঠল ভিন্‌সেন্ট। থিও-র ভার সে লাঘব করতে চায়। ভিন্‌সেন্ট ছবি আঁকে, ঘুরে বেড়ায়, ডাক্তারের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করে। তার ছবির মান এখনো নিচু হয়নি। তবু কি যেন বিকল হয়ে গেছে, জীবনের রঙ আর ছবির রঙ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে।

মাঝে মাঝে হঠাৎ ভিন্‌সেন্ট বড় বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তার স্নায়ুকেন্দ্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। অকারণে ক্রুদ্ধ হয়, চীৎকার করে। একটা ছবি বাঁধানোর তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সে তো ডাঃ গ্যাচেটকে রিভলভার তুলে গুলি করতেই উদ্যত হয়েছিল একদিন! ঠিক এমনি অস্থির মানসিক অবস্থায় থিও-র চিঠি এলো দুঃসংবাদ বহন করে। থিও-র ছেলে অত্যন্ত অসুস্থ; তা ছাড়া গুপিল কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদের ফলে চাকরি যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। হয়তো থিও নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে চাকরি।

থিও-র চাকরি গেলে কি উপায় হবে? তার নিজের সংসারের দায়িত্ব বেড়েছে; তার উপর ভিন্‌সেন্ট গলগ্রহ হয়ে আছে। শুধু থিও-র নয়, সে আজ সমাজের গলগ্রহ। তিলে তিলে জীবন ক্ষয় করে এত ছবি আঁকল, কিন্তু ফল হলো না কিছুই। ক্ষুধা মেটাবার দু' মুষ্টি অন্ন সংগ্রহের যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেনি। বেঁচে থেকে লাভ কি? সূর্যকিরণের সাতটি রঙ ধীরে ধীরে একটি সর্বগ্রাসী রঙে মিলিয়ে যাচ্ছে;— সেটি তো কালো রঙ! সেই ভীষণাকৃতি দৈত্যটা প্রচণ্ড আঘাতে তার মাথা ভোঁতা করে দিয়েছে, শীগ্‌গিরই বুঝি আসবে বিস্মৃতি, বুদ্ধি লোপ পাবে, অজ্ঞানতায় ডুবে

যাবে। সেই দুঃসহ অবস্থা ভিন্‌সেন্ট আর সহ্য করতে পারবে না।

২৭শে জুলাই, রবিবার। ভিন্‌সেন্ট হোটেল থেকে বেরিয়ে মাঠের পথ ধরল। পকেটে রিভলভার। পথের এক নির্জন কোণে নিজের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। তারপর দু'হাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে বেদনা-বিকৃত মুখে হোটেলে ফিরে এলো। সংবাদ পেয়ে ডাঃ গ্যাচেট এলেন হন্তদন্ত হয়ে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিন্‌সেন্ট, এমন কাজ কেন করলে ?"

ভিন্‌সেন্ট ধীরে ধীরে বলল, "আর সইতে পারছিলাম না, ডাক্তার !"

তারপর আঙুল দিয়ে বুকটা দেখিয়ে বলল, "ডাক্তার, এখানটা কেটে দেখ তো, আমার ব্যথাটা কোথায় !"

থিওকে সংবাদ দিতে হবে। কিন্তু ভিন্‌সেন্ট কিছুতেই তার ঠিকানা দিল না। বলল, "সারা জীবন তো ওকে জ্বালিয়েছি, এখন আর ওকে যন্ত্রণা দিতে চাই না। শেষকৃত্যটা তোমরাই যা হোক করে সেরে দিও।"

গুপিল কোম্পানিতে সংবাদ পাঠিয়ে থিওকে আনানো হলো। থিও এসে দেখে, ভিন্‌সেন্ট বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাইপ টানছে। আশা হলো, হয়তো সেরে উঠবে। বৃথা আশা ! ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুলাই সকালে ভিন্‌সেন্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তার শেষ কথা : "বাড়ি যেতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে।"

কার বাড়ি ? কোন্ বাড়ি ? ছবি যখন তাকে কিছুই দিল না তখন জীবনের শেষ মুহূর্তে সে কি পত্নী-পুত্র-পরিবৃত সংসারের স্বপ্ন দেখছিল ? থিও-র ফ্ল্যাটে এমনি একটি ছবি কিছু দিন পূর্বে সে দেখে এসেছে।

হোটেলের বিলিয়ার্ড টেবিলের উপরে ভিন্‌সেন্টকে রাখা হয়েছে। থিও, ডাক্তার এবং আরো কয়েক জন বন্ধু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কে এক জন বলল, "কিছু ফুল আনলে হতো।"

ডাক্তার নিষেধ করলেন। ফুলের বদলে তিনি ভিন্‌সেন্টর ছবিগুলি চার দিকের দেয়ালে টাঙিয়ে দিলেন। ফুল দিয়ে কী হবে ? কিন্তু ভিনসেন্টের মোট আটশ পেন্টিং ও ন'শ ড্রয়িংএর মধ্যে ক'খানাই বা টাঙানো যায় ? তবু সমস্ত ঘর আলোয় ভরে গেল। ভিন্‌সেন্টের ছবিগুলি সর্বত্র শিল্পের ব্যাকরণ সম্মত নয়। কিন্তু দুর্দম প্রাণের বন্যা প্রত্যেকটি ছবির মধ্যে অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠেছে। জীবনের তুলিতে হৃদয়ের রঙ মাখিয়ে ছবি এঁকেছে ভিন্‌সেন্ট। প্রত্যেকটি রেখার জন্য সে তার আয়ুর একটি অংশ দান করেছে, তাই এমন জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে ছবিগুলি। টাঙানো ছবিগুলির দিকে চেয়ে সকলের একসঙ্গে মনে হলো ভিন্‌সেন্ট তো মরেনি, সে তার উচ্ছল প্রাণের বন্যাকে ছড়িয়ে দিয়েছে তার ছবির মধ্যে। তার মৃত্যু নেই, সে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।

অথচ মৃত্যুর পূর্বে থিও ছাড়া ভিন্‌সেন্টের কোনো বন্ধুই তার শিল্প-প্রতিভাকে মর্যাদা দেয়নি। একমাত্র থিও-র ছিল জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাই সে ভিন্‌সেন্টকে সারা

জীবন অকুণ্ঠ ভাবে সমর্থন করেছে। ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়ে কি হবে? আজ তো ভিন্‌সেন্ট রিক্ত হাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। জেনে গেল, তার জীবনব্যাপী সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। দু' মুষ্টি অন্নাভাবের আতঙ্কে আত্মহত্যা করতে হলো। এত বড় দুঃখ থিও সইবে কি করে?

থিও-র আশা মিথ্যা হয়নি। ভিন্‌সেন্টের মৃত্যুর মাত্র বছর বিশেক পরে নিজের হাতে-আঁকা শিল্পীর একখানি প্রতিকৃতি নিউইয়র্কে তিন লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হল্যাণ্ড ও জার্মানীতে ভিন্‌সেন্টের ছবি নকল করে আসল বলে চালাবার ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলত। এ নিয়ে অনেক চাঞ্চল্যকর মামলাও হয়েছে। য়ুরোপ-আমেরিকার সংবাদপত্রে এই ব্যাপারের উপরে ব্যাপক আলোচনা চলত। সেদিন ভিন্‌সেন্টের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে থিও নিজেও এতটা কল্পনা করতে পারেনি। শিল্পের পথ কি বিচিত্র!

থিও ফিরে এলো তার নিরানন্দ ফ্ল্যাটে। ভিন্‌সেন্টের ছবি প্রত্যেকটি ঘরের দেয়াল ঢেকে রেখেছে। চোখ তুললেই ছবি দেখতে পায়, ভিন্‌সেন্টকে দেখতে পায়। সর্বদা পকেটে রাখে ভিন্‌সেন্টের লেখা এক তাড়া চিঠি। প্রত্যেকটি চিঠি এত কাল সযত্নে রক্ষা করেছে, একটিও হারায়নি। এই চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে ভিন্‌সেন্টের সারা জীবনের মর্মন্তুদ রক্তক্ষরা ইতিহাস। দুঃখ পায়, তবু বার বার পড়ে। না পড়ে পারে না।

থিও প্রশ্ন করে, এত বড় প্রতিভার এত বড় অপমান কেন হলো? তাহলে ঈশ্বর থেকে লাভ কি? ধর্ম ও সত্যের মূল্য কি? উত্তর নেই। নিজে উত্তর খুঁজে পায় না, বন্ধুরা দিতে পারে না, ধর্মগ্রন্থও নিরুত্তর। ভাবতে ভাবতে তারও মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটল। কিন্তু ভুগতে হলো না বেশি দিন। ভিন্‌সেন্টের মৃত্যুর ঠিক ছ'মাস পরে হঠাৎ থিও মারা গেল। অভারে ভিন্‌সেন্টের কবরে থিওকে সমাধি দেওয়া হলো। থিও-র স্ত্রী সমাধি-ফলকের উপর বাইবেলের একটি লাইন লিখে দিল: And in their death they were not divided.

মৃত্যুও তাদের পৃথক্ করতে পারেনি।

পুলিস সাহেবের স্মৃতিকথা

১৯২৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন কলকাতা থেকে যাত্রা করেছে। পয়লা জানুআরি দিল্লীতে সৈন্যদের নববর্ষের অভিবাদন গ্রহণ করবেন বড়লাট। অকস্মাৎ দিল্লী থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে রেললাইনের উপর প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হলো। বড়লাটের পরিচারকদের মধ্যে অনেকে মারা গেল। যে কামরায় বড়লাট ছিলেন তার কোন ক্ষতি হলো না। তদন্তের ফলে দেখা গেল যে পাঁচশ' গজ দূরে একটা অব্যবহৃত দুর্গে বসে বিপ্লবীরা ব্যাটারি ও তারের সাহায্যে রেল লাইনের উপর বোমা ফাটিয়েছে।

পুলিশ বিভাগে প্রচণ্ড আলোড়ন ও কর্মতৎপরতা দেখা দিল। কিন্তু এ কাজের সঙ্গে যারা লিপ্ত তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না। না পাওয়া গেলেও পুলিশ প্রত্যেক সন্দেহভাজন ব্যক্তির উপর কড়া নজর রাখতে লাগল। উত্তরপ্রদেশের অন্যতম বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিলেন। তারপর বিপ্লবীদের কার্যকলাপ একটু মন্দীভূত হলেও পুলিশের কড়া নজর শিথিল হলো না।

এলাহাবাদ পুলিশ লক্ষ্য করল যে, শহরতলীর একটি নতুন বাড়ির দোতলা ফ্ল্যাটে একটি ইংরেজ যুবতী একা একা বাস করে, চাকরি করে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে। যুবতীটিকে বড় বেশি ভারতীয় ভাবাপন্ন বলে মনে হয়। এজন্য সন্দেহ হলো, শুরু হলো খোঁজ-খবর নেওয়া। জানা গেল মেয়েটির জীবনের ইতিহাস। সে এক পাদ্রির মেয়ে; সতেরো বছর পর্যন্ত মা-বাবার সঙ্গে কাটিয়েছে চীন দেশে। তারপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। ওখানকার পড়া শেষ করে চীন দেশে কোনো চাকরি নিয়ে যাবে, এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু বাধা সৃষ্টি করল ভারতের এক মুসলমান যুবক। সে ব্যারিস্টারী পাশ করে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সে যোগ দিয়েছে। ওদের দু'জনের পরিচয় ক্রমশঃ গভীর প্রণয়ে পরিণত হলো। যুবতী প্রথম আপত্তি করেও শেষ পর্যন্ত প্রেমের জন্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে যুবককে বিয়ে করল।

ভারতে আসবার পথে জাহাজে যুবতীটি প্রথম আঘাত পেল ব্রিটিশ অফিসারের পত্নীদের কাছ থেকে। একজন ভারতীয়কে বিয়ে করেছে বলে অবজ্ঞায় তারা ওর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলল না। তারপর স্বামীর বাড়ি এসে তো একেবারে সম্পূর্ণ নতুন জগতে পড়ল। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এ বিয়েকে সুনজরে দেখেনি; কেউ ইংরেজী জানে না, সুতরাং কথা বলবার সুযোগ নেই; সর্বোপরি জোর করে তাকে পর্দানশীন করা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রার পদ্ধতি এত পৃথক্, এত

ভয়াবহরূপে নতুন যে, মেয়েটির সকল স্বপ্ন দু'দিনেই মিলিয়ে গেল। একমাত্র সান্ত্বনা পারিবারিক গ্রন্থালয়ের বইগুলি। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে দু'চার খানা বই পড়ে সে মুগ্ধ হলো। দেখল, মুক্তি আছে হিন্দু ধর্মের উদারতায়। আরো জানতে পারল কাশীতে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ নামে একটি শিক্ষালয় আছে। একদিন কাউকে কিছু না বলে কাশীর গাড়িতে উঠে বসল। সেখানে পেঁছে ভর্তি হলো সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ-এ। যেন নতুন জীবন লাভ করল। কোনো বাধা নেই,—মুক্ত উদার জীবন পেয়েছে। এখানে পড়তে পড়তেই সে থিওসফির প্রতি আকৃষ্ট হয়। থিওসফির মূলকেন্দ্র আদিয়ারে কয়েক মাস থাকবার পর এলাহাবাদের ক্রস্‌থ্‌ওয়েট গার্লস হাই স্কুলে চাকরি নিয়ে আসে। পুলিশ মহলে সে "ফ্ল্যাটের অধিবাসী রহস্যময়ী নারী" বলে পরিচিত হলো।

তখন দুপুর রাত্রি। গোয়েন্দা পুলিশের চর লক্ষ্য করল একজন লোক চুপি চুপি দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে তিনবার মৃদু টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। লোকটি রহস্যময়ীর ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল। শেষ রাত্রিতে গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার পিল্‌দিচের নেতৃত্বে বাড়ি চড়াও করে রহস্যময়ীর ফ্ল্যাটে আবিষ্কার করল এক ভারতীয় যুবককে। যুবক পুলিশকে ঠেকাবার জন্য কয়েকবার রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ে আত্মসমর্পণ করল। যুবকের নাম যশপাল। বড়লাটের গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে পুলিশ এর সন্ধান করছিল। সেই অব্যবহৃত দুর্গে বসে যশপালই টিপেছিল বোমার রিলিজ।

সকাল বেলা পুলিশের বড় কর্তা হলিন্‌স্‌ সাহেব এলেন। রহস্যময়ী যুবতী তখন একটা বেতের চেয়ারে বসে ছিল। বছর সাতাশ বয়স ; সুন্দরী ; একটু গোল ছাঁদের মুখ ; মাথা ভরা কোঁকড়ানো কালো চুলের নিচে দুটি ঘন নীল চোখ। যেন পুলিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষে এত নীল হয়েছে। পুলিশ সাহেব অনেক ভয় দেখিয়ে, মিষ্টি কথা বলেও মেয়েটির কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারলেন না তার কেবল এক কথা ঃ আমি কিছুই বলব না।

বিপ্লবীকে আশ্রয় দেবার অপরাধে যুবতীকে গ্রেপ্তার করা হলো। পুলিশের আদেশ অগ্রাহ্য করে সে চেয়ারে বসে রইলো—কিছুতেই উঠবে না। যখন হাত ধরে জোর করে তাকে ওঠানো হলো তখন দেখা গেল সে দুটো রিভলবার ও চল্লিশটা কার্তুজের উপর বসে ছিল পুলিশের কাছ থেকে ওগুলো গোপন করার জন্য।

সম্রাটের শত্রুকে আশ্রয় দেবার অপরাধে যুবতীর দু'বছরের জেল হলো। মামলার বিবরণ কাগজে পড়ে রহস্যময়ী নারীর ভূতপূর্ব স্বামী মুসলমান ব্যারিস্টার পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। খুব বিচলিত দেখাচ্ছে তাকে। কর্তাকে বলল, আমার বাড়ি থেকে যেদিন ও না বলে চলে এসেছে সেদিনই ওকে ত্যাগ করেছি। কিন্তু ভুলতে পারিনি, এখনো ভালোবাসি। এদেশের জেলে নানা জাতের অপরাধী মেয়েদের মধ্যে কি ক'রে ও দু'বছর কাটাবে তা আমি ভাবতে পারছি না। দয়া করে ওকে ব্রিটেনের কোন জেলে পাঠিয়ে দিন।

পুলিশের কর্তা বললেন, তা তো হয় না। তবে দু'বছর পরে জেল থেকে বেরুলে ও যাতে ইংলন্ডে ফিরে যায় সে ব্যবস্থা আমি করব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ব্যারিস্টার ধন্যবাদ দিয়ে যখন বিদায় নিল তখন তার দু'গাল বেয়ে চোখের জল নামছে। পুলিশের কর্তা প্রতিশ্রুতি পালনের সুযোগ পাননি। মাত্র এক বছর পরে ভারতের এক কারাগারে এই রহস্যময়ী বিদেশী তরুণীর মৃত্যু হয়।

এই অজ্ঞাতনামা যুবতী সত্যি রহস্যময়ী থেকে গেল। কেন সে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল, যশপালের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, সে রহস্য কেউ জানতে পারল না। যেটুকু উপরে লেখা হলো সেটুকুও জানা যেত না যদি উত্তরপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল S. T. Hollins তাঁর স্মৃতিকথা No Ten Commandments-এ কাহিনীটির উল্লেখ না করতেন। হলিন্স্ বিয়াল্লিশ বছর যাবৎ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশ বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে হলিন্স্ লিখেছেন No Ten Commandments. পুলিশকে যে-সব ঘটনা তদন্ত করতে হয়েছিল তারই কতকগুলি নির্বাচিত কাহিনী। বই-এর নামটি কিপলিং-এর কবিতা থেকে নেওয়া। সুয়েজখালের পূর্বদিকে নীতিবোধ নেই, অরাজকতার রাজত্ব—এটাই বোঝায়। পুলিশের গুলিতে নিহত চন্দ্রশেখর আজাদকে চুলের মুঠি ধ'রে তুলে রাখবার ছবিটা ভারতীয় পাঠকদের নিশ্চয়ই আঘাত করবে। লেখক ব্রিটিশ আমলে পুলিশের কর্তা ছিলেন; তবু তাঁর রচনায় ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কুৎসা নেই, তাদের ছোট করে দেখবার অপচেষ্টা নেই। হলিন্স্ গল্প লেখকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দিয়ে যে সব ঘটনা দেখেছেন তাদের সুন্দর স্বচ্ছ ভাষায় লিখেছেন। লেখক নিজেকে আড়ালে রেখেছেন; তাই বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনীর মতো পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখবার ক্ষমতা আছে রচনা-কৌশলের মধ্যে। কত লোভ, পাপ, প্রণয় ও বিষাদের কাহিনী! বংশীনগরের বৃদ্ধ পুরোহিত লোকনাথ হিন্দু ধর্মের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সতীদাহ প্রথার প্রবর্তন করেছিল। পুলিশ গ্রেপ্তার করবার পর সে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিল, এই যে আমি একটি নারীকে সতী করতে পেরেছি, সে চিতার আগুন আর নিববে না, হাজার হাজার নারী আবার স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে সতী হবে। মদনমোহনের বন্ধ্যা স্ত্রী সুন্দরী পুত্রবতী হবার আকাঙ্ক্ষায় একটি চার বছরের ছেলেকে কালীর সম্মুখে বলি দিয়ে সেই রক্তে স্নান করেছিল। হায়দরাবাদের এক অপরূপ সুন্দরী কিশোরীকে বিয়ে দেবার ছল করে তার বাবা ব্যবসা করত। ধনীর পাগল কিংবা বোকা ছেলের বিয়ে হয় না; কানাইয়ালাল মোটা টাকা নিয়ে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেয় তেমন ছেলের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের দু একদিন পরই মেয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে আসে শ্বশুর বাড়ি থেকে, তারপর পিতা-পুত্রী সে অঞ্চল থেকে উধাও হয়ে যায়। শেষবার যখন এই প্রতারণা ধরা পড়ল তখন মেয়েটি সর্বশেষ শ্বশুর বাড়িতে বেশ সুখেই আছে। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে আসায় সে কেঁদে বলল, এর আগে যাদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তারা স্বামীর যোগ্য ছিল

না ; এবার আমি মনের মতো স্বামী পেয়েছি, তাকে ভালবেসেছি, বাবার কাছে আর ফিরে যাব না, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। মীরাটে ডি. সিলভার ভারতীয় পাচক প্রভুকন্যার অবৈধ সন্তানকে হত্যা করে জেলে গিয়েছিল। সন্তানের দায়িত্ব তার ছিল না ; কিন্তু দূরে থেকে সে সুন্দরী তরুণীকে ভালোবাসত। তার সুনাম রক্ষার জন্য নিজে স্বেচ্ছায় বিপদ বরণ করেছিল। এমনি আরো কত চরিত্র মনের উপর দাগ রেখে যায়। গ্রাম্য বালিকা শান্তি ও তার প্রণয়ী মাধোলালের বিয়োগান্ত কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক। শান্তি ধনীর মেয়ে ; মাধোলালের বাবা শুধু দরিদ্র নয়, শান্তির বাবার নিকট ঋণী। আর্থিক অবস্থার এই বৈষম্য কিন্তু ওদের হৃদয় বিনিময়ের বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মাধোলাল শান্তিকে বিয়ে করতে চাইল। বলা বাহুল্য, দারিদ্র্যের অজুহাতে সে প্রার্থনা মঞ্জুর হলো না। ওর বিয়ে দেওয়া হলো এক ধনী বৃদ্ধের সঙ্গে। শান্তি সুখী হলো না। রাত্রিতে গোপনে এসে দেখা করে মাধোলালের সঙ্গে। এক দিন ধরা পড়ল। দ্বিচারিণী হবার অপরাধে শান্তির নাক কেটে দেওয়া হলো। মাধোলালও প্রাণ হারালো শান্তির বাবা ও ভাইদের হাতে। পুলিশ এসে শান্তিকে শহরের হাসপাতালে পাঠালো চিকিৎসার জন্য। ঘা শুকাবার পর ফিরে এসে প্রথম জানতে পারল মাধোলালকে খুন করা হয়েছে। কয়েকদিন পরে গ্রামের শেষ প্রান্তে এক কুয়োর মধ্যে শান্তির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল। মাধোলালের সঙ্গে সত্বর মিলনের এ ছাড়া অন্য পথ ছিল না।

বাঙালী বহুদর্শী পুলিশ কর্মচারীরা এরকম বই লিখে সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনতে পারেন না? বিশেষ করে যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে লিপ্ত ছিলেন তাঁরা অনেক অজানা কাহিনী শোনাতে পারেন। এদের সাহিত্যিক মূল্য ও ঐতিহাসিক মূল্য দুই-ই হতে পারে।

সম্প্রতি ইংরেজী সাহিত্যের একটি অসাধারণ পুস্তক সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। দেড়শ' বছরের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় একজন লেখকের এত বড় বই আর প্রকাশিত হয়নি। বইটি দশ খণ্ডে প্রায় সাড়ে বত্রিশ লক্ষ শব্দে সম্পূর্ণ। অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবীর A Study of History গ্রন্থের কথা বলছি। ১৯২১ সালে একদিন রেল-গাড়িতে ভ্রমণ করবার সময় আকস্মিকভাবে টয়েনবীর মনে আলোচ্য গ্রন্থের পরিকল্পনা জেগেছিল। প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে, পাঁচ বছর পরে বেরিয়েছে পরবর্তী তিন খণ্ড। বাকী চার খণ্ড এক সঙ্গে বেরুলো গত অক্টোবর মাসে। দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের কঠোর সাধনার দ্বারা টয়েনবী ইংরেজী সাহিত্যে কীর্তি স্থাপন করলেন।

প্রথম তিন খণ্ডে সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের বিষয়বস্তু সভ্যতার অবনতি ও ধ্বংস। শেষ চার খণ্ডে টয়েনবী বিভিন্ন সভ্যতার যোগাযোগ এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন। টয়েনবী মানব-সভ্যতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের শুধু ধারাবাহিক বিবরণ দিয়ে ক্ষান্ত হননি; প্রত্যেকটি প্রধান বিষয়ের উপর দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব মন্তব্য। মানব-সভ্যতার সাধারণ ইতিহাস থেকে টয়েনবীর বই-এর পার্থক্য এখানে। ইতিহাসকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন টয়েনবী, তাঁর সেই দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য গ্রন্থটিকে অসামান্য করে তুলেছে।

টয়েনবী ইতিহাসের ধারাকে কালানুক্রমিক ভাবে আলোচনা করেননি। তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে সেই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন; দৃঢ়বদ্ধ ধারাবাহিক বিশ্লেষণের চেষ্টা নেই বলে পাঠক যে কোন একটি প্রসঙ্গ পৃথক্-ভাবেও পড়তে পারেন। অবশ্য খুব কম পাঠকের পক্ষেই দশ খণ্ড সম্পূর্ণভাবে পড়া সম্ভব। গ্রন্থের দৈর্ঘ্যটাই এর প্রধান কারণ নয়; গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের পূর্বসূত্র-কণ্টকিত পুরনো ধাঁচের রচনার রীতি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। একটি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যেরূপ সহজ সাবলীল রচনাশৈলীর প্রয়োজন টয়েনবীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটেনি। D C. Somervell প্রথম ছয় খণ্ড সংক্ষিপ্ত করে একটি খণ্ড প্রকাশ করেছেন; শেষ চার খণ্ডের সংক্ষিপ্তসারও এতদিনে বেরিয়ে গেছে। দু' খণ্ডের এই সারাংশটিই ভবিষ্যতে জনপ্রিয় হবে।

বারো বছর গ্রীক ও পনেরো বছর ল্যাটিন ভাষার অনুশীলন করেছেন টয়েনবী। এই দীর্ঘকালের চর্চার ফলে তাঁর রচনা ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া

স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাবলী তিনি বিচার করেছেন বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে। খ্রীস্টান ধর্মের আদর্শ টয়েনবীর সিদ্ধান্তগুলি প্রভাবান্বিত করেছে। টয়েনবী বস্তুতন্ত্র-বিরোধী; তিনি বিশ্বাস করেন ধর্মের মধ্যেই মানুষের মুক্তি। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এক বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ মিলিত মানবসমাজ স্থাপনের পথে এগিয়ে চলেছে; তথাপি আমরা "আদিম পাপ" থেকে এখনো নিজেদের মুক্ত করতে পারিনি। এখনো পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণী মানুষ। বিজ্ঞান যে সব উন্নতি করেছে সেগুলি একান্তরূপে বাহ্যিক, বিজ্ঞান মানুষের নৈতিক দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারেনি। পৃথিবীতে আমরা এসেছিলাম নিষ্পাপ জীবন নিয়ে। কিন্তু সমাজ গড়ে ওঠবার পর ঈশ্বরকে ক্রমশঃ ভুলেছি, পূজা করেছি জাতি ও রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রকে বড় করবার জন্য যুদ্ধ করেছি; একটা যুদ্ধের পর আর একটা যুদ্ধ। ব্যক্তিগত জীবনও লোভ ও পাপের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই পাপই যুগে যুগে মানুষের আশ্চর্যরূপে সমৃদ্ধ বড় বড় সভ্যতা ধ্বংস করেছে। মানব-সমাজকে জাতি ও রাষ্ট্রে বিভক্ত করা পাপ। রাষ্ট্রানুগত্য যুদ্ধোন্মাদনা আনে, স্বাদেশিকতার নামে ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে আমরা উন্মত্ত হই। এই উন্মত্ততা জাতি ও সভ্যতার ধ্বংসের কারণ। ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরানুরক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা মানব-সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কত বড় বড় সভ্যতা ও সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে; কিন্তু শত শত বৎসর যাবৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মগুলি কালজয়ী হয়ে বেঁচে আছে। ব্যক্তি ডুবে যায়, সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে, সভ্যতা লুপ্ত হয়, কিন্তু ধর্ম বেঁচে থাকে। টয়েনবী আশা করেন যে, একদিন পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ধর্মগুলির সংমিশ্রণে এক বিশ্বধর্ম উদ্ভূত হবে। হয়তো তা বিশুদ্ধ খ্রীস্ট-ধর্মের সগোত্র। একে অবলম্বন করেই মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পাবে।

টয়েনবী আরো আশা করেন যে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে এক অখণ্ড পৃথিবীর আদর্শ শুধু কল্পনার বস্তু নয়, অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। শুধু প্রশ্ন এই যে, অখণ্ড মানবসমাজ শান্তির পথে অথবা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।

অষ্টম ও নবম খণ্ডে টয়েনবী ভারত সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। সমগ্র বই পড়বার ধৈর্য যাঁদের নেই তাঁরা The Modern West and the Hindu World (অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১৯৮) অধ্যায়টি পড়তে পারেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত ভারতকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এই অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হয়েছে। 'India' শব্দ ব্যবহার না করে টয়েনবী 'Hindu' কথাটি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন, এটি লক্ষণীয়। ভারতে ধর্ম, জাতি, রাজনীতি নিয়ে এত বিরোধ, তবু নব-প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রের অগ্রগতি (১৯৫২ পর্যন্ত) বিশেষ আশাপ্রদ বলে মন্তব্য করেছেন টয়েনবী। বিদেশী শুভাকাঙ্ক্ষীরা যতটা উন্নতি আশা করেছিলেন তার চেয়ে বেশি

অগ্রগতি হয়েছে। ভারত স্বাধীন হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘাতের দ্বন্দ্ব এখনো দীর্ঘকাল তাকে ভুগতে হবে। বিরোধটা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত, এবং এই বিরোধের মূল কারণ দুটি। প্রথমতঃ ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা হিন্দু-সমাজের উপরতলার কয়েকজনকে স্পর্শ করতে পেরেছে। উপরতলার ভারতবাসীরাও সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাবধারাকে গ্রহণ করতে পারেনি। শুধু তাদের বুদ্ধিবৃত্তির রূপান্তর ঘটেছে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে। কিন্তু তাদের আদর্শ ও অনুভূতি এখনো ভারতীয়। সাধারণ ভারতবাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি। উপরতলার ভারতীয়েরাই রাষ্ট্রের কর্ণধার; সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিক স্তরের জনগণের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে বলেই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এই সমস্যার তো সমাধান করতেই হবে এবং দেরি করলেও চলবে না। নবীন রাষ্ট্র দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের দায়িত্ব পেয়েছে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। জনসাধারণের উন্নতি করতে কোন্ পথ অবলম্বন করা হবে সেইটে সমস্যা। পাশ্চাত্য রীতিতে তাদের অবস্থার উন্নতি করবার চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে কি না সন্দেহ। কারণ, পাশ্চাত্য পদ্ধতি গ্রহণ করবার মতো পূর্ব-প্রস্তুতি এদের নেই। রাশিয়ার বিপ্লবীরাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে রাশিয়া তার সমস্যার সমাধান করেছে। রাশিয়ার পথ কি ভারত গ্রহণ করবে? ভারতীয় জনগণের গভীর ধর্মানুরাগ এবং হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য সাম্যবাদ গ্রহণের পক্ষে হয়তো বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তথাপি ভারতকে সাম্যবাদ গ্রহণের কথা ভাবতে হতে পারে।

বাঙ্গালীরা প্রথম অনুভব করতে পেরেছিল যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা পৃথিবীকে রূপান্তরিত করবে। তাই তারা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তারপর একে একে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার দানকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু রাজ্য হারাবার অভিমানে মুসলমানরা দূরে সরে ছিল। যখন তারা ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করল, তখন দেখল হিন্দুরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাদের সমকক্ষ হবার সুযোগ আর নেই। নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন বলেই মুসলমানদের মনে ভয় জেগেছিল। পাকিস্থান সেই ভয়ের প্রতীক, শক্তির নয়।

পাকিস্থান ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্থান যে অঞ্চল অধিকার করে আছে সেখান দিয়েই অতীতে বহু বিদেশী ভারত আক্রমণ করেছে। পাকিস্থান হওয়ায় এখন সেই আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়ার সমুদ্রে বেরুবার পথ দরকার। তারা যদি একদিন করাচী বন্দর দাবি করে, তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সেখান থেকে ভারতের সীমানা তো মাত্র এক পা'র ব্যবধান।

টয়েনবী গান্ধীজীকে হিন্দু বলে দেখেছেন, ভারতীয় বলে নয়। গান্ধীজীর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই টয়েনবী গান্ধীজীকে "Hindu

Janus" (দুমুখো হিন্দু) আখ্যা দিয়েছেন। গান্ধীজী পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিবিদ্যাকে অগ্রাহ্য করে চরকা ধরেছেন; তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে কেবল যন্ত্রকেই দেখেছেন, ধর্মকে দেখেননি। এই জন্যই গান্ধীজীর অনুগামীরাও তাঁর কথা গ্রাহ্য না করে ভারতের উন্নয়ন-পরিকল্পনায় যন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছে।

গান্ধীবাদের মূল কথাটি উপলব্ধি করলে টয়েনবী নিশ্চয়ই এরূপ মন্তব্য করতেন না। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি গভীর আসক্তি জীবনকে কলুষিত করে বলেই গান্ধীজী এর বিরোধী। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক ভালো জিনিস গান্ধীজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন। টেকনলজির অবাধ প্রসার যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলেই গান্ধীজী এর নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন।

ভারতের জনসাধারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে যতটা দূরে আছে বলে টয়েনবী ভেবেছেন, আসলে কিন্তু তারা ততটা দূরে নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা ভারতবাসীর সহজে বিদেশী ভাবধারা গ্রহণের ক্ষমতা। সে ক্ষমতার সঙ্গে টয়েনবীর পরিচয় নেই বলেই হয়তো পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের ফলাফলকে বড় করে দেখিয়েছেন।

আমরা উপরে টয়েনবীর বিরাট গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি। ইতিহাসের শিক্ষা কি, দশ খণ্ডের সাহায্যে তিনি তা পাঠকসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। সবচেয়ে সংক্ষেপে ইতিহাসের শিক্ষা কি তা বলেছেন প্রসিদ্ধ আমেরিকান ঐতিহাসিক Charles A. Beard। এখানে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Beard-কে একবার অনুরোধ করা হয়েছিল ইতিহাস থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে একটি বই লেখবার। তিনি বললেন, বই লেখবার দরকার কি, মাত্র চারটি বাক্যে আমি ইতিহাসের শিক্ষা বলে দিতে পারি। সেই চারটি কথা হচ্ছে এই ঃ

1 Whom the gods would destory, they first make mad with power.
2. The mills of God grind slowly, but they grind exceedingly small.
3. The bee fertilizes the flower it robs.
4. When it is dark enough, you can see the stars.

বর্তমানকে নিয়ে আমরা কোনোদিনই তৃপ্ত হতে পারি না। আজকের দুঃখ-কষ্ট, জীবনের অপূর্ণতা, মনকে নিরন্তর পীড়া দেয়। যে কাল-খণ্ডকে প্রত্যক্ষ করছি নানা অবিচার ও বেদনায় তার রূপ কলঙ্কিত। তাই কল্পনা করি, অতীতের দিনগুলি এর চেয়ে ভালো ছিল। স্বপ্ন দেখি, ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন কারো মুখ থেকে কোনো অভিযোগ শোনা যাবে না। পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এমনি এক আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করছেন সভ্যতা বিকাশের সময় থেকে। প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার ধারা এই আদর্শে পৌঁছবার জন্য ক্রমাগত বয়ে চলেছে। অনাগত ভবিষ্যৎকালের অপরিস্ফুট আদর্শকে কেন্দ্র করে অনেক কবি-কল্পনা সৃষ্টির সুযোগ পাওয়া গেছে। আবার যুক্তি ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনারও অভাব নেই। গান্ধীজীর ফিনিক্স আশ্রম, টলস্টয় ফার্ম, ইত্যাদি অসংখ্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র পরিসরে আদর্শ সমাজকে রূপ দেওয়া। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবিরোধ আদর্শে পৌঁছবার পথ নিয়ে, উদ্দেশ্য সকলেরই এক। সবাই বলছেন, এই পথে গেলে আদর্শ সমাজকে পাওয়া যাবে।

এই আদর্শ সমাজ গঠনের কতকগুলি পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হবার আশা করা যায় না। কিন্তু আদর্শ হিসাবে এরা সুন্দর ; অমন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে বাস করবার লোভ মন উন্মুখ করে তোলে। স্যার টমাস মুর 'ইউটোপিয়া' নামক কাব্যগ্রন্থে এমনি একটি রাষ্ট্রের ছবি এঁকেছেন। এ বই এত বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল যে, বইয়ের নাম থেকে ইংরেজী ভাষায় একটি শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেছে। ইউটোপিয়া এখন এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র বোঝায়, যেখানে শুধুই আদর্শ চরিত্র নাগরিকরা বাস করে। সেখানে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা নেই ; অবিচার, অভাব ইত্যাদি নেই। সমস্যাক্লিষ্ট সমাজের বাস্তব অবস্থা কি হতে পারে তা দেখানো উদ্দেশ্য নয়, লেখক যা হওয়া উচিত মনে করেন তারই ছবি আঁকেন। এ ছাড়া যে সব পরিকল্পনা কাল্পনিক এবং বাস্তবে পরিণত হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত,—তাদেরও আমরা ইউটোপিয়ান বলি।

হিন্দুর ইউটোপিয়ার স্বপ্ন সত্যযুগে সফল হয়েছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণযুগ অতীত হয়ে গেছে। আমাদের কালবিবর্তন হয় ধাপে ধাপে ; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে। প্রত্যেক ধাপেই আমরা আদর্শ সমাজ বা সত্যযুগ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাই। সত্যযুগের উৎপত্তি হয়েছিল বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথির রবিবারে। এ যুগে পাপ নেই, সকলেই পুণ্যকর্মা। সত্যযুগের মানুষরা

লম্বায় একুশ হাত ; ব্যাধিতে তাদের মৃত্যু হয় না ; সকলেরই ইচ্ছামৃত্যু। খাবার খায় সোনার থালায়। তখন সকলেই ছিল ধর্মপরায়ণ, তীর্থসেবী এবং সত্যবাদী। প্রত্যেকটি বীজ অঙ্কুরিত হতো, একটিও ব্যর্থ হতো না। সকল ঋতুতে সমান শস্য পাওয়া যেত। কারো দুঃখ ছিল না; সকলের মুখ আনন্দোৎফুল্ল। আজকের সমস্যাপীড়িত মানুষকে হরিবংশ আশার কথা শুনিয়েছেন। সত্যযুগ অতীতেই শেষ হয়ে যায়নি, ভবিষ্যতে আবার সত্যযুগ আসবে। হরিবংশ বলছেন ঃ কলিযুগের শেষে ধর্ম যখন নিঃশেষে লোপ পেয়ে যাবে তখন সত্যযুগের শুরু হবে,—রাত্রি শেষে সূর্যোদয়ের মতো। গান্ধীজীর রামরাজ্যের পরিকল্পনা হয়তো এই আগামী সত্যযুগের পূর্বস্বপ্ন।

হরিবংশের চেয়েও আশার কথা শুনিয়েছেন আমাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। বলেছেন ঃ

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্ ॥
চরৈবেতি। চরৈবেতি ॥

কলিকাল হল ঘুমিয়ে থাকা, ঘুম ভাঙলে হল দ্বাপর, বিছানা ছেড়ে উঠলে হল ত্রেতা এবং সামনে এগিয়ে চলা হল সত্যযুগ। সুতরাং এগিয়ে চল, সামনে এগিয়ে চল।

এই সত্যযুগ তো আমাদের হাতের মুঠোয়। এগিয়ে চলার মন্ত্রকে গ্রহণ করলেই পেতে পারি।

ইউরোপে আদর্শ রাষ্ট্র বা সত্যযুগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্লেটো রূপ দিয়েছেন তাঁর 'রিপাব্লিক'-এ। প্লেটোর রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীর লোক থাকবে। শাসক শ্রেণীতে থাকবে দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিক, তাদের কাজ হবে শাসনকার্য পরিচালনা করা ; দ্বিতীয় বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রধান গুণ হবে সাহসিকতা এবং এদের উপরে দায়িত্ব থাকবে দেশরক্ষার ; তৃতীয় শ্রেণীতে থাকবে সাধারণ নাগরিক, যারা প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বে কাজ করে যাবে। প্রথম শ্রেণীর যুক্তিবাদী মন থাকবে, সংস্কার বা ভাবাবেগ তাদের প্রভাবান্বিত করবে না। প্রত্যেক শ্রেণী নিজের কর্তব্য করে যাবে, অপরের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে যে সব নাগরিক শ্রেষ্ঠ তাদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার থাকলে প্রত্যেক নাগরিক পরোক্ষে শাসনযন্ত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উপকৃত হবে। প্লেটোর এই রাষ্ট্র-পরিকল্পনা পরবর্তীকালে মানুষের চিন্তাধারার উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইউটোপিয়া কিংবা স্বর্ণরাজ্যের পরিকল্পনা সাধারণতঃ রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার যুগে দেখা দেয়। এথেন্সের ইতিহাসের এক সঙ্কটক্ষণে 'রিপাব্লিক' লেখা হয়েছিল। অন্যান্য প্রায় সকল ইউটোপিয়া লেখা হয়েছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কালের মধ্যে। মধ্যযুগে ইউরোপে ইউটোপিয়া রচনার সুযোগ ছিল না। কারণ তখন জীবন ছিল ধর্মের ছকে বাঁধা। চার্চের নির্দেশ ও সমর্থনের অতিরিক্ত কিছু থাকতে পারে এমন কথা কল্পনা করাও ছিল পাপ। চার্চ যেভাবে জীবন ও

রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে গ্রহণ করে নেওয়া ছিল রীতি। মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেলে মানুষের মনে জাগল জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন ; এলো চিন্তার স্বাধীনতা। বর্তমান পরিবেশের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায় আর বাধা রইল না।

স্যার টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া' (১৫১৬ খ্রী.) এই জাতীয় স্বর্ণরাজ্য পরিকল্পনার মধ্যে সর্বপ্রথম। মুর তাঁর 'ইউটোপিয়ার' প্রথম খণ্ডে তদানীন্তন ইংলণ্ডের শোচনীয় সামাজিক অবস্থার ছবি দিয়েছেন। ইংলণ্ডে তখন ধীরে ধীরে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে ; অর্থগৃধ্নু হাঙ্গরেরা ভেসে উঠতে আরম্ভ করেছে সমাজের উপরতলায়। দ্বিতীয় খণ্ডে মুর তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দিয়েছেন। এখানে প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু দৈহিক পরিশ্রম করে জীবিকার্জন করতে হবে। কয়েকজন বিদ্বান্ ব্যক্তি ছাড়া এমন কেউ থাকতে পারবে না যে বসে বসে খাবে। প্রত্যেকে দৈনিক ছ'ঘণ্টা করে রাষ্ট্রের সম্পদ্ উৎপাদনে সাহায্য করবে। যুদ্ধ ও সকল প্রকার বিলাসিতা বর্জনের নীতি রাষ্ট্র পালন করবে কঠোরভাবে। রাজা নির্বাচিত হবেন নাগরিকদের দ্বারা এবং রাজার জীবনযাত্রা হবে ঠিক সাধারণ লোকের মতো। মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজা শাসন করবেন না, তাঁর লক্ষ্য হবে সকলের সুখ ও শান্তি। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শ্রমিক প্রভৃতি সমস্যা সম্বন্ধে মুরের মতামত আধুনিকতাপন্থী। মুর এসব কথা লিখলেও নিজে তাকে কার্যকরী করবার চেষ্টা করেননি। তিনি লর্ড চ্যান্সেলর হয়েছিলেন ; কিন্তু রাজরোষে পড়ে আবার প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

এর পর উল্লেখযোগ্য কাম্পানেল্লার City of the Sun বা সূর্যনগর। ১৫৬৮ সালে কাম্পানেল্লা ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং খুব অল্প বয়সে যোগ দেন ডোমিনিকান সন্ন্যাসীদের দলে। রাজদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে দীর্ঘ সাতাশ বছর কারাবাস করতে হয়েছে। কাম্পানেল্লার স্বর্ণরাজ্য একটি প্রাচীরঘেরা সুপরিকল্পিত নগর। এখানে তিনি যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ছবি দিয়েছেন তা খ্রীস্টীয় আশ্রমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। কিন্তু প্রশাসন, সামাজিক সম্পর্ক, শিল্প নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কাম্পানেল্লার মতামত চিরকালই আগ্রহের সঙ্গে পড়া হবে। এই রাষ্ট্রের নাগরিকরা সমষ্টিগতভাবে সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে ; কিন্তু দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যে নিজেকে একা সাধনা করতে হবে সে কথা ভুললে চলবে না। বিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির উপরেই গভর্নমেন্টের ভার থাকবে। সকল কার্যের মূল লক্ষ্য হবে সাম্য ; —সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যষ্টিকে ত্যাগস্বীকার করতে হবে। এই পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সকলের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ ; কায়িক পরিশ্রমের প্রতি সম্মান এবং শিল্পী ও লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধা।

বেকনের Novus Atlantis (1627) কাম্পানেল্লার মতো সাম্যবাদে পূর্ণ নয়। এখানে বেকন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন বিজ্ঞানের

জন্য রাষ্ট্রের কি করা কর্তব্য। বেকনের পরিকল্পনায় সলোমনস্ হাউস নামে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র প্রাধান্য লাভ করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা যে সব নতুন তথ্য ও জিনিস আবিষ্কৃত হবে তারা মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করবে। বেকন কোন্ কোন্ বিষয়ে গবেষণা করতে হবে তার একটা তালিকাও প্রস্তুত করেছেন এবং ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে এমন কতকগুলি ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন, যা আজ সফল হয়েছে। বিজ্ঞান-সাধনা সম্পর্কে বেকনের স্বপ্ন অনেকটা সফল হয়েছে, কিন্তু তাতে মানুষের দুঃখ লাঘব হয়েছে কতটুকু?

স্বর্ণরাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রুশোর Social Contract (1762) বা সামাজিক চুক্তি। রুশো পূর্ববর্তীদের মতো ইউটোপিয়ার মতো অচেনা দ্বীপ, সূর্যনগর কিংবা সুদূরে অ্যাটলান্টিসের ন্যায় কোনো জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতবাদ নিছক কল্পনা নয়, বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। পাঠকের মনে হবে তাঁরও এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। রুশোর মতবাদের পেছনে একটা যুক্তির কাঠামো অনুভব করা যায় বলে শ্রদ্ধা জাগে। রুশো বলছেন, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে আমরা জন্মেছি। প্রকৃতির কাছ থেকে যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তাতে আমাদের স্বাভাবিক অধিকার। নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব করে আমরা সমাজ গড়েছি। এই সমাজ বা রাষ্ট্রের উপরে বসিয়েছি রাজাকে, তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেছি সু-শাসনের। কু-শাসন হলে রাজাকে পদচ্যুত করবার অধিকার রয়েছে জনসাধারণের। ক্ষমতা আমাদের, রাজার নয়। মানুষ পৃথিবীতে আসবার পরে এমনি আদর্শ রাষ্ট্র ছিল, যেখানকার নাগরিকরা প্রকৃতিদত্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। সেই স্বাধীনতা এখন সকলের হাত থেকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে চলে গেছে বলেই এত দুঃখ। আমরাই বে-দখলকারীদের ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারি। আমাদের প্রচেষ্টার পেছনে থাকবে নৈতিক অধিকারের জোর। রুশোর এই মতবাদ ইউরোপের বহু দেশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাঁর নিজের দেশে সাহায্য করেছিল বিপ্লবকে দ্রুততর করতে।

উপরি-উক্ত চারটি প্রধান ইউটোপিয়া মানুষের চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য একটি দিকের পরিচয় দিতে সক্ষম। সম্প্রতি একটি খণ্ডে এই চারটি ইউটোপিয়া একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। মানবসমাজের বিকাশ ও অগ্রগতি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের কাছে বইটি সমাদর লাভ করবে। বইটির নাম Famous Utopias.

আগন্তুক

Colin Wilson-এর The Outsider প্রথম প্রকাশিত হবার মাস তিনেকের মধ্যে ছ'টি সংস্করণ হয়ে গেছে। অথচ উপন্যাস নয়; সমস্যামূলক প্রবন্ধের বই। জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ দু'টি: প্রথমত প্রকাশক দাবি করেছে এ বই হচ্ছে 'an enquiry into the nature of the sickness of mankind in the mid-twentieth century.'

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই এ-সম্বন্ধে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, চব্বিশ বছরের তরুণ লেখক বিভিন্ন দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের চিন্তাধারা উদ্ধৃতিসহ বিশ্লেষণ করেছেন। সুতরাং সাধারণ পাঠক অল্প আয়াসে একটি মতবাদ সম্বন্ধে মনীষীদের বক্তব্য জানবার সুযোগ পান। এর আকর্ষণও কম নয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বইয়ের কাটতি দিয়ে তার গুণ বিচার হয় না। আলোচ্য পুস্তক সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন তা বর্তমান জগতের একটি বড় সমস্যা। পৃথক্‌ভাবে শুধু এই সমস্যাটি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে বলে জানা নেই। সুতরাং সেদিক থেকে বইটির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

একদল লোক আছে যারা সংসারে বাস করেও বর্তমান জীবনকে মেনে নিতে পারে না। এরা মনে করে আমাদের জীবন এক বিরাট ফাঁকির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই ফাঁকির উপলব্ধি মন অতৃপ্তিতে পূর্ণ করে, জীবনের উপর বিতৃষ্ণা জাগিয়ে দেয়। লেখক এদের বলেছেন, 'আউটসাইডার'। অর্থাৎ, সংসারে থেকেও এরা সংসারের জীবনে ডুবে যেতে পারেনি। জীবনধারার বাইরে দাঁড়িয়ে অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রাকে বেদনার সহিত লক্ষ্য করাই এদের কাজ। বাংলায় বলা যায় 'আগন্তুক'; যেন অপরিচিত অতিথির মতো সংসারের বৈঠকখানায় এরা বসে থাকে। জীবনের অন্দরমহল থেকে যতই আহ্বান আসুক, সে আহ্বানকে যথার্থ বলে স্বীকার করতে ভয় পায়।

এই 'আউটসাইডার' বা 'আগন্তুকের' অস্তিত্ব ইতিহাসের সকল যুগেই ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে 'আগন্তুক'দের যেরূপ প্রাধান্য, পূর্বে কখনো সেরূপ ছিল না। পূর্বে 'আগন্তুকের' মনোবৃত্তি ছিল ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; এখন সেটা সমাজের মনে প্রবেশ করেছে।

একালের 'আগন্তুকের' উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে সাহিত্যের মধ্যে। লেখক বারবুস-এর L' Enfer থেকে 'আগন্তুকের' যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা থেকে 'আউট-

সাইডার'-এর স্বরূপ স্পষ্টই বোঝা যাবে। বারবুস-এর নায়ক হোটেলের ঘরে নিজেকে বন্দী করে রাখে, বাইরের জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। কিন্তু নিজের ঘরের দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে পাশের ঘরের বিচিত্র জীবনযাত্রা দেখবার উৎসাহ তার অপ্রতিরোধ্য। ঐ ছিদ্র দিয়ে 'he sees too deep and too much.' আর যা সে দেখতে পায়, তা শুধুই শৃঙ্খলাহীন জীবনের হ-য-ব-র-ল। এইচ. জি. ওয়েলস্-এর রচনায় সর্বত্রই আমরা জীবন-প্রীতির পরিচয় পেয়েছি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে কি ভাবে উন্নত করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি অনেক স্থানে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তাঁর শেষ রচনা 'Mind at the End of its Tether'-এ এক নতুন সুরের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদিনের জীবন-প্রীতি হঠাৎ জীবনবিমুখতায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলেছেন: '...the end of everything we call life is close at hand and cannot be evaded.'

এই উক্তির মধ্যে 'আগন্তুকের' মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। জীবন সম্বন্ধে ওয়েলসের হতাশা বারবুস অপেক্ষা অনেক বেশি গভীর। উপরি-উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষ কথা এই: There is no way out or round or through.

কবি এলিয়ট 'আগন্তুকের' মনোভাব এভাবে প্রকাশ করেছেন:

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together

মৃত্যুর পূর্বে কীটস তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন: 'I feel as if I had died already and am now living a posthumous existence.'

'আগন্তুক'ও জীবনকে এইভাবে দেখে। তার কাছে পৃথিবীতে মৃতকল্প হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া জীবনের মহত্তর অর্থ নেই।

সার্ত্র, লরেন্স, হেমিংওয়ে, কামু প্রভৃতি লেখকদের রচনায় 'আগন্তুকের' প্রাধান্য। লেখক এঁদের কাহিনী থেকে নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কামুর 'The Stranger' ও 'The Myth of Sisyphus' উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে শেষোক্ত রচনাটিতে কামুর 'আগন্তুক' সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। গ্রীক পুরাণোক্ত সিসিফাসকে দেবতারা অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তাকে বড় একটা পাথরের খণ্ড পাহাড়ের চূড়ার দিকে ঠেলে তুলতে হবে। সিসিফাস সারাদিন চেষ্টা করে যতটা ঠেলে তোলে, সন্ধ্যাবেলা পাথর ঠিক ততটা নেমে আসে। কিছুতেই তোলা সম্ভব নয়, তবু দেবতার অভিশাপে রোজই সিসিফাসকে সেই অসম্ভব কাজ করতে হয়। মানুষের জীবনও ঠিক সিসিফাসের মতো। আশা-আকাঙ্ক্ষার শীর্ষদেশে সে পেঁছিতে চায়, কিন্তু পাথরের মতো বার বার সফলতার কেন্দ্র থেকে চ্যুত হয়ে নিচে নেমে আসে। যেখানে নেমে আসে, সেখানে মৃত্যুর অন্ধকার।

বিংশ শতাব্দীর 'আগন্তুক' শুধু জীবনবিমুখ নয়, সে জীবনবিদ্বেষীও। ঊনবিংশ

শতাব্দীর 'আগন্তুকের' ছিল জীবনের উপর ছেলেমানুষী অভিমান। এই জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা আর এক জীবন সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হত। সেটা কল্পনার জগতের জীবন। সে জগতে পেঁছবার জন্য স্বাস্থ্যহীনতা, মদ, আফিং ও বিকৃত যৌন উত্তেজনা ছিল প্রধান অবলম্বন। বিগত শতাব্দীর শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেকেই প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে এমনি করে জীবনকে এড়াতে চেয়েছেন। এই রোমান্টিক 'আগন্তুককে' আমরা প্রথম দেখতে পাই গ্যেটের 'Sorrows of Werther'-এর মধ্যে। এর সাত বছর পরে শিলারের নাটক 'The Robbers' রোমান্টিক 'আউটসাইডারের' জীবনবিমুখতা কেন্দ্র করে রচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ শিল্পী ও সাহিত্যিকের জীবন ও রচনা রোমান্টিক 'আউটসাইডারের' লক্ষণাক্রান্ত। কোলরিজ, শেলী, বায়রন, ফ্লোবেয়ার, মোপাসাঁ, র‍্যাঁবো, মালার্মে, প্রুস্ত, নোভালিস, টিয়েক, দস্তয়েভস্কি, ভ্যান গগ, গ্যগাঁ প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর 'আগন্তুকের' চোখে রোমান্টিসিজমের স্বপ্ন নেই। সে বুদ্ধি দিয়ে জীবনকে বিচার করে গ্রহণের অযোগ্য বলে রায় দিয়েছে। এই জন্যই আগন্তুকের সমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করবার বিষয়।

লেখক ভ্যান গগ, লরেন্স (অব অ্যারেবিয়া) এবং নিজিনস্কির জীবনের কতকগুলি ঘটনা বিশ্লেষণ করে 'আগন্তুক'দের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। আগন্তুক যে শুধুই কাল্পনিক চরিত্র নয়, সংসারে যে প্রকৃতই এদের অস্তিত্ব আছে, তা দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। এই বিশ্লেষণের ফল থেকে দেখা যায় যে, আগন্তুক সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ এবং সে অন্যান্য মানুষের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তাকে সহজ হতে বাধা দেয়।

'আগন্তুক' সমস্যার সমাধান কোন্ পথে হতে পারে? লেখক মনে করেন, ধর্মের পথে। তবে চিরাগত ধর্মের পথে নয়। নিজস্ব উপলব্ধি দ্বারা একটি বিশেষ পথ সৃষ্টি করতে হবে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করবার শক্তি মানুষকে জীবন বিদ্বেষের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। রামকৃষ্ণের সাধনা সম্বন্ধে লেখক বেশ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রামকৃষ্ণের মতবাদ 'আগন্তুক'দের জীবন বিদ্বেষ দূর করতে পারে বলে তাঁর ধারণা।

লেখকের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। লেখক যদিও বলেছেন বর্তমান যুগে 'আগন্তুকের' প্রাধান্য, তবু তার কারণ বলেননি। এই প্রাধান্য কেন হল? এক জায়গায় (২৪২ পৃ.) বলেছেন, আমরা মার্কসবাদের দিকে ক্রমশঃ বেশি ঝুঁকছি বলেই এমনটি ঘটেছে। কিন্তু এই উক্তির সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়নি।

সেই ১৮১৬ সালের কথা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন ইংরেজ ডাক্তার পঁচিশ বছর ভারতে থাকবার পর এদেশের রোগ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন যে, এখানে যক্ষ্মা প্রায় নেই বললেই চলে। উষ্ণ জলবায়ু রোগ বিস্তারের প্রতিবন্ধক বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি বছর ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ক্ষয়রোগে মারা যায় এবং প্রায় পাঁচ কোটি লোক কোন-না-কোনো রকমে এই রোগ থেকে ভুগছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রোগীদের একটা বৃহৎ অংশ ভারতের ঘাড়ে পড়েছে। পশ্চিম বাংলাতেই আছে প্রায় দেড় লক্ষ যক্ষ্মা রোগী।

কিন্তু দেড়'শ বছর পূর্বে যে রোগ ছিল না, কি করে তার প্রসার হলো? অনেকে বলেন য়ুরোপের লোক এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্য জয় করতে বেরিয়ে রোগ ছড়িয়েছে। আমরা নিজেদের সনাতন জীবনযাত্রার পদ্ধতি ত্যাগ করে পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করে এই মারাত্মক রোগ ডেকে এনেছি। যেসব জাতি এখনো তাদের পুরাতন আচার-পদ্ধতি রক্ষা করে চলেছে তারা আজও যক্ষ্মা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। আমাদের দেশেই তো দেখা যায় গ্রামে এর প্রকোপ অনেক কম শহরের তুলনায়। ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবনে গভীর পরিবর্তন এলো এবং সেই সময় সুযোগ বুঝে বিস্তার লাভ করল যক্ষ্মা। শুধু ইংলন্ডে নয়, ফ্রান্স এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও এর বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ল। নব প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় আছন্ন নতুন পাতা শহরগুলিতে মানুষ হয়ে উঠল রক্তহীন বিশীর্ণ প্রেতমূর্তি। ক্ষয়রোগের প্রকৃত স্বরূপ তখনো কেউ জানে না; শুধু দেখে লোকগুলি রক্তশূন্য বিবর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়। তাই রোগলক্ষণ থেকে যক্ষ্মা নাম পেল White Plague, য়ুরোপে, বিশেষ করে ইংলন্ডে, White Plague দেখা দিল মহামারীরূপে। নাগরিকরা ভীতত্রস্ত হয়ে উঠল। প্রকৃত স্বাস্থ্যবান্ লোকের এমনই অভাব ঘটেছিল যে, পাণ্ডুর, কৃশতনু মেয়েরাই তখন সুন্দরী বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করত। একজন বিশিষ্ট ফরাসী লেখক বলেছেন যে, স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা বার্লি খেয়ে যকৃতের ক্রিয়ায় বিকার এনে ফ্যাকাশে হবার সাধনা করত সেকালে। কারণ রক্তহীন শীর্ণতা যেখানে স্বাভাবিক, স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল মেয়েদের সেখানে আদর পাবার সম্ভাবনা ছিল কম।

যক্ষ্মার মতো ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি আর নেই। এর প্রকোপ সংযত করবার জন্য অভিযান চালাতে হলে এই রোগের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে Rene J. Dubos লিখেছেন: The White Plague; Tuberculosis,

Man and Society এর আগে লেখক লুই পাস্তুর-এর জীবনী লিখে নাম করেছেন। নীরস তথ্যকে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থিত করবার কৌশল জানা আছে এঁর। তাই এই মারাত্মক রোগের বিবরণ ঠিক গল্পের মতো পড়া যায়। ক্ষয়রোগ মানুষের বহুদিনের পুরাতন সঙ্গী। মিশরের কোন মমি পরীক্ষা করে ক্ষয়রোগে মৃত্যুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাচীন ভাস্কর্য ও সাহিত্যেও এর সন্ধান মেলে। এক রকমের ক্ষয়রোগ আক্রমণ করে ঘাড়ের মাংস গ্রন্থি, এর ফলে গলগণ্ডও দেখা দেয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, বৎসরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজা কিম্বা রানী রোগীকে স্পর্শ করলে রোগমুক্তির সম্ভাবনা আছে। ফ্রান্স ও ইংলন্ডে যে এমনি অনুষ্ঠান হতো তা ইতিহাসেই পাওয়া যায়। ডক্টর জনসনও এই অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর নিজের ঘাড়ের রোগ সারাবার জন্য ১৭১২ সালে রানী অ্যান তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু ফল হয়নি।

কেউ কেউ বলেন, ক্ষয়রোগীর সৃষ্টি-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। হ্যাভলক এলিস তাঁর A study of British genius নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তত চল্লিশ জন ব্রিটিশ মনীষীর ক্ষয়রোগ ছিল। আজকাল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিভার সঙ্গে যক্ষ্মার কোন যোগাযোগ নেই। তবু অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিক যে ক্ষয়রোগাক্রান্ত হবার পরও প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডক্টর জনসন, কীটস্, রবার্ট লুই স্টীভেনসন, ব্রন্টি ভগ্নীদ্বয় প্রভৃতির নাম ইংরেজী সাহিত্য থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমুদ্রে ডুবে না মরলে শেলীকেও শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মাতেই মরতে হতো। বেহালার অমর যাদুকর Paganini, এবং Chopin শোচনীয় মৃত্যু বরণ করেছেন যক্ষ্মার হাতে। রোগের আক্রমণে প্যাগানিনির কথা বলবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, দেহ জরাজীর্ণ, তবু য়ুরোপের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তিনি অপূর্ব বেহালা বাজিয়ে শোনাতেন। তাঁর বাজনা শোনবার জন্য লোক উম্মাদ হয়ে যেত, প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ পথে শুরু হতো মারামারি।

যক্ষ্মা যখন মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে তখনও ইংলন্ডে জানা ছিল না যে, এই রোগ সংক্রামক। শুধু ইতালীতে এমনি একটা আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তার ভিত্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ১৮৭০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কচ প্রথম যক্ষ্মার জীবাণু সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করেন। জীবাণু দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয় একথা জানবার পর থেকেই পরীক্ষা শুরু হলো কি করে টীকার সাহায্যে এর হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। আজ পর্যন্ত যক্ষ্মা প্রতিষেধের যতগুলি পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করা হয়েছে তার মধ্যে B. C. G. (Bacillus Calmette Guerin) টীকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ফরাসী বৈজ্ঞানিক Calmette ও Guerin এর আবিষ্কার করেছেন। প্রায় ত্রিশ বছর পরও এই টীকার কার্যকারিতা সম্বন্ধে লোকের মনে দৃঢ় আস্থা জাগেনি। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে ব্যাপকভাবে বি-সি-জি টীকা দেওয়া হয়েছে এবং এরই ফলে সেখানে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ আশ্চর্যভাবে কমে গেছে বলে

দাবী করা হয়। কিন্তু ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে আইসল্যান্ডে যক্ষ্মার হার যত কমেছে এমন আর কোথাও নয়। অথচ সেখানে বি-সি-জি কিংবা অন্য কোনো প্রতিষেধক একেবারেই ব্যবহার করা হয়নি। বি-সি-জি ব্যবহারের সবচেয়ে অসুবিধা হলো এই যে, বিভিন্ন ব্যক্তির শরীরের অবস্থা অনুযায়ী মাত্রা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। সস্তায় ব্যাপকভাবে টীকা দিতে হলে তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যক্ষ্মার নতুন ওষুধগুলি আবিষ্কৃত হবার অনেক আগে থাকতেই য়ুরোপ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। আজ তার ফলে এই মারাত্মক ব্যাধি ওদেশ থেকে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। যক্ষ্মা সম্বন্ধে কি নিদারুণ অজ্ঞতা থেকে আজকের অবস্থায় য়ুরোপ এসে পৌঁছেছে তা জানলে আমাদের মনে আশা জাগবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে কি রকম ভ্রান্ত ধারণা ছিল তার মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কীটসের জীবনী থেকে। কীটস তখন ছাত্র, বয়স বছর চৌদ্দ ; এমন সময় তার মা'র হলো যক্ষ্মা। মাকে বড় ভালোবাসত কীটস ; তাছাড়া সংসারে আর কেউ ছিল না। সুতরাং মার সেবার ভার নিতে হলো তাকেই। যক্ষ্মা যে সংক্রামক এ কথা তখন কেউ জানত না। ক্ষয়রোগে খোলা বাতাস গায়ে লাগা ভাল নয় এমনি একটা ধারণা ছিল। সুতরাং দরজা জানালা বন্ধ করে কীটস রোগীর ঘরে দিনের পর দিন কাটিয়েছে। কত বিনিদ্র রজনী শেষ করতে হয়েছে মার বিছানার উপর বসে। মা মারা গেলেন। কয়েক বছর পরে ছোট ভাই টমের হলো ক্ষয়রোগ। তার সেবার ভারও পড়ল কীটসের উপর। রোগটা যে ছোঁয়াচে, রোগীর কাছে যেতে হলে যে সাবধানতার প্রয়োজন, একথা কেউ জানত না। কীটস অবাধে মেলা-মেশা করেছে, দু'জনে একই বন্ধ ঘরে দীর্ঘকাল বাস করেছে ; তাই টম মৃত্যুর পূর্বে দাদার দেহে রোগের অঙ্কুর রেখে গেল।

কীটসের শরীর কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না। বাইরে থেকে কোনো রোগ চোখে পড়ে না, কিন্তু দেহময় একটা বিরক্তিকর অস্বস্তি। বন্ধু ব্রাউনের বাড়ি কয়েক দিনের জন্য কীটস বেড়াতে এসেছে। এক রাত্রিতে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুতে গেছে, এমন সময় একটা কাশি এল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভরে গেল লবণাক্ত স্বাদে। কীটস বন্ধুকে ডেকে বলল—শীগ্‌গির একটা আলো নিয়ে আসতে। ব্রাউন মোম নিয়ে এল। বালিশের উপর রক্ত পড়েছে। কীটস একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, এ রক্ত আমি চিনি। আমার আসন্ন মৃত্যুর শমন।

ডাক্তার এসে ব্যবস্থা করল রক্তক্ষরণের এবং পথ্য সংকোচের যে ব্যবস্থা হলো তাকে উপবাসেরই নামান্তর বলা যেতে পারে। ডাক্তারদের তখন বিশ্বাস ছিল, দেহে কোনো কারণে রক্তের প্রাচুর্য ঘটলে এবং তা বিষাক্ত হয়ে গেলে, কাশির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসে। তাই একমাত্র চিকিৎসা হলো রক্তক্ষরণ। কীটসের হাতের শিরা কেটে খানিকটা রক্ত বের করে দেওয়া হলো। কিন্তু রোগ বেড়েই চলল এবং ডাক্তাররা সেই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বার বার রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করতে লাগল। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে

তাকে উপদেশ দেওয়া হলো বায়ু পরিবর্তনের জন্য ইতালীর উষ্ণ আবহাওয়ায় যেতে। ইতালীতেও কীটসের চিকিৎসক রক্ত বের করে নিতে লাগল। আর পথ্য যা দেওয়া হলো তা খেয়ে (কীটস বলছে) একটা ইঁদুরকেও মরতে হবে ক্ষুধার তাড়নায়। কীটসের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক শিল্পী সেভার্ন ডাক্তারকে লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে অতিরিক্ত কিছু খাবার দিত মাঝে মাঝে। সেখানকার ডাক্তার মুমূর্ষু ক্ষয়রোগীকে ব্যবস্থা দিল কঠিন ব্যায়ামের। ভাবলেও শিউরে উঠতে হয় যে, ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও কীটসকে রোজ সকালে ঘোড়ার পিঠে চড়ে পার্বত্য পথে কয়েক মাইল ছুটতে হতো।

মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু আজ ভুল চিকিৎসার বিবরণটা বড় মর্মান্তিক মনে হয়। অবশ্য সে যুগে এটাই ছিল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা।

য়ুরোপ-আমেরিকার ডাক্তাররা একালের রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেই তৃপ্ত নন। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁরা বিবিধ রোগের বিবরণ সংগ্রহ করে গবেষণা করেন। মিশরের মমি পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টাও তাঁরা করেছেন। ক্ষয়রোগের জন্য আমরা বর্তমান সভ্যতাকে দায়ী করি। কিন্তু প্রাচীন যুগের মমির মধ্যেও নাকি ক্ষয়রোগের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মোনালিসার যে রহস্যময় হাসি কত কবি ও শিল্পীকে প্রেরণা দিয়েছে, একজন ডাক্তার বলেছেন সে হাসির মধ্যে কোনো রহস্য নেই। আসলে মোনালিসার কোনো এক রকম দাঁতের যন্ত্রণা ছিল। যন্ত্রণা সত্ত্বেও শিল্পীর সামনে মডেল হয়ে দাঁড়িয়ে সে জোর করে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করত। অ্যানাটমির নির্ভুল প্রমাণ থেকে নাকি মোনালিসার রহস্যময়তা অনায়াসে ভেদ করা যায়।

মানুষের কল্যাণের জন্য রোগ সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন। শুধু একালের রোগ সম্বন্ধে নয়, অতীতেরও। প্রাচীন কালের রোগ সম্বন্ধে সামান্য বিবরণই পাওয়া যায়। ইতিহাসে অন্য অনেক কথা আছে, রোগের কথা বড় একটা নেই। মহামারী ইত্যাদি দেখা দিলে তার উল্লেখমাত্র থাকে। রোগের লক্ষণ ও ক্রমপরিণতির বিবরণ জানা যায় না। রোগ একটি বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করে। সুতরাং সেই ব্যক্তির জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে পারলে রোগের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

কিন্তু সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠাপন্ন লোকদেরই জীবনী রচিত হয় এবং এঁদের জীবনীতে অনেক তুচ্ছ বিবরণ দেওয়া হলেও রোগের কথাটা সাধারণতঃ ভালো করে বলা হয় না। অথচ ব্যক্তির জীবনে পরিবার, সমাজ ইত্যাদির যতটা প্রভাব রোগের প্রভাব তার চেয়ে বেশি।

বিখ্যাত লোকদের রোগ ও মৃত্যুর বর্ণনা যতটুকু সংগ্রহ করা গেছে তার উপর নির্ভর করে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে। বুদ্ধদেব কোন্ রোগে পরলোকগমন করেছেন সে বিষয়ে ওদেশে যে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে তা এতদিন আমরা কিছুই জানতে পারিনি। তেত্রিশ জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির রোগ ও মৃত্যু সম্বন্ধে যে সব অনুসন্ধান হয়েছে তাদের সঙ্কলন করে ফিলিপ-মার্শাল ডেল্ লিখেছেন, "Medical Biographies."

প্রথমেই আছে বুদ্ধের মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্ববর্তী তিন মাসের ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ থাকায় অনুসন্ধানে

সুবিধা হয়েছে। বুদ্ধদেবের প্রথম জীবন কেটেছে ভোগ ও বিলাসের মধ্যে। গৃহত্যাগ করে তিনি আরম্ভ করলেন কঠোর তপস্যা। দীর্ঘ ছ'বছর শুধু ফল-মূল খেয়ে তাঁর দিন কেটেছে। তাঁর খাদ্যে প্রোটিনের কোনো অংশই ছিল না বলা যেতে পারে। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তিনি ভিক্ষুদের উপযোগী পরিমিত আহার আরম্ভ করলেন। তখন থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভালোই ছিল। তবু প্রথম জীবনে অপরিমিত ভোগবিলাস এবং পরবর্তী জীবনের কঠোরতার ফলে পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া যে সুস্থ ছিল না একথা অনুমান করা যেতে পারে।

বুদ্ধের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে তাঁর গৃহী ভক্তরা নানা স্থানে উৎসব ও ভোজের আয়োজন করতে লাগল। পাছে ভক্তরা ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য তিনি এসব উৎসবে যোগদান করতেন। বৈশালী নগরে বুদ্ধদেব অম্বপালী গণিকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। অম্বপালী বুদ্ধদেব ও তাঁর অনুচরবর্গকে প্রচুর ভোজে আপ্যায়িত করে। যে আম্রবনে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল বুদ্ধের সেবায় অম্বপালী পরে তা উৎসর্গ করে দেয়।

অম্বপালীর প্রদত্ত ভোজ বুদ্ধদেবের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। তিনি বৈশালীর নিকটবর্তী এক গ্রামে এসে গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিছুদিন বিশ্রামের পর একটু সুস্থ হয়ে বুদ্ধ কুশীনগর যাত্রা করেন। কুশীনগরের পথে বুদ্ধদেবকে 'পাবা' গ্রামে চুন্দ নামক একজন কর্মকারের আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়। চুন্দ বুদ্ধ ও তাঁর অনুচর ভিক্ষুদের জন্য পোলাও, শূকরমাদ্দব, ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্যের আয়োজন করেছে। শূকরমাদ্দব শূকরমাংস দিয়ে প্রস্তুত ব্যঞ্জন। চুন্দকে সন্তুষ্ট করার জন্য বুদ্ধদেব শূকরমাদ্দব গ্রহণ করলেন। কিন্তু খাবার পরই তাঁর শরীর অস্বস্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল। চুন্দকে তিনি আদেশ করলেন শূকরমাদ্দব যা এখনো বাকি আছে তা মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে। কারণ, এ খাদ্য কারো পক্ষে সহজে পরিপাক করা সম্ভব হবে না।

খাবার পর থেকেই বুদ্ধদেবের তীব্র যন্ত্রণা আরম্ভ হলো ; শরীর পড়ল দুর্বল হয়ে। আর আরম্ভ হলো রক্তপাত। কোথা থেকে রক্তপাত হয়েছে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা না থাকলেও অনুমান করা কঠিন নয় যে, রক্ত পড়েছে পেটের ভিতর থেকেই। তাঁর অসুখের সংবাদে চুন্দ হয়তো অপ্রতিভ হবে, উৎসবের সকল আয়োজন পণ্ড হবে,—এই সব ভেবে বুদ্ধদেব তাঁর একান্তসচিব আনন্দকে নিয়ে কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করলেন। শিষ্যদের বলে গেলেন, আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি, তোমরা পরে এসো।

কিন্তু সেই অসুস্থ শরীরে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হলো না। একটু গিয়েই দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ল। গাছের নিচে উত্তরীয় পেতে বুদ্ধদেব শুয়ে পড়লেন। অত্যন্ত তৃষ্ণা পেয়েছে, আনন্দকে বললেন জল আনতে। অল্প দূরেই ককুত্থা নদী। আনন্দ জল আনতে গেলেন। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। জল না আসা পর্যন্ত বুদ্ধদেব

তিনবার 'জল' 'জল' বলে চীৎকার করে উঠলেন। জল পান করবার পর ক্রমশঃ তাঁর শরীর সুস্থ হলো। ভালো হয়ে গেছেন মনে করে আবার যাত্রা করলেন কুশীনগরের পথে। কিন্তু বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হলো না। পুনরায় তিনি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। তাঁর চারদিকে গ্রামবাসীরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ডান পাশে কাত হয়ে বুদ্ধদেব তাঁদের ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন ধীরে ধীরে। এখন বেদনার চিহ্ন নেই। কিন্তু ক্রমশঃ তার দুর্বলতা যে বাড়ছে তা স্পষ্টই দেখা যায়। উপদেশ দিতে দিতে শান্ত পরিবেশে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করলেন। তাঁর মুখের উপর গভীর প্রশান্তির ছাপ ; কোথাও বিন্দুমাত্র যন্ত্রণার চিহ্ন নেই।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে হলে প্রধানতঃ এই কটি লক্ষণের কথা মনে রাখতে হবে ঃ (১) গুরু ভোজনের পর আকস্মিক অসুস্থতা ; (২) রক্তপাত ; (৩) প্রবল তৃষ্ণা ; (৪) মৃত্যুর সময় কোন প্রকার বেদনার অভাব।

রক্তপাত সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া না গেলেও বুঝা যায় যে, মস্তিষ্কের কোন শিরা ছিঁড়ে রক্তপাত হয়নি। তাহ'লে শরীরের কোন কোন অংশ অবশ হবার লক্ষণ দেখা দিত এবং স্বাভাবিকভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কথাবার্তা বলাও সম্ভব হতো না। রোগলক্ষণ বিচার করে মনে হয় বুদ্ধদেবের ডিওডেনাম অঞ্চলে গভীর ক্ষত ছিল। ক্ষতের নিকটবর্তী একটি শিরা গুরুভোজনের উত্তেজনায় ফেটে প্রচুর রক্তপাত আরম্ভ হয়। হাঁটবার সময় রক্তপাত বৃদ্ধি হওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়তেন। শুয়ে বিশ্রাম করলে রক্তপড়া বন্ধ থাকত। তাই শেষ মুহূর্তে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেও বেদনা বোধ করেননি।

ক্রিস্টোফার কলাম্বাস দ্বিতীয়বার আমেরিকা অভিযানে বেরিয়ে পাঁচ মাস যাবৎ জ্বরে অচৈতন্য হয়ে ছিলেন। কারো কারো অভিমত যে, তাঁর টাইফয়েড জাতীয় কোন জ্বর হয়েছিল। কলাম্বাস তৃতীয় অভিযানেও জ্বর ও বেদনায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গীরা একে বাত বলে উল্লেখ করলেও প্রকৃত রোগ তা ছিল না। চতুর্থ অভিযানে কলাম্বাস আরথ্রাইটিসে আক্রান্ত হন। প্রায় অচল অবস্থায় তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। হৃদ্‌পিণ্ডের বাত তাঁর মৃত্যুর কারণ।

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ডীন সুইফট সারা জীবন নানা রোগে ভুগেছেন। রোগগ্রস্ত অসহায় লোকদের যে কী কষ্ট তা তিনি ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্বে সুইফট তাঁর সম্পত্তি দিয়ে গেছেন পাগল ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য হাসপাতাল করতে। সুইফট নিজে মস্তিষ্কের রোগে মারা গেছেন।

দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এর স্বাস্থ্য বরাবরই খারাপ ছিল। স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তিনি বিয়ে করেননি। স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে তার জন্য কান্ট-এর যত্নের বিরাম

ছিল না। মোজা আট্‌কাবার জন্য বন্ধনী ব্যবহার করলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে আশঙ্কায় তিনি অনেক ভেবে চিন্তে মোজা পরবার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এত সাবধান থেকেও অনেক কষ্ট পেয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন কখনো ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না। প্রথম দিকে তাঁর ঘুরে ঘুরেই জ্বর হতো,—বোধ হয় ম্যালেরিয়া। সিস্টাইটিস্‌, খোসপাঁচড়া ইত্যাদিও ছিল। নেপোলিয়নের আহারে বিন্দুমাত্র রুচি ছিল না। তেতো ওষুধের মতো সামান্য কিছু খেতেন শুধু বাঁচবার জন্য। মাঝে মাঝে সেই সামান্য খাবার খেয়েও পেটে এমন তীব্র বেদনা উঠত যে, তিনি মেজেতে শুয়ে গড়াগড়ি করতেন। রাশিয়া অভিযানের সময় তাঁর পা ফুলত। যকৃতের বিকৃতির লক্ষণ। ইংরেজরা তাঁকে সেন্ট হেলেনায় বন্দী করে রাখল। সেন্ট হেলেনার স্বাস্থ্য কখনো ভালো ছিল না। মারাত্মক আমাশার জন্য সবাই তখন সেন্ট হেলেনাকে ভয় করত। চিকিৎসার অবহেলা ও অন্যান্য কারণে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় নেপোলিয়নের মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পরে শবব্যবচ্ছেদ করে তাঁর মূত্রাশয় থেকে পাথর পাওয়া গিয়েছিল। নেপোলিয়নের রোগ লক্ষণ ইত্যাদি মিলিয়ে একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ চিকিৎসক বলেছেন যে, দীর্ঘকালের ক্ষত পরিপাকযন্ত্রের কোন এক স্থান ছিদ্র করে দেওয়ায় রক্তপাতের ফলে নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়েছে।

কবি বায়রন গ্রীসের পক্ষ হয়ে লড়াই করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তাররা ভাবল, রক্ত দূষিত হয়ে তাঁর জ্বর হয়েছে। সুতরাং তাঁরা দূষিত রক্ত বের করে নিতে লাগলেন। রোগী দুর্বল হয়ে পড়া সত্ত্বেও চিকিৎসকদের শিরা কেটে রক্ত বার করবার আগ্রহে কমতি নেই। এর উপর কপালে বড় বড় জোঁক লাগাবার ব্যবস্থাও ছিল। স্যার রোনাল্ড রস্‌-এর অভিমত এই যে, বায়রন কোনো এক মারাত্মক জাতের ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণ হারিয়েছেন।

গিবন, কীটস, এডগার অ্যালেন পো, হুইটম্যান, রবার্ট লুই স্টিভেন্‌সন, নিউটন, ডারুইন, মোপাসাঁ প্রভৃতি আরো কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন রোগের বর্ণনা আলোচ্য গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। যে সময়কার কথা এখানে পাওয়া যাবে সে সময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা ছিল না। আর ছিল না বেদনা-নিবারক ওষুধ। শুধু মৃত্যুকে অনেকেই ভয় করে না। কিন্তু মৃত্যুকালীন যাতনার আতঙ্কটা ভয়াবহ করে তোলে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বেদনার আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে মৃত্যুর মুহূর্ত অনেক সহজ হবে।

আলোচ্য বই থেকে দেখা যাবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর, প্রতিভাধর বিশ্ববিখ্যাত লেখক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি সকলেই আমাদের মতো রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তবু অসুস্থতার অজুহাতে তাঁদের সাধনা বন্ধ রাখেননি। রবার্ট

লুই স্টিভেন্‌সন মা'র কাছ থেকে যক্ষ্মারোগ নিয়ে জন্মেছিলেন তবু তাঁর সাহিত্যকীর্তি পরিমাণে কম নয়। স্টিভেন্‌সন তাঁর সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

I have wakened sick and gone to bed weary and I have done my work unflinchingly. I have written in bed and written out of it, written in haemorrhages, written in sickness, written torn by coughing, written when my head swam for weakness...

এই নিষ্ঠা অনেক ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিকে প্রেরণা দেবে, সন্দেহ নেই।

বর্তমান শতকে জীবনী-সাহিত্যের আঙ্গিক ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর একাধিক খণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ 'সরকারী' জীবনীগুলি প্রমাণের দলিলে কণ্টকিত; জীবনীকার সর্বত্রই নিজেকে আড়ালে রেখেছেন,—বস্তুকেন্দ্রিকতা ছিল তাঁর লক্ষ্য। তথ্যের নীচে জীবনের আসল রূপ প্রায়ই চাপা পড়ে যেত; যাঁর জীবনী তাঁকে দেখতে পাই বাইরের ঘটনার মধ্য দিয়ে। তাঁর মনোজগতের উত্থান-পতনের অন্তরঙ্গ পরিচয় জীবনচরিত থেকে পাওয়া যায় না। ফ্রয়েডের আবিষ্কারের পর সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য দেখা দিল এবং তার পটভূমিকায় এ-ধরনের জীবনীর প্রতি পাঠকের আগ্রহ হ্রাস পেল।

জীবনী রচনায় নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন লিটন স্ট্র্যাচি, ১৯১৮ সালে। তাঁর 'এমিনেন্ট ভিক্টোরিয়ান্স', 'কুইন ভিক্টোরিয়া' এবং 'এলিজাবেথ অ্যান্ড এসেক্স' প্রভৃতি জীবনী-গ্রন্থগুলির বিপুল জনপ্রিয়তা এই নতুন ধারার সার্থকতা প্রমাণ করল। উপন্যাসের কতকগুলি গুণ তাঁর জীবনীর মধ্যে পাওয়া যায়। উপন্যাসের ভঙ্গিতে জীবনী লেখার সূচনা তিনিই করেছেন। অথচ স্ট্র্যাচির রচনায় নিছক কল্পনাপ্রসূত কাহিনীসৃষ্টির প্রয়াস নেই। কাল্পনিক কথোপকথন বা দৃশ্য যেখানে আনা হয়েছে সেখানে তাদের সত্য বলে চালাবার চেষ্টা তিনি করেননি। মূলতঃ তাঁর জীবনী তথ্যনির্ভর; কিন্তু ঔপন্যাসিক যে-ভাবে কৌতূহলাবিষ্ট পাঠকের সামনে তাঁর নায়ক-নায়িকাকে সুকৌশলে উন্মোচিত করেন ঠিক তেমনি মনোজ্ঞ নীতি স্ট্র্যাচিও অবলম্বন করেছেন। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর চরিতগ্রন্থের মতো তথ্যের শুষ্ক মরুভূমি পাঠক ও জীবনীর নায়কের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে না; প্রথম থেকেই পাঠক নায়কের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

স্ট্র্যাচির পরে জীবনী-সাহিত্যে যাঁরা বৈচিত্র্য এনেছেন তাঁদের মধ্যে আঁদ্রে মরোয়া, এমিল লাডউইগ, স্টেফান ৎসভাইক, কার্ল স্যান্ডবার্গ, আরভিং স্টোন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা জীবনী সাহিত্যে যে নতুন যুগ এনেছেন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল: (১) রচনায় লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রসার; (২) তথ্যকে মুখ্য না করে শিল্পরূপকে প্রাধান্য দেওয়া এবং (৩) জীবনী রচনায় উপন্যাসের আঙ্গিক প্রয়োগ করা।

শেষোক্ত কারণই যে জীবনী-সাহিত্যকে জনপ্রিয় করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্যে আজকাল গল্প-উপন্যাসের পরেই জীবনী-সাহিত্যের স্থান। জীবনী ও উপন্যাসের মধ্যে সীমারেখাটা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের নিকটতম

জীবনী সমারসেট মমের 'দি মুন অ্যান্ড সিক্সপেন্স'। জীবনীকে এখানে চেনাই যায় না।

প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও জীবনী-সাহিত্যের উপর উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-গ্রন্থের অভাব রয়েছে। আঁদ্রে মরোয়া ও হ্যারল্ড নিকলসনের বই দু'টি বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত হলেও এখনো এ বিষয়ের প্রামাণ্য আলোচনা। লিওন ইডেল তাঁর নতুন বই 'Literary Biography'-তে জীবনী-সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যিকের জীবনী রচনার পদ্ধতি কি, এই হল তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তু। ইডেল হেনরি জেমসের চরিতকার এবং মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস সম্বন্ধেও তিনি একটি বই লিখেছেন। সুতরাং তাঁর আলোচনার পশ্চাতে অভিজ্ঞতার দাবি আছে। যদিও সাহিত্যিকের জীবনী রচনার বিভিন্ন স্তর ও কৌশল এ-বইয়ের আলোচ্য বিষয় তথাপি সকল শ্রেণীর জীবনী সম্বন্ধেই এর প্রতিপাদ্য বিষয় বহুলাংশে সত্য হতে পারে।

ইডেল জীবনীর সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ 'A biography is a record, in words, of something that is as mercurial and as flowing, as compact of temperament and emotion, as the human spirit itself.'

পারদের মতো সদা সঞ্চরণশীল এবং মেজাজ ও অনুভূতির সমষ্টি মানুষের জীবনকে ভাষায় রূপ দেওয়া কঠিন কাজ। কঠিনতর কাজ সাহিত্যিকের জীবনী রচনা করা। কারণ এ-ধরনের জীবনীতে আমরা দেখতে চাই লেখকের মনোজীবনের অন্তরঙ্গ ছবি। বাইরের ঘটনা লেখকের জীবনে প্রধান নয় ; সংসারের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর হৃদয়ে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সে পরিচয় না থাকলে সাহিত্যিকের জীবনী সার্থক হতে পারে না ; অথচ জীবনী-লেখকের পক্ষে অন্য একজনের মনের মধ্যে প্রবেশ করে তার সত্য রূপটি প্রকাশ করা সহজ নয়। এই জন্যই অন্যান্য শ্রেণীর জীবনীর তুলনায় সাহিত্যিকের জীবনী রচনা কঠিন কাজ।

লেখকের জীবন সম্বন্ধে পাঠকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ আছে। রোমান্টিক যুগের গোড়া থেকেই এই আগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে। সাহিত্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা যত বাড়ছে ততই লেখকের জীবন নিয়ে পাঠকরা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছে। যে এমন বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে পাঠকদের মুগ্ধ করতে পারে তার নিজের জীবন না জানি কি অপরূপ! সৃষ্টির উৎসকে জানবার এই কৌতূহল স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাচীনকালে সাহিত্যে যখন বস্তুকেন্দ্রিকতার প্রাধান্য ছিল, তখন লেখককে জানবার এমন আগ্রহ ছিল না। ব্যাস, বাল্মীকি, সেক্সপীয়র প্রভৃতির জীবনী আমাদের সামান্যই জানা আছে।

নিছক কৌতূহল ছাড়া সাহিত্যের প্রকৃত রসোপলব্ধির জন্যও লেখকের জীবনী জানা প্রয়োজন। যত সাবধানী লেখকই হোন না কেন রচনায় ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন ঘটে। তাই জীবন জানা থাকলে লেখকের শিল্পকর্মের পূর্ণ রসোপলব্ধি সম্ভব হয়। অবশ্য আজকাল একদল সমালোচক বলেন যে, প্রকৃত শিল্প শিল্পীর জীবন-নিরপেক্ষ।

শুধুই মা'র আঁচল ধরে ঘুরলে ছেলের যেমন জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের আশা থাকে না তেমনি শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের ঊর্ধ্বে যদি শিল্প উঠতে না পারে তা হলে তাকে মহৎ বলা যায় না। শিল্পকর্মের নিজস্ব পরিচয় থাকবে—সে পরিচয়ে স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো স্থান নেই। হেনরি জেমস এই প্রসঙ্গে বলেন : '...the life and the works are two very different matters, and an intimate knowledge of the one is not at all necessary for the genial enjoyment of the other.'

একালের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যের যুগে এ কথা যথার্থ বলে মনে হয় না।

ডঃ ইডেল দেখিয়েছেন যে, চরিতকারকে মোটামুটি পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। প্রথম হচ্ছে বিষয় নির্বাচন। কার জীবনী লিখব ? যেখানে অপরের নির্দেশে জীবনী লিখতে হয় সেখানে নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু লেখক স্বাধীনভাবে একটি জীবনকে যখন বেছে নেন তখন বুঝতে হবে এই জীবনের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ আছে। চরিতকার তাঁর নায়কের মধ্যে নিজের জীবনের আংশিক প্রসার দেখতে পান বলেই আত্মীয়তাবোধ জাগে। এর ফলে চরিত্রাঙ্কণে স্বভাবতই সজীবতা ও আবেশ ফুটে ওঠে। শেলীর আবেগ-উদ্বেল জীবনের মধ্যে মরোয়া নিজের যৌবনোচ্ছ্বাসের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন বলেই 'আরিয়েল' লিখেছিলেন। মরোয়া নিজেই বলেছেন : '...it seemed to me indeed that to tell the story of this life would be a way of liberating me from myself.' কিন্তু চরিতকারের যদি নায়কের প্রতি অন্ধ আসক্তি থাকে তাহলে জীবনী শুধু ভক্তের প্রশস্তিতে পরিণত হবে। ফ্রয়েড এ-বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

ডঃ জনসনের অভিমত ছিল : 'nobody can write the life of a man but those who have eat and drunk and lived in social intercourse with him.'

এদিক থেকে বস্‌ওয়েলকৃত তাঁর জীবনীর তুলনা নেই। ভিক্টোরিয়ান যুগের অনেক বিখ্যাত জীবনী আত্মীয় কিংবা অন্তরঙ্গ পার্শ্বচরের লেখা। জনসনের মত অনুসারে জীবনী রচনার অধিকার শুধু সমসাময়িক লেখকের। ব্যক্তিগত পরিচয় প্রথম শ্রেণীর জীবনী রচনায় যে অপরিহার্য নয় তার বহু প্রমাণ রয়েছে। বস্‌ওয়েলের মতো বিশেষ এক শ্রেণীর চরিতকারের পক্ষেই ব্যক্তিগত পরিচয় অত্যাবশ্যক।

জীবনীর নায়ক নির্বাচন করবার পর চরিতকারের কাজ হল তথ্য সংগ্রহ করা। একালের লেখকদের জীবন সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। চরিতকার গোয়েন্দার ঔৎসুক্য নিয়ে তথ্য সঙ্কলন করতে শুরু করেন। একটি জীবনের পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। চরিতকারের সঙ্গে সেই জীবনের প্রায়ই বড় রকম ব্যবধান থাকে। সে ব্যবধান সময়, সমাজ, ধর্ম ও ভৌগোলিক দূরত্বের। জীবনীর নায়কের অনেক আচরণের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। চরিতকারের নিকট এগুলি হল বড় সমস্যা।

এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য চরিতকার তথ্য সংগ্রহের রোমাঞ্চকর অভিযান আরম্ভ করেন।

বর্তমানে খ্যাতনামা লেখকদের জীবন সম্বন্ধে তথ্যের অভাব হয় না। লেখকের নিজের রচনা, তাঁর সম্বন্ধে সমসাময়িক ব্যক্তিদের লেখা, সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদির টেপ-রেকর্ডিং প্রভৃতি প্রচুর সংবাদ সরবরাহ করে। এবার চরিতকারের কাজ হল সংগৃহীত তথ্যগুলির বিচার। কোন্‌গুলি নির্ভরযোগ্য, কোন্‌গুলি নয়; কোন্ তথ্য জীবনীতে ব্যবহার করা হবে, কোন্ তথ্য করা হবে না। এই বিচারের উপর জীবনীর মূল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। স্টেফান ৎসভাইক লেখকদের জীবনী রচনায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় ইডেল তাঁর রচনা থেকে কোনো দৃষ্টান্ত দেননি। ৎসভাইক তাঁর নায়ক সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য সংগ্রহ করতেন। দৈনন্দিন খরচার হিসাব ও ধোপার খাতাও ছিল তাঁর কাছে মূল্যবান দলিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও বিবলিওথেক ন্যাশনালে তিনি দিনের পর দিন কাটাতেন তুচ্ছ সংবাদ সংগ্রহের জন্য। নায়কের জীবনের সম্ভাব্য সকল খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে সামনে রাখতে হবে। এগুলি হল জীবনীর কাঁচা মাল। জীবনকে শিল্পরূপ দিতে গিয়ে সংগৃহীত তথ্যের অর্ধেক হয়ত বাতিল হয়ে যায়। এমিল লাডউইগের ছিল ভিন্ন পদ্ধতি। তিনি প্রধানতঃ নির্ভর করতেন প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যের উপর। নতুন তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য তাঁর ব্যগ্রতা ছিল না।

জীবনী রচনার পরের ধাপ হল নির্বাচিত তথ্যগুলির মনোবিজ্ঞানমূলক ব্যাখ্যা। চরিতকার নায়কের অন্তরে প্রবেশ করে তথ্যগুলি দেখতে চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে চরিতকার লেখার সময় নিজেকে বিস্মৃত হয়ে নায়কের ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করতে পারলেই জীবনী সার্থক হতে পারে। বাহির থেকে নয়, ভিতর থেকে দেখানোর মধ্যেই চরিতকারের কৃতিত্ব।

চরিতকারের সর্বশেষ দায়িত্ব হল তাঁর নায়কের জীবনকে একটি বিশেষ যুগের পটভূমিকায় সংস্থাপিত করা। সমসাময়িক কাল ও পরিবেশকে উপযুক্ত মর্যাদা না দিলে কোনো জীবনই যথার্থরূপে ফুটে উঠতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর বড় বড় জীবনীগুলির নাম থেকেই বোঝা যেত জীবনের উপর কালের প্রভাব। যেমন, 'Life and Times of Milton,' 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ইত্যাদি। ব্যক্তির জীবনী একটি জানালা, যে জানালা দিয়ে বৃহত্তর জীবনকে দেখা যেতে পারে। চরিতকার যদি এই জানালাকে পাঠকের সামনে সম্পূর্ণরূপে খুলে দিতে পারেন তা হলেই তাঁর সৃষ্টি সার্থক।

স্বল্প-পরিসরে ডঃ ইডেল জীবনী-রচনার পদ্ধতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

লেখকেরা কি করে লেখেন? বিশেষ করে যাঁরা গল্প-উপন্যাস রচনা করে হাজার হাজার লোককে মুগ্ধ করেন তাঁদের শিল্পকৌশলের রহস্য কি? সে কোন্ ক্ষমতা যার সাহায্যে লেখক পাঠকদের কখনো হাসায় কখনো কাঁদায়? লেখকের তো আর কোন সম্বল নেই, শুধু চিরপরিচিত শব্দের বিশেষ প্রয়োগ এবং কতকগুলি ঘটনার সুকৌশল বিন্যাস! সাহিত্য-প্রতিভার এই গূঢ় রহস্য লেখক নিজেও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারেন না। তবু পাঠকদের কৌতুহলের শেষ নেই। এই কৌতুহল মেটাবার জন্য বহুবার খ্যাতনামা লেখকদের রচনা-কৌশল সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। এই ধরনের আর একটি নতুন বই বেরিয়েছে। বইটির নামঃ Writers at Work. "প্যারিস রিভিউ" কাগজের তরফ থেকে ষোলো জন সমকালীন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ সংকলন করা হয়েছে এই গ্রন্থে। সাক্ষাৎকারীরা তাঁদের প্রশ্নগুলি দক্ষতার সহিত রচনা করেছেন। তাই লেখকদের রচনার রহস্য কিছুটা উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভব হয়েছে। পাঠকদের নিকট এই রহস্যের সন্ধান শুধুই কৌতূহলের বিষয়, কিন্তু নতুন লেখকরা প্রবীণদের অভিজ্ঞতা থেকে লেখার কৌশল সম্বন্ধে নির্দেশ পাবেন। যে সব লেখকের মতামত আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যাবে তাঁদের মধ্যে আছেন ই. এম. ফরস্টার, ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক, জয়েস কেরি, উইলিয়াম ফকনার, জর্জ সিমেন*, আলবার্তো মোরাভিয়া প্রভৃতি।

গল্প বা উপন্যাস রচনায় মোটামুটি চারটি ধাপ আছে। প্রায় সকল লেখকই এই ধাপগুলি স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রথম গল্পের বীজ মনে আসে, তারপর কিছুদিন বীজ নিয়ে ভাবনা চলে; এর পরে আসে প্রথম খসড়া এবং সব শেষে সংশোধন ও পরিমার্জনার পর কাহিনীটি পাঠকের হাতে পড়ে।

কোনো একটা কথা শুনে, কোনো শব্দ শুনে কিংবা পুরনো কোনো স্মৃতি মনে পড়ায় হঠাৎ গল্পের আইডিয়া মনে আসে। হেনরি জেমস এই প্রসঙ্গে বলেছেনঃ "...the stray suggestion, the wandering word, the vague echo, at a touch of which the novelist's imagination winces as at the prick of some sharp point,...its virtue is all in its needle-like quality, the power to penetrate as finely as possible."

জয়েস কেরি একবার মানহাটান দ্বীপে বছর ত্রিশেকের এক তরুণীকে নৌকা করে বেড়াতে দেখতে পেলেন। খুব হাসি-খুশি মেয়েটি। কিন্তু কপালে গভীর বলিরেখা

পড়েছে। তার প্রাণচাঞ্চল্যের সঙ্গে কপালের এই রেখার সামঞ্জস্য ছিল না। তাই এই রেখাগুলি কেরিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করল। তিন সপ্তাহ পরে একদিন ভোর চারটায় তাঁর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল—একটা গল্পের প্লট পেয়েছেন স্বপ্নে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লেখা হয়ে গেল গল্পটা। গল্পের নায়িকার কপালে বলিরেখা। কেন এই রেখা এল প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলেন না কেরি। গল্পের পটভূমিকায় মানহাট্টান দ্বীপ ছিল না। শেষে মনে পড়ল সেই মেয়েটির কথা। সেই মেয়েটি অবচেতন মনে বাসা বেঁধেছিল, এখন গল্পের মধ্যে চুপি চুপি বেরিয়ে এসেছে।

অধিকাংশ লেখকই কিন্তু ঝটপট লেখেন না। গল্পের প্লট মাথায় এলে কিছু কাল ধরে তাঁরা ভাবতে থাকেন। এটা হল অঙ্কুরোদ্গমের সময়। গল্পের বীজকে কিভাবে পল্লবিত করা হবে তারই প্রস্তুতি। এ প্রস্তুতি যে সচেতন হতে হবে তার কোনো অর্থ নেই। লেখক হয়ত অন্য কিছু লিখছেন বা কাজ করছেন, আর তাঁর অজ্ঞাতসারে মনের এক অন্ধকার কোণে গল্প বীজের খোলস ভেঙ্গে পল্লবিত হচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য গল্প নিয়ে ভাবতে বসেন সক্রিয়ভাবে। কোনো লেখক দশ বারো বছর পরে গল্পের আইডিয়াকে রূপ দেন। আবার সিমেনঁ-র মতো লেখকরা অপেক্ষা করতে পারেন না। আইডিয়া মাথায় এলেই কলম নিয়ে বসেন।

প্রথম খসড়াটা অনেকেই দ্রুত শেষ করেন। নতুন লেখকদের মুশ্কিল লেখা শুরু করা নিয়ে। গোড়াতেই পাঠকদের মুগ্ধ করে দিতে হবে—এমন একটা দুর্বলতা তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। তাই মনের মতো করে লেখা আরম্ভ করাই তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞ লেখকরা খসড়া কপিতে গল্পের আরম্ভ নিয়ে খুব মাথা ঘামান না। মোপাসাঁর মতো তাঁরা বিশ্বাস করেন, কলম দিয়ে কাগজের উপর আঁচড় কাটতে কাটতে লেখার উৎস মুক্ত হবে।

খসড়া শেষ হবার পর শুরু হয় পরিমার্জন ও সংশোধন। কোন কোন লেখকের সংশোধন ও পরিবর্তনের আর শেষ নেই। ছাপা হবার পূর্ব পর্যন্ত কেবলই এখানে ওখানে অদল-বদল চলে। জেমস থারবার হয়ত একটি গল্প নতুন করে বার পনেরো লেখেন। আবার কেউ কেউ পরিবর্তন ও সংশোধন পছন্দ করেন না। প্রথমবার যা লেখা হয়েছে মোটামুটি সেটাই থেকে যায়। বারবার ঘষা-মাজা করলেই যে লেখার মান উন্নত হবে এমন কোন কথা নেই। ফরাসী লেখিকা ফ্রাঁসোয়া সাগান লিখেছেন 'বঁজুর ত্রিসতেস'। এই-বইয়ের সাত লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে ফ্রান্সে। তাঁর পরবর্তী বই A Certain Smile-ও কম বিক্রি হয়নি। এই দুটি বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ একমাত্র আমেরিকায় বিক্রি হয়েছে, কুড়ি লক্ষ কপি। অথচ সাগানের সংশোধন করবার ধৈর্য নেই। একবার যা লেখেন পাঠকদের হাতে প্রায় সেই লেখাই পেঁছায়। অবশ্য 'বঁজুর ত্রিসতেসের' সমাপ্তিটা প্রকাশকের পরামর্শে কিছু বদলে দিতে হয়েছিল।

আঁদ্রে জিদ সিমেনঁকে সমকালীন ফরাসী সাহিত্যের 'সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী' ঔপন্যাসিক বলেছেন। এ-পর্যন্ত তিনি স্ব-নামে দেড়শ' এবং ছদ্মনামে প্রায়

সাড়ে তিনশ' উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি 'ফ্রান্সের কনান ডয়েল' বলে ইংলন্ডে আমেরিকায় পরিচিত। কিন্তু রহস্য উপন্যাস ছাড়াও তিনি মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস কম লেখেননি। প্রথম যখন কাগজে গল্প পাঠাতে আরম্ভ করলেন বারবার লেখা ফেরত আসতে লাগল। কলেৎ ছিলেন একটা কাগজের গল্প-সম্পাদক। তিনি উপদেশ দিলেন যে, লেখার যে অংশগুলি খুব সাজানো-গোছানো সাহিত্যগন্ধী মনে হবে, সেই সব অংশ বাদ দিলেই লেখা ভালো হবে। একটি বিচ্ছিন্ন সুন্দর বাক্যের মোহে নতুন লেখক প্রায়ই সম্পূর্ণ লেখাটা মাটি করে। সিমেনঁ এই উপদেশ শুনে রচনারীতি পরিবর্তন করায় সাফল্যলাভ করেছিলেন।

সিমেনঁ বলেন যে, উপন্যাস রচনা একটি জ্যামিতিক সমস্যার মতো। জ্যামিতির সমস্যা সমাধানের জন্য যেমন নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করতে হয়, উপন্যাসের বেলাতেও তেমনি। লেখকের মনের সামনে ভেসে উঠেছে একটি বিশেষ চরিত্রের পুরুষ ও নারী এবং তারা বাস করছে এক বিশেষ পরিবেশে। এই অবস্থায় গল্পকার ঘটনার আবর্তে নায়ক-নায়িকাকে ভাসিয়ে দেবে,—দেখবে তারা কতদূর যেতে পারে। নায়ক-নায়িকার ক্রমবিবর্তন একটা নিয়ম অনুসারেই চলে, সেই নিয়ম যদি লেখকের জানা থাকে তাহলে দ্রুতগতিতে লেখা এগিয়ে যেতে পারে।

সমালোচকরা প্রায়ই ঔপন্যাসিকের জীবন-দর্শন, সমাজ-সচেতনতা, জাতির প্রতি দায়িত্ব ইত্যাদি গম্ভীর কথা শুনিয়ে থাকেন। কিন্তু বর্তমান সঙ্কলন থেকে দেখছি, লেখক-লেখিকার লেখা সম্বন্ধে তেমন গম্ভীর ধারণা পোষণ করেন না। ফ্র্যাঙ্ক ও'কনার, ফরস্টার, অ্যাঙ্গাস উইলসন, আলবার্তো মোরাভিয়া প্রভৃতি ঔপন্যাসিক লেখক-বৃত্তি লঘুভাবে গ্রহণ করেছেন। লিখে আনন্দ পান এটাই তাঁদের কাছে সব চেয়ে বড় কথা। সিমেনঁ বলেন ঃ

/ "I think that if a man has the urge to be an artist, it is because he needs to find himself. Every writer tries to find himself through his characters, through all his writing."

এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্য আছে বলে অধিকাংশ লেখকই স্বীকার করেন না। বিশেষ করে ফরস্টার, মোরিয়াক, কেরি, থারবার, ফকনার, সিমেনঁ. মোরাভিয়া ও সাগান-এর সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ নতুন লেখকদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ এবং সাধারণ পাঠকদের নিকটও কৌতুহলোদ্দীপক হবে।

উইলিয়ম ফকনার লেখক ও তার রচনা সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। মনে হল একমাত্র তিনিই এ-বিষয়ে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে পেঁাছেছেন।

ফকনার বলেন, শিল্পে যে পূর্ণতার স্বপ্ন আমরা দেখি, তা আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি। সকল সৃষ্টির মধ্যে অপূর্ণতা রয়ে যায় বলেই শিল্পী ও লেখক তাদের সাধনা অব্যাহত রাখে। হয়ত পরবর্তী সৃষ্টি আরো ভালো হবে—এই আশা।

প্রতিভা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম করবার ক্ষমতা—প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের এই গুণগুলি থাকা চাই। অন্যের চেয়ে বড় হবার কথা ভেবে লাভ নেই। নিজে যা করেছ, তার চেয়ে আরো উন্নতি করবার স্বপ্ন দেখবে। শিল্পী সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন অদৃশ্য এক দৈত্যের তাড়নায়। তার আদেশ না মেনে মুক্তি নেই। কেন যে দৈত্য তাকেই নির্বাচন করেছে শিল্পীর তা জানা নেই; ভাববার সময় নেই। চুরি করে হোক, ডাকাতি করে হোক ভিক্ষা করে হোক, শিল্পীকে দৈত্যের আদেশ পালন করতে হবে।

—তা হলে লেখক কি নির্মম হবে ?

—হাঁ, হবে বৈকি! লেখকের একমাত্র দায়িত্ব তার সৃষ্টি। সৃষ্টির স্বপ্ন সফল করবার জন্য তাকে নির্মম হতে হবে। যতক্ষণ স্বপ্নকে শিল্পের মধ্যে মূর্ত করে তুলতে না পারে ততক্ষণ তার শান্তি নেই। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে সম্মান, গর্ব, ভদ্রতা, নিরাপত্তা, সুখ—সবকিছু ধুলোর মতো উড়িয়ে দিতে হবে।

—লেখকের কি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই ?

—না, নেই। তার শুধু পেন্সিল আর কাগজের প্রয়োজন। আর্থিক সাহায্য পেয়ে লেখা উন্নত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত জানি না। সত্যিকারের ভালো লেখক কখনো সাহায্যের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করে না। এ সব কথা ভেবেচিন্তে কাজ করবার সময় তার নেই। নির্বোধ হলেই সে দারিদ্র্যের অজুহাত তুলবে। মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো কিছুই সত্যকার ভালো লেখকের শিল্পসত্তা ধ্বংস করতে পারে না। ভালো লেখক কখনো সাফল্য ও অর্থের জন্য লালায়িত হয় না। জীবনের সাফল্য হল আদরলোভী মেয়ের মতো—একটু আদর পেলেই যে মাথায় চড়ে বসে, আর নামানো ভার। তাকে মাথায় ওঠাবার অর্থ জীবন থেকে শিল্পকে তাড়ানো। সুতরাং সফলতাকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না, দূরে দূরে রাখবে। তাহলে সে তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে।

সিনেমার জন্য লিখলে মৌলিক রচনার কি ক্ষতি হয় ?

—ক্ষতি হয় না। প্রথম শ্রেণীর লেখকের এ সব কাজ করলেও ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত লেখকরা সমসাময়িক লেখকদের রচনা খুবই কম পড়েন। ফকনারও সমকালীন লেখকদের বই বড় একটা পড়েন না। যৌবনে যে সব বই ভালো লেগেছে, সেগুলিই বারবার করে পড়তে ভালোবাসেন।

সমালোচকের কথা শোনবার সময় নেই লেখকের। যারা লেখক হতে চায় তারা সমালোচনা পড়ে; যারা লিখতে চায় তাদের সময় নেই সমালোচনা পড়বার। শিল্পীর রচনা সমালোচককে উদ্বুদ্ধ করবে; সমালোচকের লেখা শিল্পী ব্যতীত সকলের মনে সাড়া জাগাতে পারে।

বিখ্যাত উপন্যাসে আমরা যে-সব অবিস্মরণীয় চরিত্র দেখতে পাই তারা কি লেখকদের কল্পনাপ্রসূত? বাস্তব জীবনের সঙ্গে কি তাদের কোনো সম্পর্ক নেই? অনেক লেখক পাঠকদের প্রথমেই বলে দেন যে, তাঁর চরিত্রগুলি নিছক কাল্পনিক। কিন্তু যে চরিত্র শুধুই কল্পনা দিয়ে গঠিত তা কখনো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে উপন্যাসের যে চরিত্রগুলি স্থায়ী আসন লাভ করেছে তাদের আমরা জীবন্ত নর-নারী বলে গ্রহণ করি। তাদের বেদনায় দুঃখিত হই, তাদের আনন্দে খুশি হই। বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে চরিত্রগুলি জীবন্ত হতে পারে না। একটি সার্থক চরিত্র সৃষ্টির জন্য দৈবানুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়,—গেটের/ নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে:

"No productiveness of the highest kind, no remarkable discovery, no great thought that bears fruit and has results, is in the power of anyone; such things are above earthly control. Man must consider them as an unexpected gift from above." প্রতিভার স্ফুরণে দৈবের সহায়তা কতখানি, সে আলোচনা এখানে করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু লেখকের নিজস্ব প্রস্তুতি ছাড়া দৈবানুগ্রহ লাভ যে সম্ভব নয় একথা নিশ্চিত।

লেখক বাস্তব জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। কিন্তু তাই বলে তাঁর চরিত্রের বাস্তব প্রতিরূপ কোথাও দেখা যাবে না। উপন্যাসের একটি চরিত্র হয়ত তিনি গড়েছেন বাস্তব জীবনে দেখা পাঁচটি মানুষের ছায়া থেকে। পুরনো অভিজ্ঞতাকে উপযুক্তভাবে সাজিয়ে কাজে লাগানোটাই লেখকের কৃতিত্ব। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি লেখকের কাঁচা মাল; তাদের যথার্থ প্রয়োগের উপরে নির্ভর করে তাঁর চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে চরিত্রগুলি দাঁড়িয়ে আছে বলেই তাদের জীবন্ত মনে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে লেখক কখনো আবদ্ধ থাকে না। চরিত্রকে সম্পূর্ণতা দান করবার জন্য কল্পনার সাহায্যও গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং উপন্যাসের চরিত্র বাস্তব জীবনের সঙ্গে কতটা যুক্ত এবং লেখকের কল্পনাই বা কতটা সাহায্য করেছে তা বিশ্লেষণ করা কঠিন। সমারসেট মম এ সম্বন্ধে বলেছেন:

"More often I have taken persons I know, either slightly or intimately, and used them as the foundation of characters of my

own invention. To tell you the truth, fact and fiction are so intermingled in my work that now, looking back, I can hardly distinguish one from the other."

বাস্তব জীবনের একটি ঘটনা কিংবা চরিত্রের উপর ভিত্তি করে অনেক প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্র বা ঘটনার মিশ্রণের দ্বারা একটি কাহিনী গড়ে তোলবার চেষ্টা লেখক করেন না। অনেক অনুসন্ধানের ফলে উপন্যাসের পশ্চাদ্বর্তী ঘটনা বা চরিত্রের বাস্তবরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। থিওডোর ড্রেজারের "অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি" এমনি একটি বাস্তব কাহিনী নিয়ে রচিত। ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্ক রাজ্যের অন্তর্গত একটি হ্রদে একদিন দেখা গেল যে, একটি নৌকা উল্টে আছে, আর নৌকার পাশে ভাসছে দুটি টুপি, একটি মেয়েদের, অন্যটি ছেলেদের। প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে দু'টি তরুণ-তরুণী হ্রদের জলে ডুবে মরেছে, এই হল সকলের সিদ্ধান্ত। জাল ফেলে যে তরুণীটির মৃতদেহ উদ্ধার করা হল তার নাম গ্রেস ব্রাউন। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল মিস ব্রাউনের জলে ডুবে মৃত্যু হয়নি, মাথায় আঘাত দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মিস ব্রাউন ছিল গর্ভবতী,—হত্যার উদ্দেশ্য এ থেকেই অনুমান করা যায়। বলা বাহুল্য যে, পুরুষ সঙ্গীর মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

পুলিশের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল মিস ব্রাউন যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করত সেই ফ্যাক্টরির মালিকের ভাইপো চেস্টার গিলেটের সঙ্গে ছিল তার প্রণয়। গিলেট তাকে নিয়ে কয়েক দিন খেলা করবার উদ্দেশ্যে মেলামেশা করত। বিয়ে করবার কথা তার মনেও হয়নি। সেজন্য আছে অভিজাত ঘরের মেয়েরা। মিস ব্রাউনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার প্রয়োজন যখন দেখা দিল তখন গিলেট আবিষ্কার করল তা আর সম্ভব নয়; কারণ, মিস ব্রাউন গর্ভবতী। দায়িত্ব এড়াবার জন্য গিলেট তাকে হত্যা করেছে। বিচারে গিলেটের প্রাণদণ্ড হল। কিন্তু সে অমর হয়ে আছে ড্রেজারের 'অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি'র নায়ক ক্লাইড গ্রিফিথস্-এর মধ্যে। গিলেট তথা ক্লাইড গ্রিফিথস্-এর মতো অনেক ভদ্রবেশী শয়তান আমেরিকান তরুণীদের যে সর্বনাশ করছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল ড্রেজারের উদ্দেশ্য।

আনাতোল ফ্রান্সের 'দি রেড লিলি' পল ভার্লেনের জীবনীর উপন্যাসরূপ। আলডুস হাক্সলি তাঁর 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' উপন্যাসের মার্ক র‍্যামপিয়ন ও বিয়াট্রিস যথাক্রমে ডি. এচ্. লরেন্স ও ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড-এর আদর্শে সৃষ্টি করেছেন। সমারসেট মম-এর 'দি মুন অ্যান্ড সিক্সপেন্স'-এর নায়ক চার্লস স্ট্রীকল্যান্ড যে শিল্পী গগ্যাঁ, সে কথা আজ কারো অবিদিত নেই। তাঁর 'কেক্স অ্যান্ড এইল'-এ এডোয়ার্ড ড্রিফিল্ডের মধ্যে আমরা পাই টমাস হার্ডিকে। সমারসেট মম বলেছেন যে, বিশ্ব সাহিত্যের দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে স্তঁদলের 'দি রেড অ্যান্ড দি ব্ল্যাক' একটি। পুরনো সংবাদপত্র দেখতে দেখতে একটি হত্যার কাহিনী স্তাঁদলকে আকৃষ্ট করে। এই

ঘটনাটিকেই স্তাদল তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছেন।

/ স্কটের 'আইভান হো' আমাদের দেশে অনেকেই পড়েছেন। কয়েক বছর পূর্বেও ছাত্রদের এ বই পড়তে হতো। এই উপন্যাসের অবিস্মরণীয় চরিত্র সুন্দরী ইহুদি তরুণী রেবেকা। স্কট লেখা শুরু করবার পূর্বে যখন কাহিনীর পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন তিনি সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন এই ইহুদি তরুণীর চরিত্র নিয়ে। কারণ স্কটের সঙ্গে কোনো ইহুদি মেয়ের পরিচয় ছিল না। সুতরাং একটি জীবন্ত চরিত্র আঁকা কঠিন মনে হয়েছিল। ঐ সময় আমেরিকার সুবিখ্যাত লেখক ওয়াশিংটন আরভিং কয়েক দিনের জন্য স্কটের অতিথি হয়েছিলেন। তিনি আমেরিকার এক ইহুদি তরুণীর কাহিনী বলে স্কটকে সাহায্য করলেন। সেই ইহুদি তরুণীর নামও রেবেকা ; সে পরমা সুন্দরী, ধর্মপরায়ণা এবং ধনী পিতার কন্যা। সে এক যুবককে গভীরভাবে ভালোবাসল ; ভালোবাসবার পরে জানতে পারল তার ধর্ম আলাদা। ধর্ম ও প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলল কয়েক বছর ধরে। তারপর শেষ পর্যন্ত ধর্মের জন্য সেই যুবককে ত্যাগ করল। কিন্তু রেবেকা জানত সে জীবনে আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। তাই বিয়ে করবার কথা ভুলে সে সেবাব্রত গ্রহণ করল। এই রেবেকা ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। আইভান হোর রেবেকা যে তিনিই, একথা তাঁর অজানা ছিল না।

/ জর্জ মেরিডিথ তাঁর উপন্যাস 'ডায়না অব দি ক্রসওয়েস'-এর নায়িকা ডায়না ওয়ার-উইককে এঁকেছেন অভিজাত বংশের সুন্দরী ক্যারোলাইন নর্টনের কাহিনী অবলম্বনে। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে মিঃ নর্টন আদালতে অভিযোগ করেন যে. ইংলন্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবর্নের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর অবৈধ প্রণয় আছে। ক্যারোলাইন মন্ত্রিসভার গোপন কথা 'টাইমস' পত্রিকার নিকট বিক্রি করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছিল। মেরিডিথের কাহিনীর সঙ্গে ক্যারোলাইনের জীবনের ঘটনাগুলির সামঞ্জস্য এত সুস্পষ্ট যে বই ছাপা হবার পর মানহানির মামলার ভয়ে মেরিডিথ একটু কৈফিয়ৎ জুড়ে দিয়েছিলেন।

একজন সমালোচক বলেছেন যে, বিশ্ব-সাহিত্যে মাদাম বোভারির মতো পূর্ণাঙ্গ নারী-চরিত্র আর একটিও নেই। এই চরিত্র বাস্তব জীবনের কোন্ নারীর আদর্শে রচিত একথা ফ্লবেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলতেন, আমিই মাদাম বোভারি। একথা খানিকটা সত্য। / ফ্লবেয়ারের নিজের অনেক কথা তাঁর নায়িকার মারফৎ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আসলে মাদাম বোভারির পশ্চাতে আছে এক গ্রাম্য ডাক্তারের অসতী তরুণী স্ত্রী মাদাম ডি লা মেয়ার।

জোলা বলতেন, তাঁর উপন্যাসের প্লট আবিষ্কারের প্রতিভা নেই, সব সত্য কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'নানা'। 'নানা' লেখকের নিছক কল্পনা নয় ; সে সত্যি একদা ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী বারবনিতা ছিল। অবশ্য তার আসল নাম ছিল লা পেভা। পেভা প্রৌঢ় বয়সে প্যারিসের শহরতলীতে যখন

বাস করত তখন জোলা তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে জীবনের সকল ঘটনা একটু একটু করে জেনে নিয়ে 'নানা' লিখেছেন।

ভিক্টর হ্যুগোর 'লে মিজারেবল'-এর নায়ক জাঁ ভালজিন ফ্রান্সের একজন অতি সাধারণ কবি ও দার্শনিক ফ্রাঁসোয়া গেলার্ড-এর অনুসরণে অঙ্কিত। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে চুরির অপরাধে গেলার্ডের যখন জেল হয় তখন জনসাধারণের সহানুভূতি ছিল তার উপর। কিন্তু কয়েক বছর পরে মাত্র পাঁচ শ' ফ্রাঁর জন্য বৃদ্ধা মাকে হত্যা করবার পর তার উপর সবাই বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নবীন ইংরেজ লেখকদের উপর লী হান্টের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনিই শেলি ও কীটসের প্রতিভাকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর উদারমতাবলম্বী কাগজ 'এগ্‌জামিনার' সর্বদাই নতুন লেখকদের উৎসাহ দিত। হান্টের চরিত্রে অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এমন একটা মাধুর্য ছিল যার জন্য বহু লেখক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ডিকেন্স হান্টের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে ; ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ডিকেন্স হান্টের বিদ্রূপাত্মক প্রতিরূপ রচনা করে এক যুগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সমাপ্ত করেন। এ কয় বছর ডিকেন্স হান্টকে যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। তাঁর নিজের কাগজে হান্টের লেখা ছাপিয়ে সর্বাপেক্ষা উচ্চহারে পারিশ্রমিক দিয়েছেন। হান্টকে আর্থিক সাহায্য দেবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। ডিকেন্স যে এর শুধু উদ্যোক্তা ছিলেন তাই নয়, তিনি অভিনয় করতেও নেমেছিলেন। কিন্তু যখন সুযোগ এল তখন শিল্পী ডিকেন্স হান্টের চারিত্রিক ত্রুটিগুলি অবলম্বন করে একটি বিদ্রূপাত্মক চরিত্র সৃষ্টির লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর 'ব্লীক হাউস' উপন্যাসের হ্যারল্ড স্কিমপোল চরিত্রটি হান্টের ব্যঙ্গচিত্র। স্কিমপোলকে যদিও পার্শ্বচরিত্র হিসাবে আনা হয়েছে, তবু শেষ পর্যন্ত নায়ক অপেক্ষাও সে প্রাধান্য লাভ করেছে। জেনিংস নামে এক ভদ্রলোক পনেরো লক্ষ পাউন্ডের সম্পত্তি রেখে মারা যান। উইল করে না যাওয়ায় এই সম্পত্তি নিয়ে ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে মামলা শুরু হয়। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই মামলা চলেছে, কিন্তু কোনো মীমাংসা হয়নি। এই মামলার কাহিনী 'ব্লীক হাউসের' উপজীব্য। বিচারে যে দীর্ঘসূত্রতা চলে, এবং তার ফলে কত লোক যে কিরূপ দুঃখ ভোগ করে, তা দেখানোই ছিল ডিকেন্সের উদ্দেশ্য। বিচার বিভাগের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। লী হান্ট অবশ্য গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে ডিকেন্সও এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

/ শার্লক হোম্‌স-এর কাহিনী সকল স্তরের পাঠকের নিকট সুপরিচিত। কনান ডয়েল এই অমর চরিত্রটি ডাঃ জোসেফ বেলকে দেখে সৃষ্টি করেছেন। কনান ডয়েল যখন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র ছিলেন তখন ডাঃ বেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ডাঃ বেল ছিলেন তাঁর শিক্ষক। চিকিৎসক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। তিনি রোগীর দিকে একবার তাকিয়েই বলে দিতে পারতেন কি অসুখ ; পেশা কি, জাতি কি, ইত্যাদি।

শার্লক হোমসের বিভিন্ন গল্পে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সবই ডাঃ বেলের কথা। কনান ডয়েল ছাত্র জীবনে অনেকগুলি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, আবার কতকগুলির কথা অপরের নিকট শুনেছেন। ডাঃ বেল যে শুধু রোগ নির্ণয়ের জন্য তাঁর তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োগ করতেন তা নয়, অপরাধের কিনারা করতেও ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। পুলিশ কর্তৃপক্ষ অনেক সময় তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতেন। বিচার বিভাগের নথিপত্র থেকে প্রমাণিত হবে যে, ডাঃ বেল কয়েকটি জটিল হত্যার রহস্য ভেদ করেছিলেন।

ডাঃ বেলের কার্যকলাপ দেখে ছাত্ররা তাঁকে যাদুকর বলে মনে করত। কনান ডয়েলও তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ডাক্তারীতে যখন তাঁর পশার জমল না, তখন তিনি লেখা শুরু করলেন। গোড়া থেকেই ডাঃ বেলের অদ্ভুত কীর্তিকলাপ তিনি লেখার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শার্লক হোমস বেঁচে রইল, কিন্তু ডাঃ বেলের খোঁজ আর কেউ রাখে না।

ডিফোর নাম 'রবিনসন ক্রুসো' লিখে চিরস্মরণীয় হয়েছে। অথচ 'রবিনসন ক্রুসো'র পূর্বে তিনি যে ২৯১ খানা বই লিখেছেন তার ক'খানার নামই বা আমরা জানি? 'রবিনসন ক্রুসো'র কাহিনী সাহিত্যে স্থান লাভের কারণ হয়তো এই যে, একটি প্রকৃত ঘটনার উপন্যাসরূপ দেবার ফলে ডিফোকে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে হয়নি। কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তিনি যা রচনা করেছেন সেগুলি উতরায়নি। প্রকৃত রবিনসন ক্রুসোর নাম আলেকজান্ডার সেলকার্ক। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে সেলকার্ক প্রশান্ত মহাসাগরের চার মাইল চওড়া ও তের মাইল লম্বা এক দ্বীপে আশ্রয় লাভ করে। সভ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য সেই দ্বীপে চার বৎসর যাবৎ তার দিন কিভাবে কেটেছে সেই বিবরণ পাওয়া যাবে 'রবিনসন ক্রুসো'র কাহিনীতে। চার বৎসর পরে যে জাহাজ সেলকার্ককে উদ্ধার করে তার কাপ্তেন উড্স রোজার্স প্রথম এই অজানা দ্বীপে বসবাসের কাহিনী বইয়ের মারফৎ প্রচার করেন।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের এক শীতের রাত্রি। রবার্ট লুই স্টিভেন্সন হঠাৎ ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটাবার জন্য ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন। তাতে স্টিভেন্সন স্ত্রীর উপরে চটে উঠলেন। একটি আস্ত কাহিনী স্বপ্নে প্রায় পেয়ে যাচ্ছিলেন, ঘুম ভেঙে সব মাটি হয়ে গেল। প্রকাশক তাঁকে একটি জনপ্রিয় রোমাঞ্চকর কাহিনী লিখতে বলেছে; ছোট বই, দাম হবে এক শিলিং। স্টিভেন্সন কদিন থেকে বইয়ের প্লট কি হবে তাই নিয়ে ভাবছেন। তিনি প্রায় চিররুগ্ণ্। ক্ষয়রোগের প্রধান উপসর্গ জ্বরে তিনি সর্বদাই ভুগতেন। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে প্লটের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমের মধ্যে জেগে উঠল পূর্ব পরিচিত এক কাহিনী। এই কাহিনী এডিনবার্গ শহরের ডীকন উইলিয়াম ব্রডির। ব্রডি দিনের বেলা ধর্মভীরু ব্যবসায়ী এবং নগর সমিতির সম্মানিত কর্মী। সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র; সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি। দিনের বেলা লোকে টাকাকড়ি কোথায় কিভাবে রাখে তা লক্ষ্য করে; রাত্রিতে ছদ্মবেশ ধারণ

ক'রে চুরি করতে বের হয়। ক্রমশঃ সাহস বেড়ে গেল, দল গড়ে তুলল; চুরি থেকে ডাকাতি, লুঠ, ইত্যাদি আরম্ভ হল। এডিনবার্গের নাগরিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল; গভর্নমেন্টের সকল অনুসন্ধান কিছুকাল ফলপ্রসূ হল না। ব্রডির উপরে লোকের এমন অগাধ বিশ্বাস যে তাকে দু'একজন স্বচক্ষে চুরি করতে দেখেও বিশ্বাস করতে পারেনি, ভেবেছে নিশ্চয় ভুল দেখেছে। তার চুপ করে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত অতি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ব্রডি ধরা পড়েছিল।

স্টিভেন্সন ছেলেবেলায় ব্রডির গল্প শুনেছেন। তার পর থেকে তাকে ভুলতে পারেননি! মাত্র চৌদ্দ বছর বয়েস স্টিভেন্সন ব্রডির জীবনীর নাট্যরূপ রচনা করেছিলেন। প্রকাশকের তাগিদ পেয়ে ব্রডির কাহিনী আর এক বার তাঁর মাথায় এল। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল বটে, কিন্তু তক্ষুণি তিনি লিখতে বসলেন। কয়েক দিনের মধ্যে গল্পটি শেষ করে স্ত্রীকে পড়ে শোনালেন। স্ত্রী শুনে বললেন, গল্পটি এমনিতে ভালোই হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে কোনো বৃহত্তর ইঙ্গিত নেই। এই মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হয়ে স্টিভেন্সন পাণ্ডুলিপি জ্বলন্ত উনানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ক্রোধ শান্ত হবার পর একেবারে নতুন করে লিখতে বসলেন ব্রডির কাহিনী। অসুস্থ শরীরে তিন দিন, তিন রাত্রি অশ্রান্তভাবে লিখে ত্রিশ হাজার শব্দের গল্পটি শেষ করলেন। এই বইটিই 'দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডাঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড।' প্রথম ছ'মাস এ বইয়ের চল্লিশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। যে 'বৃহত্তর ইঙ্গিতের' অভাব সম্বন্ধে স্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন দ্বিতীয়বারের রচনায় স্টিভেন্সন তা দূর করেছেন এবং এই জন্যই বইটি বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। 'বৃহত্তর ইঙ্গিতটি' হলো এই যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভালো ও মন্দের মিশ্রণ আছে, এবং সে দ্বৈত-জীবন যাপন করে।

/ Irving Wallace বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের পশ্চাতে যে-সব ঐতিহাসিক নরনারী রয়েছে তাদের পরিচয় দিয়েছেন The Fabulous Originals of Extraordinary People who Inspired Memorable Characters in Fiction নামক গ্রন্থে। উপন্যাস লেখক এবং পাঠক উভয়ের নিকটই বইটি সমাদর লাভ করবে।

ভারতীয় সভ্যতা কত গভীরভাবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলিকে প্রভাবান্বিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন থেকে। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম আমাদের প্রতিবেশীদের ধর্মজীবনেই একমাত্র আলোড়নসৃষ্টি করেনি ; তাদের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করতেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে ভারতীয় ইতিহাসের স্বাক্ষর রয়েছে, সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে এদের কথাও জানা প্রয়োজন।

ব্রহ্ম, শ্যাম, জাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির প্রসার সম্বন্ধে যতটা আলোচনা হয়েছে চীনের শিল্পকলায় ভারতের প্রভাব নিয়ে ততটা আলোচনা হয়নি। চীনের নিজস্ব শিল্পধারা বিশেষ উন্নত ছিল। ভারতীয় পদ্ধতি হয়তো সেখানে সমাদর লাভ করত না, যদি না সে বৌদ্ধধর্মের সহগামী হতো। ধর্মের সঙ্গে যার যোগ তা পবিত্র, সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণযোগ্য।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চীনা বণিকরা এই আশ্চর্য নতুন ধর্মের কথা দেশে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর একে একে কত পরিব্রাজক হিমালয় পার হয়ে মধ্য এশিয়ার পথে চীনে প্রবেশ করে বুদ্ধবাণী প্রচার করেছেন। প্রথম প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম চীনে সমাদর লাভ করেনি , অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ শুরু হলো ওয়েই সম্রাটদের রাজত্ব কালে। রাজবংশের অনেকেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন ; কেউ কেউ রাজত্ব ছেড়ে গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় চীন, মঙ্গোলিয়া ও তুর্কীস্থানে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির স্থাপিত হলো। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা মুক্তি পেলেন বাধ্যতামূলক সামরিক দায়িত্ব এবং কর দেবার দায় থেকে। বৌদ্ধ বিহারগুলির জন্য বরাদ্দ হলো মোটা টাকা। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জীবনে এল স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রচুর অবসর। তাঁরা সুযোগ পেলেন বিহার ও মন্দিরগুলিকে শিল্পমণ্ডিত করে তুলতে।

উত্তর চীন, মঙ্গোলিয়া এবং তুর্কীস্থানে হাজার হাজার বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে পাহাড় কেটে যে গুহামন্দির করা হয়েছিল কালের হাত এড়িয়ে তাদের কয়েকটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ য়ুংকাঙ্ (Yun-Kang) গুহামন্দির সমষ্টি। লুঙ্মেন-এর গুহামন্দিরগুলি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

য়ুংকাঙ্ স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট শি-কু-সি বা পাহাড়ে মন্দির নামে পরিচিত। পাহাড় কেটে এই মন্দির করা হয়েছিল বলে দেড় হাজার বছর পরেও এর শিল্প নিদর্শনগুলি অবিকৃত রয়েছে। চীনের শানশি প্রদেশে পিকিং-পাওতো রেল লাইনের উপরে তাতুঙ্ একটি প্রধান শহর। এই তাতুঙ্ থেকে প্রায় আট মাইল পশ্চিমে য়ুচাউ নদীর তীরে য়ুংকাঙ্ গ্রাম অবস্থিত। নদীর তীর ঘেঁষে যে পাহাড়

উঠেছে সেই পাহাড় কেটে গুহামন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। বৃহৎ ও মধ্যম আকারের মন্দিরের সংখ্যা চল্লিশেরও অধিক; তাছাড়া ছোট গুহা এবং পাথর কেটে কুলুঙ্গি ও খোঁজখাঁজ করা হয়েছে অসংখ্য। উত্তর ওয়েই রাজবংশের সম্রাট ওয়েণ-চেঙ্-এর রাজত্বকালে অধিকাংশ গুহামন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। এদের নির্মাণকাল মোটামুটি ৪৬০ থেকে ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাতুঙ্ ছিল উত্তর ওয়েই রাজবংশের রাজধানী। রাজধানী হোনানের অন্তর্গত লোয়াঙ্-এ স্থানান্তরিত হবার পর থেকে ক্রমশঃ য়ুংকাঙ্ অঞ্চলের প্রাধান্য কমে আসে। যেখানে একদিন দেশের শাসনকেন্দ্র স্থাপিত ছিল, হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণী যে অঞ্চলে বুদ্ধবাণী প্রচার করে ঘুরে বেড়াত, যেখানে ভারত, আফগানিস্থান, গ্রীস প্রভৃতি দেশ থেকে বণিক ও পণ্ডিতের সমাগম হতো, তা ধীরে ধীরে জনমানবহীন হয়ে পড়ল। য়ুংকাঙ্ গুহামন্দিরের কথা বাহিরের জগৎ ভুলে গেল।

১৯০২ সালে অধ্যাপক ইতো দুর্গম পথ অতিক্রম করে য়ুংকাঙ্ অঞ্চলে উপস্থিত হন। এর পাঁচ বছর পর প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক ই. শাভান (E. Chavannes) য়ুংকাঙ্-এর গুহামন্দির আবিষ্কার করে তার বিবরণ প্রচার করেন। তারপর থেকে অনেক পণ্ডিত এই গুহামন্দিরের আকর্ষণে য়ুংকাঙ্ পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু য়ুংকাঙ্ মন্দিরের বিরাটত্ব এবং ঐ অঞ্চলের দুর্গমতার জন্য পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আধ মাইলের উপর বিস্তৃত এই গুহামন্দির-সমষ্টি শুধু প্রাচীন বৌদ্ধ-শিল্পের নিদর্শন নয়; চীনের সাংস্কৃতিক জীবনের ছাপও এর মধ্যে পাওয়া যাবে। দেড় হাজার বছর ধরে মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় থাকলেও মন্দিরের অনেক স্থানে ধ্বংসের হস্তস্পর্শ চোখে পড়ে। বালি-পাথরের খোদাই অনেক মূর্তি ভেঙে পড়েছে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এখন থেকে ছবি তুলে না রাখলে এবং বর্ণনা লিপিবদ্ধ না করলে অনেক শিল্প নিদর্শনই চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবার আশংকা ছিল। জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিট্যুট অব ওরিয়েন্টাল কালচার য়ুংকাঙ্ গুহামন্দিরের পূর্ণ পরিচয় সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৩৮ সালে। অধ্যাপক মিৎসুনো এবং নাগাহিরোর উপর ভার ছিল অনুসন্ধান, তথ্যসংগ্রহ এবং ফটোগ্রাফ তোলবার।

কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযাত্রী দল ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবৎসর তিন থেকে ছ'মাস য়ুংকাঙে বাস করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। জনমানবহীন দুর্গম অঞ্চলে নানাপ্রকার অসুবিধার জন্য এর চেয়ে বেশি সময় একটানা থাকা সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর অসুবিধা আরো বাড়ল। অর্থাভাব, প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জার অভাবও অনুসন্ধানে বাধা দিয়েছে। গুহার ভিতরে ছবি তোলা প্রথম তো প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছিল। কারণ সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না। তার পরে অনেক কৌশলে এমন করে আয়নার বিন্যাস করা হলো যে, সূর্যালোক গুহার ভিতরে প্রতিফলিত হয়ে ফটো তোলা সম্ভব করল। ছবি তোলবার পূর্বে আর একটি কষ্টসাধ্য

কাজ করতে হয়েছিল। হাজার হাজার মূর্তি ঢাকা পড়ে ছিল ধুলোর আচ্ছাদনে। কোথাও কোথাও ধুলো পুরু ছিল এক ইঞ্চি। এদের ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা এক বিরাট ব্যাপার। এত পরিশ্রম করেও য়ুংকাঙ-এর সবগুলি মন্দিরের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রধান প্রধান কুড়িটি গুহার বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণার প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশের জন্য প্রস্তুত তখন টোকিওর উপর বোমা বর্ষণের ফলে (১৯৪৩) তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। অধ্যাপক মিৎসুনো ও নাগাহিরোর অধ্যবসায় এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়েনি। তাঁরা আবার নতুন উদ্যমে গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বিরাট চিত্রবহুল গ্রন্থ প্রকাশের জন্য মুদ্রণের বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং তার জন্য চাই প্রচুর অর্থ। য়ুংকাঙ গুহামন্দির সম্বন্ধে জাপানের জনসাধারণ আশ্চর্য উৎসাহ দেখিয়েছে। তারা স্বেচ্ছায় গ্রন্থ প্রকাশের জন্য চাঁদা দিয়েছে। জাপান সরকার, জনসাধারণ ও কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে Yun Kang Cave Temples খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৫১ সাল থেকে। গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছে ১৯৫৭ সালে, এবং থাকবে মোট পনেরো খণ্ড। প্রত্যেক খণ্ডের দুটি পৃথক্ ভাগ আছে; একটিতে পাঠ্যাংশ অন্যটিতে ছবি। পাঠ্যাংশ ইংরেজী ও জাপানী ভাষায় রচিত। ছবিগুলি কলোটাইপ পদ্ধতিতে ছাপা। ছাপা, ছবি, বাঁধাই, জাপানী মুদ্রণশিল্প যে কতদূর উন্নত হয়েছে তার প্রমাণ দেবে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের দাম আগে ছিল দু'হাজার ছ'শ টাকা। আজকের দিনে এক খণ্ডও এ দামে ছাপা যাবে কিনা সন্দেহ। সম্পূর্ণ গ্রন্থ মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যের এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করবে।

ভারত ও মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ভাস্কর্য অনেক দূর উন্নতি করবার পর চীন তাকে গ্রহণ করেছে। সুতরাং চীনের শিল্পরীতি সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ভাস্কর্যকে নতুন শিল্পভঙ্গি দেবার সুযোগ ছিল না। কারণ মূর্তির গঠন, ভঙ্গি, ইত্যাদির একটা ধরাবাঁধা রূপ তখন স্থির হয়ে গেছে; এদের বাদ দিয়ে নতুন কিছু প্রবর্তন করবার অর্থ হলো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া। তাই চীনের শিল্পীরা তুঙহুয়াং-এর পথে আসা ভারতীয় বৌদ্ধ ভাস্কর্যকেই মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করেছে। জনশ্রুতি এই যে, য়ুংকাঙ্ গুহামন্দির ভারতীয় শিল্পীদের কীর্তি। একথা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, য়ুংকাঙ-এর শিল্পীদের এক বৃহৎ অংশ ছিলেন ভারতীয়। তা না হলে বৌদ্ধ মন্দিরে চীনের সুদূর উত্তর অঞ্চলে বিষ্ণু ও তাঁর বাহন গরুড়, মহাদেব, প্রভৃতি হিন্দু দেবতার মূর্তি কেন পাওয়া যাবে?

অবশ্য শুধু ভারতীয় নয়,—এখানে মিলিত হয়েছে নানা শিল্পধারা। ভারতীয়, গ্রীক, গান্ধার, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি সকল শিল্পরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায় এখানে। পারস্যের অলংকরণ এবং তক্ষশীলার রিলিফও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচলিত এবং পরিচিত মূর্তিগুলি ছাড়া অন্যান্য মূর্তিতে বৈশিষ্ট্য দেখাবার সুযোগ পেয়েছে শিল্পী। এইসব মূর্তিগুলির মুখের আদল চীনা, এবং সেখানে ফুটে উঠেছে

বিদ্রুপাত্মক চৈনিক চাপা হাসি। চীনের প্রভাব এই নামহীন মূর্তিগুলিতেই বেশি ফুটেছে।

য়ুংকাঙ গুহায় বুদ্ধদেবের জীবনীর বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে উনত্রিশটি মূর্তি আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লুম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধের জন্ম, গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ, বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্মোপদেশ এবং পরিনির্বাণের ভাস্কররূপ। এখানকার পাঁচটি গুহায় যে পাঁচটি বিরাট বুদ্ধ মূর্তি আছে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে মন অভিভূত হয়ে পড়ে। তাঙ্‌য়াও নামে একজন বৌদ্ধ শ্রমণ ৪৫৪ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম একাকী য়ুংকাঙ মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন। তিনি নিজে পাঁচটি বিরাট বৌদ্ধ মূর্তি তৈরি করেছেন; এর মধ্যে একটি ৭০ ফুট, আর একটি ৬০ ফুট উঁচু।

য়ুংকাঙ্‌ গুহামন্দিরে হাজার হাজার মূর্তি দেড় হাজার বছর ধরে শ্রদ্ধানত দর্শকের জন্য অপেক্ষা করে আছে। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দেওয়ালের কোথাও ফাঁক নেই। হয় শান্ত সমাহিত বুদ্ধ মূর্তি, কিংবা তাঁর ভক্তদের মূর্তি সবটুকু স্থান অধিকার করে আছে। সেই প্রায়ান্ধকার গুহার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে মনে এক অপূর্ব অনুভূতি জাগে। যেন এক নতুন জগতে, বুদ্ধময় জগতে প্রবেশ করেছি। যাঁরা একদিন অসীম শ্রদ্ধায় পরম ধৈর্যসহকারে এই অপূর্ব জগৎ রচনা করেছিলেন, তাঁদের নাম কারো জানা নেই। কিন্তু ভারতীয় ও চীনা শিল্পীদের শিল্পমানসের পরিচয় বুকে করে য়ুংকাঙ্‌ গুহা এখনো লোকচক্ষুর বাহিরে জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে।

শিক্ষিত ভারতীয়দের দৃষ্টি এখনো পশ্চিমে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাদের আকৃষ্ট করেছে। পূর্ব এশিয়ায় একদিন আমাদের সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। একালের ভারতীয় গবেষকরা অতীতের সেই গৌরবময় ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্য ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, ব্রহ্ম বা চীনে যান না। উচ্চশিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য আমরা পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী। অল্প কয়েকজন ভারতীয় ঐতিহাসিক পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার সম্বন্ধে আংশিক আলোচনা করেছেন। অনেক বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে নতুন কাজে কেউ হাত দেননি। অথচ স্বাধীনতার পরে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধির ফলে এ কাজ করবার সুযোগ বেড়েছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে দীর্ঘকাল বাস করে, তাদের ভাষা আয়ত্ত করে হারানো ইতিহাস উদ্ধার করবার আগ্রহ দেখা যায় না। বিদেশে আমরা কি করেছি তার বিবরণ প্রকৃতপক্ষে স্বদেশেরই ইতিহাস।

এ সব কথা মনে পড়ছে বালি দ্বীপের গাথা 'জয়প্রাণ'-এর ইংরেজী সংস্করণ হাতে পেয়ে। এই বই লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছে। জয়প্রাণের কাহিনী বহু প্রাচীন। তাল-পাতার পুঁথিতে এই গাথার বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। বালি দ্বীপের সাহিত্যে এরূপ অনেক গাথা আছে। কিন্তু জয়প্রাণের গাথা লোকে আজও ভোলেনি। বছর দশেক পূর্বেও জয়প্রাণের গল্প কেন্দ্র করে সমগ্র বালি দ্বীপে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন পর্যন্ত বালি দ্বীপের অধিবাসীদের নিকট জয়প্রাণ জাগ্রত দেবতা হিসাবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

এক গ্রামে মহামারীর আক্রমণে একটি পরিবারের সবাই মারা গেল; বেঁচে রইল শুধু একটি অসহায় শিশু। এই অনাথ ছেলেটিকে রাজা অলক অগুঙ্গ রাজপ্রাসাদে আশ্রয় দিলেন। রাজার স্নেহে ছেলেটি বড় হয়ে উঠল। ছেলেটির সৌম্যকান্তি সকলকে আনন্দ দেয়। তাই এর নাম রাখা হল জয়প্রাণ।

জয়প্রাণ যৌবনে পদার্পণ করবার পর রাজা বললেন, আমার রাজধানীর যে মেয়েকে তোমার পছন্দ তাকেই তুমি বিয়ে করে ঘরে আনতে পার। জয়প্রাণ একদিন বাজারে লায়ন সারির রূপ দেখে মুগ্ধ হল। লায়ন সারিও জয়প্রাণকে দেখেই মনে মনে আত্মদান করেছে।

জয়প্রাণ রাজার কাছে এসে বলল, বন্দেশার মেয়ে লায়ন সারিকে সে বিয়ে করতে উৎসুক। রাজা শুভদিন স্থির করে বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি দিয়ে জয়প্রাণকে বন্দেশার নিকট পাঠালেন। জয়প্রাণকে দেখে লায়ন সারির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাজার আদেশ; মেয়ের সম্মতি আছে; সুতরাং বন্দেশার বিয়েতে আপত্তি করবার প্রশ্ন ওঠে না।

মহা সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল; জয়প্রাণ লায়ন সারিকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে এল। তাদের দুজনের দিন খুব সুখে কাটছে। কিন্তু লায়ন সারির অপরূপ সৌন্দর্য তাদের

সুখে বাদ সাধল। রাজা তার রূপে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনে হল লায়ন সারিকে না পেলে রাজত্ব, ঐশ্বর্য—সবই বৃথা। পথের কাঁটা জয়প্রাণকে সরাবার জন্য তিনি সংকল্প করলেন।

রাজ্যের প্রধানদের ডেকে বললেন, বালি দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম তীরে বিদেশীরা নামবার উদ্যোগ করছে বলে সংবাদ এসেছে। তাদের বাধা দেবার জন্য অবিলম্বে তোমরা ঘটনাস্থলে যাত্রা কর। জয়প্রাণও সংগে যাবে।

পরদিন সকালেই যাত্রা করবার কথা। লায়ন সারির বুক কাঁপছে। কি জানি কি হবে! মংগলমতো ফিরে আসবে তো জয়প্রাণ? প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে জয়প্রাণকে বলল, প্রিয়তম, রাত্রিতে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

জয়প্রাণ জিজ্ঞাসা করল, কি স্বপ্ন? —যেন আমার পদ্মফুল দুর্বার বন্যা-স্রোতে ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেল। লায়ন সারিকে প্রবোধ দিয়ে জয়প্রাণ যাত্রা করল। দলের নেতাকে রাজা বলে দিয়েছেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে জয়প্রাণকে হত্যা করতে। রাজার আদেশ অমান্য করা চলে না। সুতরাং নিরপরাধ জয়প্রাণ রাজধানী থেকে বহুদূরে অকস্মাৎ প্রাণ হারাল। নিরপরাধ লোক হত্যা করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ গ্রহণ করে। জয়প্রাণের কাহিনীর নৈতিক শিক্ষা এই। সুতরাং দলের লোকেরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। অল্প কয়েকজন মাত্র রাজধানীতে ফিরে এল।

লায়ন সারিকে কেউ কিছু জানাল না। জয়প্রাণ কেন ফিরছে না? আশংকায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। মাথার উপরে আর্তনাদ করে কাক উড়ে বেড়াচ্ছে; তাতে তার উৎকণ্ঠা আরো বাড়ল। অমংগলের ইংগিত। জয়প্রাণের মৃত্যুর কথা খুব গোপন রাখা হয়েছিল। তথাপি লায়ন সারি একদিন শুনতে পেল স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ। একান্তে যে একটু শোক করবে এমন সুযোগ পর্যন্ত তার নেই। রাজা ডেকে পাঠালেন। বললেন, জয়প্রাণকে তো কখনো ফিরে পাবে না। শুধু শুধু কেঁদে লাভ কি? আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে বিয়ে করে নিজে সুখী হব, তোমাকেও সুখী করব।

লায়ন সারি বলল, আমি স্বামীর চিতায় সহমৃতা হব।

রাজা হেসে বললেন, তা সম্ভব নয়; কারণ জয়প্রাণের মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজা আদেশ দিলেন বিয়ের আয়োজন করতে। লায়ন সারি নিজের সম্মান রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে রাজা উন্মত্ত হয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদে উন্মুক্ত তরবারি হাতে করে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। শেষে রাজা নিজেও আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

বালি দ্বীপের প্রবাদ অনুসারে জয়প্রাণ হচ্ছে সে দেশে হিন্দুধর্ম প্রচারকারী নিরর্থ। নিরর্থ সর্বপ্রথম ভারত থেকে বালি দ্বীপে গিয়েছিল হিন্দুধর্মের বাণী নিয়ে। যে রাজা নিরর্থকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছিল পরে সে-ই তাকে হত্যা করে। জয়প্রাণ যে বিদেশী ছিল তা অনুমান করা যেতে পারে লায়ন সারির সংগে প্রথম

সাক্ষাতের বিবরণ থেকে। জয়প্রাণের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লায়ন সারি একবার তাকিয়েই লক্ষ্য করেছে।

নিরর্থ পুলাকি অঞ্চলে অবতরণ করেছিল। এর প্রমাণ ইতিহাসে নেই ; এটা হল প্রবাদ। বালি দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে কালি আংগেত নামক জনপদে জয়প্রাণ রাজার আশ্রয় লাভ করেছিল। প্রাচীন কাল থেকে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মন জয়প্রাণের কাহিনী অধিকার করে আছে। নিরপরাধ জয়প্রাণের আত্মার সদ্গতির জন্য কোন পারলৌকিক ক্রিয়া না করবার অপরাধবোধ এই অঞ্চলের লোকদের কয়েক শতাব্দী যাবৎ পীড়িত করে আসছিল। এখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র ; নানা রকম রোগ এদের মধ্যে লেগেই আছে। এই দুর্ভাগ্যের জন্য জয়প্রাণের আত্মার জন্য যথাযোগ্য পারলৌকিক ক্রিয়া না করাকেই এরা দায়ী করে। একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে না পারায় শত শত বৎসর যাবৎ এদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পেল ; অনেকে নানা প্রেতমূর্তি দেখতে লাগল।

সুতরাং বালি দ্বীপের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা মরিয়া হয়ে স্থির করল, যে করে হোক জয়প্রাণের আত্মার সদ্গতির জন্য শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি করতে হবে। ১৯৪৯ সালে এই উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। বালি দ্বীপের সকল অঞ্চল থেকে সেই দীর্ঘস্থায়ী উৎসবে হিন্দুরা যোগ দিয়েছিল। অনেক মুসলমান এবং খ্রীস্টানও জয়প্রাণের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছে। জয়প্রাণের গাথা এখনও গান করা হয়, নৃত্যনাট্যের আকারে পরিবেশন করা হয় এবং শিল্পীরা এই কাহিনী অবলম্বনে ছবি আঁকে।

জয়প্রাণের গাথাটি সম্পাদনা করেছেন C. Hooykaas. রোমান লিপিতে মূল গাথা ও তার ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টে বালি ভাষার কতকগুলি শব্দের অর্থ দিয়েছেন সম্পাদক। বহু শব্দই আমাদের নিকট পরিচিত। কারণ এগুলি সংস্কৃত শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। ভূমিকায় সম্পাদক জয়প্রাণের কাহিনীর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক পটভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সু-সম্পাদিত সচিত্র বইটি ভারত ও বালি দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগের উপর আলোকপাত করতে সহায়তা করবে।

কবি ভার্জিল বলেছেন, 'আমি আমার ডান হাতকে দেবতা বলে মানি।' কথাটা হঠাৎ অত্যুক্তি বলে মনে হতে পারে। দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা হাতের মর্যাদা যে অধিক এমন সচেতন ধারণা আমাদের নেই। অথচ বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রমাণিত হয়েছে যে; হাত শুধু দৈনন্দিন জীবনে কাজ করবার অত্যাবশ্যক হাতিয়ার নয়; মস্তিষ্কের কাজ করবার ক্ষমতাও হাতের যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে। এই দু'টি বিভিন্ন দায়িত্বের মিলন ঘটেছে বলে হাত দেহের শ্রেষ্ঠ অংগ। Geza Revesz তাঁর 'The Human Hand' নামক গ্রন্থে শারীরতত্ত্ব জীববিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক থেকে হাত সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বছরের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে শিলীভূত যে সব প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতের প্রাণী ভূ-পৃষ্ঠে বাস করত। লামার্ক, ডারুইন প্রভৃতির আবিষ্কৃত বিবর্তনবাদের তত্ত্ব এই ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এ-পর্যন্ত যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় সৃষ্টির প্রথম যুগে প্রাণীদের হাত ছিল না। প্রাণিদেহের আকৃতি ক্রমশঃ বিবর্তিত হয়ে উন্নত রূপ লাভ করবার পর হাতের আবির্ভাব ঘটেছে। এখনও নিম্নস্তরের বহু প্রাণীর হাত নেই। হাতের পুরনো কঙ্কাল পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা মনে করেন যে; গত পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যে হাতের আকৃতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু আকৃতিটাই বড় কথা নয়। হাতের পেশী, স্নায়ুজালের বিন্যাস, ইত্যাদি হাতের কার্যকারিতা ও অনুভূতিপ্রবণতাকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করে। কঙ্কাল বিচার করে হাতের এই বৈশিষ্ট্যগুলির রূপান্তর কবে থেকে শুরু হয়েছে বলা যায় না। তবে এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই যে, প্রথমে হাত ও পা প্রায় একই কাজ করত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের হাত ও পা'র মধ্যে পার্থক্যটা সুস্পষ্ট। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় না। মানুষের হাতের নিকটতম সাদৃশ্য পাওয়া যায় গরিলার হাতে। গরিলার হাতের বুড়ো আঙ্গুল এত ছোট যে, তার জন্য মানুষের হাতের অনেকগুলি সুবিধা থেকে সে বঞ্চিত। অন্যান্য প্রাণীর হাত আঁকড়ে ধরবার অঙ্গ মাত্র; কিন্তু মানুষের হাত শুধু কাজ করবার জন্য নয়; অনুভূতি প্রকাশের এবং অনুভূতি গ্রহণেরও অঙ্গ আমাদের হাত। প্রকৃতপক্ষে হাতকে মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে।

হাতের সাহায্য ছাড়া আমাদের জীবন অচল। জন্মের পরে শিশু প্রথম তার মুখের ব্যবহার শুরু করে। এর পরে আরম্ভ হয় হাতের ব্যবহার। যতক্ষণ জেগে থাকে কেবল হাত নিয়ে খেলা করে। নিকটে যা কিছু পায় হাত দিয়ে তাদের স্পর্শ করে জেনে নিতে চায়। বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করবার পূর্বেই শিশু হাতের স্পর্শ দিয়ে চারপাশের বস্তুগুলির পরিচয় লাভ করে। গান্ধীজী; ফ্রয়েবল; মন্তেসরি প্রভৃতি যাঁরা শিশুর

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার পদ্ধতি রচনা করেছেন তাঁরাই হাতের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে; পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের ব্যবহার না করলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুকে হাতের কাজে আকৃষ্ট করতে পারলে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে, দেখা গেছে। শিক্ষার কথা বাদ দিলেও হাতের উপকারিতা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কম নয়। হাতের কাজ দিয়ে মানসিক ব্যাধির রোগীর চিকিৎসা করে সুফল পাওয়া গেছে। মস্তিষ্কের প্রতিটি চিন্তা-ভাবনা হাতের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি হাতের কাজ মস্তিষ্কের উপর ছাপ ফেলে। সুতরাং উপযুক্ত হাতের কাজ দিয়ে কাউকে আবিষ্ট করতে পারলে তার মন ও মাথা দুইয়েরই উন্নতি হবে।

আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় হাতিয়ারগুলি হাতের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে। হাতুড়ি মুষ্টিবদ্ধ হাতের প্রতীক; সাঁড়াশি দু' আঙুল দিয়ে চেপে ধরবার অনুকরণ। বড় বড় কলকারখানাতেও হাতের অনুকরণে তৈরি বহু যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ দেখা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন যন্ত্রই হাতের স্থান অধিকার করতে পারেনি। যেখানে সূক্ষ্ম কাজ এবং শিল্প-সৃষ্টির তাগিদ আছে সেখানে কোনো যন্ত্রই সাহায্য করতে পারবে না; হাতই একমাত্র ভরসা। আচার্য জগদীশচন্দ্র আবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফের মতো সূক্ষ্ম যন্ত্র হাতে তৈরি করতে হয়েছে। তেমনি হাত ছাড়া ছবি আঁকার কথা কল্পনা করতে পারি না; তারের যন্ত্রে আঙুলের ছোঁয়া না লাগলে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

হাত মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক। জ্যোতিষীরা বলেন যে, মস্তিষ্কের উপাদান কিছু পরিমাণে হাতের তালুতে এবং আঙুলের ডগাতে পাওয়া যায়। জীবনের ঘটনাগুলি আমাদের মস্তিষ্কে গভীর ছায়াপাত করে। আমরা কিছুই ভুলি না; পুরনো ঘটনার কথা স্মরণ করে মনে সুখ বা দুঃখ জেগে ওঠে। তেমনি ভবিষ্যতের ঘটনার ছায়াও অনেক আগে থেকেই মস্তিষ্কের উপর পড়ে। মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ; তা ছাড়া মস্তিষ্কের উপাদানও হাতের মধ্যে কিছু পরিমাণে রয়েছে। সুতরাং অতীতের এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর ছায়া হাতের রেখায় ফুটে ওঠে। তাই হাতের রেখা পরীক্ষা করে জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ বলা যায়।

হস্তরেখার এই ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত নয়। কিন্তু হাত যে মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্কের কাজ করে তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নির্ধারিত হয়েছে। শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ করে আমরা অনেক বিষয় সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। অভিজ্ঞ ব্যক্তি আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে বলতে পারে কাগজটা কত পাউন্ডের। ইতালীতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার পশমের ব্যবসা হয় শুধু হাতের সাহায্যে শ্রেণী বিচারের উপর নির্ভর করে। চোখের বিচার অপেক্ষা হাতের স্পর্শ অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। যারা অন্ধ তাদের প্রধান অবলম্বন হাত। হাতের সাহায্যে তারা লেখাপড়া শেখে এবং বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। হাত অন্ধের চোখের কাজ করে। শুধু চোখ নয়, কানেরও। মূক, বধির ও অন্ধ হেলেন কেলার তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, বীঠোফেনের নাইনথ্ সিম্ফনির পূর্ণ রস তিনি উপভোগ

করতে পেরেছেন। বেতারযন্ত্রের উপর হাত রেখে তিনি উপলব্ধি করেছেন সেই অপূর্ব সঙ্গীতের উন্মাদনা। সঙ্গীতের মূর্ছনা এবং রেডিও যন্ত্রের কম্পন স্পর্শানুভূতির সাহায্যে তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছে। শ্রীমতী কেলারের বর্ণনা পড়লে সন্দেহ থাকে না যে, তিনি স্বাভাবিকরূপেই সঙ্গীতের রস আস্বাদন করতে পেরেছেন।

বীঠোফেন ১৮১৯ সালে সম্পূর্ণরূপে বধির হয়ে যান। কিন্তু তার পরে মৃত্যু পর্যন্ত (১৮২৭) তিনি অনেক অমর সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন। সঙ্গীতযন্ত্রের কম্পন হাতের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছেছে এবং তারই অনুভূতির সাহায্যে তিনি রচনা করেছেন নতুন নতুন সুরের মায়াজাল। হাতের সহায়তা ছাড়া বীঠোফেনের নতুন সঙ্গীত রচনা বধির হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যেত।

অন্ধ শিল্পীরা যে হাতের স্পর্শানুভূতির উপর নির্ভর করে কেমন সুন্দর মূর্তি গড়তে পারে তারও অনেক প্রমাণ আছে। অন্ধ ভাস্কর ক্লেইনহানস-এর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্প-কীর্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অন্ধের শিল্পসৃষ্টির দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়। অনুভূতিপ্রবণ হাতের সহায়তা ছাড়া এমন শিল্পকর্ম সম্ভব হত না।

চিকিৎসাবিদ্যাতেও হাতের ভূমিকা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। হাতের নাড়ী পরীক্ষা করেও অভিজ্ঞ কবিরাজ রোগ নির্ণয় করতে পারেন। তাঁকে হরেক রকম ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। হাতের রঙ ইত্যাদি রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

হাত মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। মনের প্রকাশ হাতের ভঙ্গির মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। হাত ও আঙুলের অবস্থান থেকে সংকল্প, ক্রোধ, নিষেধ, আহ্বান ইত্যাদি যত সহজে উপলব্ধি করা যায় চোখ বা মুখের ভঙ্গির সাহায্যে ততটা পারা যায় না। বক্তব্য স্পষ্টতর করবার জন্য আমরা কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতের অর্থময় ভঙ্গি করি। হাতের যথার্থ প্রয়োগের উপর অভিনেতার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। হাত যুক্ত করে, হাত দিয়ে পা ছুঁয়ে অথবা করমর্দন করে আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি অথবা স্বাগত জানাই। রোগীর সেবায় হাতের স্নেহস্পর্শের মূল্য ওষুধের চেয়ে কম নয়। দেবতার পূজায় হাতের কত বিচিত্র ভঙ্গি করতে হয়। ভারতীয় নৃত্যে হাতের মুদ্রা অপরিহার্য ; মুদ্রা ছাড়া নৃত্য ব্যঞ্জনাহীন হয়ে পড়ে।

হাতের স্পর্শ লাভ করতে না পারলে ভালোবাসা বিস্বাদ হয়ে যেত। 'কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই কত কথা কয়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইসারা! ভালোবাসার যত কিছু আদর, যত কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ, যত অনির্বচনীয় ভাষা সব যে ওই হাতে।' হাত পাওয়াই হৃদয় পাওয়ার পাশপোর্ট। হাত পেলেই সমগ্র মানুষটিকে পাওয়া হল। তাই পাণিগ্রহণ অর্থই বিবাহ।

সম্পর্ক যেখানে গভীর, বিরোধ সেইখানেই তীব্র হয়। মেয়ে-পুরুষের দ্বন্দ্বের কথাটাই ধরা যাক। বাইবেলে বলা হয় যে, আদমের বাঁ দিকের বুকের হাড় থেকেই জন্ম হয়েছিল ইভের। সুতরাং পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের রক্তের সম্পর্ক। তাছাড়া পুরুষ ও মেয়েদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংসার চলছে। অথচ, মেয়ে-পুরুষে বিরোধের শেষ নেই। মেয়েদের প্রতি পুরুষের বিদ্বেষটা অত্যন্ত স্পষ্ট। পৃথিবীর সাহিত্যে এর অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। সংসারের অধিকাংশ দুঃখ-কষ্টের জন্য মেয়েরাই দায়ী। পুরুষরা একথা প্রচার করে করে প্রায় বিশ্বাসে পরিণত করেছে এই ধারণা। ডঃ জনসন বলতেন, লেখার কৌশলটা বিশেষ করে পুরুষের বিদ্যা, তাই মেয়েদের বিরুদ্ধে এত প্রচার হতে পেরেছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মেয়েরাও স্বজাতির নিন্দা কম করেনি। কথায় বলে, মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু ; যেমন বাঙালী বাঙালীর শত্রু, হিন্দুর শত্রু হিন্দু।

নারীবিদ্বেষীরা মেয়েদের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন তা জানলে দু'পক্ষেরই পরস্পরকে জানবার সুবিধা। / Justin Kaplan একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে এবিষয়ের উপর বইয়ের অভাব দূর করেছেন। বইটির নাম ঃ With Malice Toward Women ঃ a Handbook for Women Haters. জেমস হারবারের আঁকা অনেকগুলি ব্যঙ্গ-রসাত্মক ছবি বইয়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

সকল দেশেই নারীবিদ্বেষের সবচেয়ে বড় কারণ পাওয়া যাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও সাধু-সন্ন্যাসীদের নারীবিমুখতার মধ্যে। নিষ্ক্রিয় বিমুখতা নয়। মেয়েদের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ জোর করে প্রচার করা হয়েছে। ধর্মাচরণের পথে মেয়েরা অন্তরায়, তারা নরকের দ্বার, ভগবানের আরাধনা করতে হলে তাদের এড়িয়ে চলতে হবে—এমনি সব ধারণা প্রাচীন হিন্দু, খ্রীস্টান প্রভৃতি সমাজে প্রচলিত ছিল। নারীর পূজা আর দেবতার পূজা সমার্থক, এরূপ দু'একটি প্রক্ষিপ্ত উক্তি থাকলেও বিদ্বেষটা যে প্রাধান্য লাভ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাধারণ লোকে দেখত যাদের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলে তারা শ্রদ্ধা করে, সেই সাধু-সন্ন্যাসীরা নারীসঙ্গ পরিত্যাগ করে চলেন। ধর্ম যার পক্ষে নয়, সমাজ তাকে স্বভাবতঃই ভালো চোখে দেখতে পারে না।

বুদ্ধদেবের সর্বজীবে অসীম করুণা ছিল। তিনিও মেয়েদের একটু সন্দেহের চোখে না দেখে পারেননি। তাই আনন্দ যখন মেয়েদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে গ্রহণের প্রস্তাব করলেন তখন তিনি সহজে সম্মতি দেননি। তিনি বলেছিলেন, মেয়েরা বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ না করলে সহস্র বৎসর যাবৎ বৌদ্ধধর্মের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকবে ; তাদের সঙ্ঘে গ্রহণ করলে শীঘ্রই এ ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট হবে।

শেষ পর্যন্ত অন্তরঙ্গ অনুচরদের নিরতিশয় আগ্রহে বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকদের সঙ্ঘে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

শোপেনহাউয়ারের নারীবিদ্বেষ সুবিদিত। ছেলেবেলায় মা'র কাছ থেকে তাঁকে

অমানুষিক অত্যাচার সইতে হয়েছিল বলেই হয়তো পরবর্তী জীবনে তিনি মেয়েদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না। শোপেনহাউয়ারের একটি মত ছিল এই যে, মেয়েরা চির-শিশু। তারা হলো big children all their life long. এ জন্যই মেয়েরা শিশুদের ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে পারে ভালো। মেয়েদের 'ফেয়ার সেক্স' বলবার কারণও তিনি বুঝতে পারেন না। কারণ এরা হলো undersized, narrow-shouldered, broad-hipped, and short-legged race-এর অন্তর্গত। কোনো আর্টের প্রতি এদের সত্যিকার আকর্ষণ নেই। কোনো বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান নেই। সুতরাং মেয়েদের সুন্দরের জাত বলে চিহ্নিত করবার কারণ কি?

আর্ল অব চেস্টারফিল্ডও বলেছেন, মেয়েরা হলো বৃহদাকারের শিশু। বার্ক বলেছেন মেয়েরা একজাতীয় প্রাণী, তবে উচ্চতম শ্রেণীর নয়। অ্যামব্রোজ বীয়ার্স "দি ডেভিল্‌স ডিকসিনারিতে" স্ত্রীলোকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই: স্ত্রীলোক হচ্ছে এক জাতীয় প্রাণী যারা পুরুষের কাছাকাছি বাস করতে ভালোবাসে এবং সহজে পোষ মানবার বৈশিষ্ট্য তাদের জন্মগত। প্রাচীন প্রাণিবিজ্ঞানীরা বলেন, স্ত্রীলোকেরা নিরীহ জীব; কিন্তু আধুনিকরা তা স্বীকার করেন না। বর্তমানে এদের গর্জন পূর্ব ধারণা পরিবর্তিত করেছে। এই শিকারী পশুরা গ্রীনল্যান্ড থেকে ভারত পর্যন্ত সর্বত্র বিচরণ করে। 'উলফ ম্যান' হতে 'উম্যান' কথা এসেছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা ঠিক নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীজাতি বিড়ালের সগোত্র; কারণ তারা বিড়ালের মতোই সর্বভুক এবং চেষ্টা করলে কথা না বলে কি করে থাকতে হয় তা-ও এদের শেখানো যেতে পারে।

সুইফট মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তারা বানর অপেক্ষা এক ধাপ উঁচু স্তরের জীব কিনা সে সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহ আছে। নীটশে আর একজন নারীবিদ্বেষী—তাঁর মতে মেয়েদের চিন্তাশক্তির অভাব আছে। মেয়েরা হাজার হাজার বছর যাবৎ রান্না করছে, অথচ শারীরবিদ্যা (অন্ততঃ শরীরের উপর খাদ্যের প্রভাব) সম্বন্ধে একটি নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেনি। বাঁধাধরা নিয়মে তারা কাজ করে যায়; সেই কাজ নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করবার আগ্রহ নেই।

টলস্টয় বিয়ের পরে তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন: "এমন অপূর্ব আনন্দ কেউ পায়নি, পাবেও না।" ত্রিশ বৎসর পরে তিনিই বলেছেন: "বিয়ের পরিণাম যে কি ভয়ংকর হতে পারে তা আমার অবস্থা দেখলেই বোঝা যাবে।" স্ত্রীর হাত থেকে পালাবার চেষ্টায় এক রেলওয়ে স্টেশনে শোচনীয় ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ক্রুয়েৎজার সোনাটায় মেয়েদের সম্বন্ধে টলস্টয়ের অনেক তীব্র মন্তব্য পাওয়া যাবে।

নারীবিদ্বেষীরা বিয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে না এটাই স্বাভাবিক। ভলটেয়ার বলেছেন, "Marriage is the only adventure open to the cowardly." অ্যারিস্টটলের বন্ধু ও শিষ্য থিওফ্র্যাসটাস বলতেন, বিজ্ঞ ব্যক্তির কখনো বিয়ে করা উচিত নয়, কারণ একই সঙ্গে স্ত্রী ও বইয়ের সেবা করা সম্ভব হতে পারে না। একজন

বিশ্বস্ত ভৃত্য যেমন সুচারুভাবে সংসারের কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে পারে মেয়েরা তা পারে না। সুতরাং বিয়ের দরকার কি?

পুরুষরা যতদিন পারে বিয়ে এড়িয়ে চলে, মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বামী সংগ্রহ করতে চায়,—বলেছেন বার্নার্ড শ'। আর স্বামী সংগ্রহের জন্য রূপসজ্জায় কী প্রাণান্তকর প্রয়াস! রূপসজ্জার সাহায্যে পুরুষদের প্রতারিত করে বিয়ে করবার এমন ব্যাপক ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছিল যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে তাঁদের নিরীহ, সরলবিশ্বাসী পুরুষ প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসতে হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৭৭০ সালে বিট্রিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ করা হয়। আইনের সারমর্ম এই: কোন স্ত্রীলোক যদি সুগন্ধি দ্রব্য, রঙ, নকল দাঁত, পরচুলা, হাই-হীল জুতো এবং দেহের সৌন্দর্যবর্ধক অন্যান্য সজ্জা ব্যবহার করে সম্রাটের প্রজাকে ভুলিয়ে বিয়ে করে, তাহলে এই অপরাধ ডাইনী-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে বিচার করা হবে এবং বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

কাপ্‌লান বহু বিখ্যাত লেখক, দার্শনিক প্রভৃতির নারীবিদ্বেষমূলক মন্তব্য, উদ্ধৃতি, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি সংকলন করেছেন। এই সংকলনের উদ্ধৃতি বিচার করলে দেখা যাবে যে, নারীবিদ্বেষের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। বর্তমানকালের লেখকদের মধ্যে হেমিংওয়েকে কেউ কেউ নারীবিদ্বেষী বলেন; কারণ, হেমিংওয়ের নায়িকা হয় নায়ককে ধ্বংস করে, না হয় নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। কিন্তু পূর্বের মতো তীব্র ও সুস্পষ্ট বিদ্বেষ নেই।

মেয়েদের প্রতি বিদ্বেষের তীব্রতা থেকেই তাদের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অগ্রাহ্য করবার হলে, পুরুষদের এমন নারীবিদ্বেষ থাকত না। বিদ্বেষটা বিরুদ্ধপক্ষের শক্তির প্রমাণ। নীট্‌শে বলতেন, মেয়েদের কাছে যাবার সময় চাবুক হাতে করে যেও। সে চাবুক যে পুরুষের হাত থেকে খসে গেছে তাতে সন্দেহ নেই।

মেয়েরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠছে। অন্য দেশে এজন্য মেয়েদের প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু এদেশের মেয়েদের ভাগ্য ভালো; না চাইতেই তারা এমন অনেক অধিকার পেয়ে গেছে যা পশ্চিমের প্রগতিশীলারাও পায়নি। ইতিহাসে পুনরানুবৃত্তি ঘটে। একসময়ে মাতৃতন্ত্র ছিল। ইতিহাসের ধারা অনুসারে হয়তো নারীবিদ্বেষী পুরুষদের পরিহাস করে সেই মাতৃতন্ত্র আবার ফিরে আসবার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অন্য সব কিছুর মতো প্রেমের পদ্ধতিও বদলায়। এই পরিবর্তন ভালো কি মন্দ সে তর্ক করবার প্রয়োজন নেই; তবে একথা বলা যায় যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কেননা, আমাদের জীবনে ক্ষুধা ও প্রেম প্রবলতম দুটি অনুভূতি। অন্ন গ্রহণ করে ক্ষুধা তৃপ্ত করা যায়; কিন্তু প্রেমের প্রাণ হলো, অতৃপ্তি। প্রেম হৃদয়ের জিনিস বলে জীবনে তার প্রভাব ক্ষুধার চেয়ে গভীর। কাব্যে উপন্যাসে, নাটকে প্রেম প্রাধান্য লাভ করেছে। সুতরাং জীবনে কোনরূপ পরিবর্তন এলে প্রেমকেও তা স্পর্শ করবে। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করবার সামাজিক মূল্য আছে। অথচ এবিষয়ে আলোচনা বড় একটা হয়নি।

প্রেমের মোটামুটি দুটো স্তর। প্রথমটি বিবাহের পূর্ববর্তী; দ্বিতীয়টি পরবর্তী। বিবাহের পূর্ববর্তী প্রেম যুগে যুগে অধিকতর ঔৎসুক্য জাগিয়েছে। সাহিত্যে এই জাতীয় প্রেমেরই প্রাধান্য এবং মানুষের কল্পনা চিরদিন তা আকৃষ্ট করে। ইংরেজীতে একে বলে কোর্টশিপ। বাঙলায় কি বলব? কোর্টশিপ-এর মতো 'পূর্বরাগ' সক্রিয়তাব্যঞ্জক নয়: একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা বোঝায় মাত্র। তবু পূর্বরাগ ছাড়া কোর্টশিপের অন্য কোনো সন্তোষজনক প্রতিশব্দও নেই।

পূর্বরাগ মানব সমাজেই নিবদ্ধ নয়। পশু জগতেও পূর্বরাগের খেলা স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীরা পশুদের পূর্বরাগ নিয়ে বড় বড় বই লিখেছেন; কিন্তু মানুষের পূর্বরাগ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অবশ্য বারট্রান্ড রাসেল প্রসঙ্গক্রমে পূর্বরাগের স্তুতি গেয়েছেন। তিনি বলেছেন, পূর্বরাগ না থাকলে সহজেই প্রেমে অবসাদ আসবে, জীবন বিস্বাদ হয়ে পড়বে। কিন্তু আজকাল পূর্বরাগের রূপ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে নানা কলা-কৌশলের সাহায্যে মন দেওয়া-নেয়ার খেলা একালের ব্যস্ত জীবনে সম্ভব নয়। এখন অনেক ক্ষেত্রেই প্রেম-নিবেদনটা ব্যবসায়ে লেন-দেনের 'পর্যায়ে' নেমে এসেছে। গভীর একনিষ্ঠ ভালোবাসারও অভাব দেখা যায় আজকাল। পূর্বে ভালোবাসা জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করত; এখন ভালোবাসা জীবনের একটি দিক মাত্র। পঁচিশ ত্রিশ বছর পূর্বেও ইংলন্ডে যারা আত্মহত্যা করত, তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ছিল হতাশ প্রেমিকদের। এখন সকল দেশেই আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ব্যর্থ প্রেমিকদের সংখ্যা প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। এটা অবশ্য দুঃখের কথা নয়। প্রেম একবার ব্যর্থ হলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, এমন ধারণা আর নেই। একালের তরুণ-তরুণী নতুন আশা নিয়ে নতুন প্রেমের সন্ধান করে। একজনের কাছ থেকে যা পেল না আর একজন তা দিয়ে জীবন পূর্ণ করে দেবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে পূর্বরাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। নায়ক-নায়িকার চিত্রদর্শন বা গুণকীর্তনে প্রেমের সঞ্চার সে যুগে সম্ভব হলেও এখন তা সম্ভব নয়। আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া

যাবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের জীবনে এবং সাহিত্যে প্রেম ও পূর্বরাগ নতুন রূপ লাভ করেছে। অনেক দিন যাবৎ পূর্বরাগ সঞ্চারের জন্য বাঙলা উপন্যাসে নায়িকাকে গুণ্ডার হাতে পড়তে হতো। স্বদেশী যুগে এই গুণ্ডা ছিল মাতাল গোরা সৈন্য। হঠাৎ নায়ক এসে গুণ্ডার কবল থেকে নায়িকাকে রক্ষা করত। তারপর থেকেই প্রেমের জন্ম। নায়িকা হয়তো চলেছে ঘোড়ার গাড়িতে; হঠাৎ ঘোড়া ক্ষেপে গেল। কোথা থেকে হলো নায়কের আবির্ভাব, রক্ষা করল নায়িকার জীবন। তারপর চায়ের আমন্ত্রণ; চায়ের আসরে শুরু হলো মন দেওয়া-নেওয়ার পালা। সহ-শিক্ষাকেও আমাদের লেখকরা পূর্বরাগ সঞ্চারের সুযোগ বলে গ্রহণ করেছেন। নায়ক-নায়িকার আলাপ হতো পুকুরঘাটে, গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে; ক্রমশঃ স্থান পরিবর্তন হলো চায়ের আসরে, বাড়ির ছাদে এবং প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির কোণে। মেয়েরা যখন বাইরে বেরুতে আরম্ভ করল, তখন স্কুল-কলেজের পথে, ট্রামে-বাসে, লেকের ধারে অথবা গড়ের মাঠে স্থান পরিবর্তিত হলো। এখন হয়েছে আপিস, রেস্তোরাঁ সিনেমা ইত্যাদি। বারো তেরো বছরের অপরিচিতা মেয়ের সামনে দাঁড়াতে এক সময় বাঙালী যুবকের বুক দুরু দুরু করত। অথচ এখন মেলামেশার দেখা-শোনার এত সুযোগ পেয়েও প্রেমে পড়বার প্রবণতা কম কেন, তার সামাজিক কারণটা অনুসন্ধানের যোগ্য।

ইংলন্ড ও আমেরিকায় পূর্বরাগের রূপান্তরের ইতিহাস লিখেছেন E. S. Turner, বইটির নাম A History of Courting. এ ধরনের বই আর চোখে পড়েনি। মানুষের গভীরতম অনুভূতিটির রূপান্তরের ইতিহাস শুধু চিত্তাকর্ষক নয়, শিক্ষাপ্রদও। কোর্টশিপ শিক্ষা দেবার জন্য য়ুরোপের অনেক ভাষায় বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে ইংরেজীতে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। ভিক্টোরীয় যুগে মেয়েদের সাময়িক পত্রিকায় কোর্টশিপ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য একটি নিয়মিত বিভাগ থাকত। দুটি হৃদয় পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য কত বিচিত্র পদ্ধতিই না অবলম্বন করেছে! কত ছল, কত কৌশল, কত সংস্কার! প্রেম নিবেদনের কুটিল পথ বিজ্ঞানের যুগে অনেকটা সহজ হয়েছে। তবু টেলিফোন, টেলিভিশান, সিনেমা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি এযুগে প্রেমকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং সাহায্যও করেছে। সামাজিক জীবনে প্রেমকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করবার যে সব উপায় বিচারপতি লিন্ডসে, বারট্রান্ড রাসেল এবং মুর তাঁর 'ইউটোপিয়া'য় নির্দেশ করেছেন, টার্নার তাদেরও আলোচনা করেছেন।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রী স্তম্ভের বিজ্ঞাপন বিদেশীদের চোখে পরিহাসের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। টার্নারের বই থেকে দেখা যাবে ইংলন্ডে এ ধরনের বিজ্ঞাপন বহু পূর্বেই বের হতো। এবং পাত্রীর রূপ বর্ণনায় শালীনতার সীমা অতিক্রম করতে বাধত না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লন্ডনের ঘটকরা যেরূপ মারাত্মক ছিল, আমাদের ঘটকদের সম্বন্ধে তা কল্পনাও করতে পারি না। তখন বিবাহযোগ্য কোন লোক পথে বেরুলেই পাদ্রির চেলারা পেছনে লাগত; লোভ দেখাত: "বিয়ে করবেন? ধনী,

সুন্দরী মেয়ে আছে।" এই লোভে পড়ে বহু লোক বিয়ে করত ভালো করে খোঁজ-খবর না নিয়ে এবং না ভেবেচিন্তে। এর সামাজিক কুফলটা এতদূরে গড়িয়েছিল যে, এরকম হঠাৎ-বিয়ে বন্ধ করবার জন্য পার্লামেন্টকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ইংলন্ডে বাধা পেয়ে পাদ্রিরা কিছুকাল পর্যন্ত তাদের মক্কেলদের স্কটল্যান্ডে নিয়ে বিয়ে দিত।

এ সব তো অতীতের কথা। কোর্টশিপের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল নয়, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কোর্টশিপ বা পূর্বরাগ অবশ্য চিরদিনই বাধা পেয়ে এসেছে। অভিভাবক মেয়েকে কোনো যুবকের সঙ্গে অনাবশ্যকরূপে ঘনিষ্ঠ হতে দেখলে চিরদিনই বাধা দিয়ে এসেছেন। পার্কে নিরিবিলি বসে একটু ঘনিষ্ঠ হবার জো নেই; পুলিশী শাসন সেখানে উদ্যত হয়ে আছে। পথে-ঘাটে যেখানেই দুটি তরুণ-তরুণীকে দেখা যায় তাদের হাব-ভাব, কথাবার্তা লক্ষ্য করবার জন্য চারদিকে কৌতূহলী মানুষের অভাব নেই। একটু স্বস্তি নেই, সহস্র রকম বাধা। তবু এই বাধা এবং আরো অনেক বড় বড় বাধা অতিক্রম করেও পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতি প্রেম নিবেদন করে এসেছে। সমাজের উপর প্রণয়ীরা অত্যাচারও কম করেনি। ইংলন্ডে প্রতি বৎসর রেল গাড়িতে হাজার হাজার বাল্ব নষ্ট হয়। কামরা অন্ধকার করবার জন্য প্রেমিক-যুগল বাল্ব গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এখন মানুষের মন বদলে গেছে, জীবন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বরাগের বিপদ সেখানেই। প্রেম সম্বন্ধে রহস্য ও রোমান্সের মাত্রা উল্লেখযোগ্যরূপে নেমে গেছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো একটুও অবশিষ্ট থাকবে না। এটা আবিষ্কারের যুগ। যতদিন নর-নারীর আকর্ষণের কারণটা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত না হবে ততদিন প্রেম কিছু রহস্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থেকে আজ আমরা ভালোবাসার প্রত্যেকটি ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। বিজ্ঞানীরা দেহকেও নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। ডি. এইচ. লরেন্স তাই বলেছেন, The human body is only just coming to real life.

রহস্য ও রোমান্সের যে কুয়াশা প্রেমকে ঘিরে থাকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার সে কুয়াশাকে ধীরে ধীরে দূর করে দিচ্ছে। তাছাড়া নর-নারী আজকাল পরস্পরের যত নিকটে এসেছে পূর্বে কখনো তা হয়নি। কিছুকাল পূর্বেও অন্তরাল থেকে চুড়ির টুংটাং একটু শব্দ এসে পুরুষের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখন চুড়ির অধিকারিণীরা চুড়ি খুলে পুরুষের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, হয়েছে তাদের কর্ম-সঙ্গিনী। অপরিচয়, অর্ধ-পরিচয় রহস্য সৃষ্টির যে সুযোগ দেয়, আজ সে সুযোগ আর নেই।

বিয়েটা যে ভবিষ্যতে পরস্পরের সুবিধাজনক সত্যে পর্যবসিত হবে, তার ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। কম্যুনিস্টপন্থীরা রোমান্স-শূন্য বিবাহকে ত্বরান্বিত করবার জন্য ব্যগ্র বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ব্রহ্মদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ম অনুসারে পার্টির

কোন সভ্য 'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' 'তুমি কি সুন্দর' প্রভৃতি বুর্জোয়া সুলভ ভাবপ্রবণ কথা ব্যবহার করে প্রেম নিবেদন করতে পারবে না। পার্টির অনুমোদিত পদ্ধতি হলো এই: মহিলা সভ্যার নিকট সভ্য গিয়ে বলবে, 'তুমি পার্টির জন্য যেরূপ প্রাণ দিয়ে কাজ করছ তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি; তোমার সংগে মিলিতভাবে পার্টির কাজ করব, এই আমার ইচ্ছা।' এই প্রেম নিবেদনও পার্টির কার্যকরী সমিতিকে আগে না জানিয়ে করা চলবে না। পার্টি কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রেমসংক্রান্ত নিয়ম-কানুন অগ্রাহ্য করলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি হতে পারে। জীবনযাত্রা কঠোর হয়ে পড়াটাও কোর্টশিপের মাধুর্য হ্রাসের কারণ। যৌবন-প্রাপ্তির পরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিবাহের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রধানতঃ আর্থিক কারণে। দশ-বিশ বৎসর ধরে কঠোর সংগ্রাম করবার পর আমরা প্রায়ই জীবনবিদ্বেষী হয়ে পড়ি, রোমান্সের বাষ্পটুকুও আর অবশিষ্ট থাকে না। সহজ ও সুস্থ উপায়ে ভালোবাসার অনুভূতিকে তৃপ্ত করতে না পেরে আমাদের মন এবং দৃষ্টিভংগি বিকৃত হয়ে যায়।

লুই মামফোর্ড তাঁর 'দি কালচার অব সিটিজ' গ্রন্থে বলেছেন যে, বর্তমান নাগরিক সভ্যতা কোর্টশিপের সুযোগ দেয় না। শহরের বাড়িগুলির প্ল্যান এমনভাবে তৈরি যে তরুণ-তরুণীরা ভাব আদান-প্রদানের জন্য একটু নিরিবিলি স্থান খুঁজে পায় না। কলকাতার অধিবাসীদের সেকথা আর বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। বাঙলা প্রেমের সাহিত্যে ছাদের দান উল্লেখযোগ্য। এখন ছাদ বিদায় নিয়েছে প্রেমের কাহিনী থেকে। একটি ছাদের নিচে তো এখন একটি প্রেমার্ত হৃদয় নেই; হয়তো আছে দশ জোড়া। তাই কারো মনোবাসনাই পূর্ণ হবার নয়।

নীলবিদ্রোহ

নীলবিদ্রোহের প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের মনে পড়ে দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণে"র কথা আর সেই সঙ্গে লঙ্ সাহেবের লাঞ্ছনার কাহিনী। তার বাইরে নীলবিদ্রোহের যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতের ইতিহাসের কোনো কোনো সুপরিচিত পাঠ্যপুস্তকে নীলবিদ্রোহের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তার কথা আলোচিত হয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে,— "নীলদর্পণে"র পটভূমি হিসাবে। কিন্তু উনিশ শতকের বাঙলার ইতিহাস নীলবিদ্রোহের উপযুক্ত সমীক্ষা ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না।

১৮৫৯-'৬২ সালের নীলবিদ্রোহের পূর্বেও বাঙলার কৃষকরা নীলচাষের বিরোধিতা করেছে। এই বিরোধিতা প্রবল হয়ে উঠেছিল ফরাজি আন্দোলন (১৮৩০-'৪০) ও সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-'৫৭) সময়। এই দু'টি আন্দোলনের কোনটিরই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য নীলকররা ছিল না। কিন্তু জমিদারদের মতো এরাও ছিল অত্যাচারী; তাই জমিদারদের সঙ্গে এরাও লাঞ্ছিত হয়েছে। ১৮৫৭ বিপ্লবের প্রভাবও নীলবিদ্রোহ ত্বরান্বিত করেছে। সেই বিপ্লবের সময় মফঃস্বলবাসী নীলকর সাহেবরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠায় সরকার এদের হাতে অস্ত্র দিলেন আর আত্মরক্ষার অজুহাতে দিলেন কতকগুলি আইনগত সুবিধা। এই সুবিধার অপব্যবহার করেছে এরা নীলের চাষ বাড়াবার উদ্দেশ্যে। তার ফলে রায়তদের সঙ্গে নীলকরদের বিরোধটা তীব্রতর হল, সৃষ্টি হল বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের পরিবেশ।

বাঙলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলেও নীলের চাষ হত। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে অন্যত্র নীল এমন বিষ ছড়ায় নি। সেখানে চাষীরা মোটামুটি ন্যায্য দাম পেত। এখানকার নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের বঞ্চিত করে নিজেদের লাভের অঙ্ক ফাঁপিয়ে তোলা।

বাঙলা দেশে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নীলচাষ করবার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৪৩। নীলকর সাহেবের সংখ্যা ছিল শ' পাঁচেক। বাঙলার নীল ছিল গুণের দিক থেকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। ব্রিটেন যত নীল আমদানি করত তার অর্ধেকও যেত বাঙলা থেকে। আবার বাঙলা দেশের মোট উৎপাদনের অধিকাংশই নদীয়া ও যশোহর থেকে পাওয়া যেত।

নীলকুঠির ম্যানেজারদের বেতন ছিল চারশ' টাকা, তাছাড়া লাভের উপর পাঁচ শতাংশ কমিশন। কমিশনের লোভে চাষীদের উপর উৎপীড়নের মাত্রা বাড়ত। অল্প দাদন দিয়ে নীলচাষে বাধ্য করা, সাদা স্ট্যাম্প কাগজে টিপ সই আদায় করে আইনের ভয় দেখানো, লাঠিয়ালদের পাঠিয়ে মারপিট করানো এবং আরও নানা ধরনের অত্যাচারের বাস্তব বিবরণ দীনবন্ধু মিত্র আমাদের জন্য রেখে গেছেন। কোম্পানির শ্বেতাঙ্গ

কর্মচারীরা কিছুই করতেন না অত্যাচার বন্ধ করতে স্বজাতির স্বার্থের খাতিরে। এঁদের অনেকের প্রকৃতই বিশ্বাস ছিল যে নীলচাষ বাঙলার আর্থিক উন্নতির একটি আবশ্যিক অঙ্গ। আসলে আর্থিক লাভটা পড়ত নীলকরদের ভাগে। নীল-কমিশনের তদন্তে দেখা গেছে নীলচাষের ফলে রায়তের বিঘা প্রতি বছরে লোকসান হত সাত টাকা। আয় বাড়লে কিছু পরিমাণ অত্যাচার ও জবরদস্তি সহ্য করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যখন কৃষক নিশ্চিতরূপে জানে নীলের বদলে জমিতে অন্য শস্য চাষ করলে আয় বাড়বে তখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য লোকসানের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে দিলে সে স্বভাবতই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। এই বিদ্রোহের পূর্বাভাস পাওয়া যায় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে। স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাঙলার লাট নিযুক্ত হবার পর প্রথম নদীয়া জেলা পরিদর্শনে এসেছেন। স্থানীয় জমিদার, আইনজীবী এবং অন্যান্য নাগরিক নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য তাঁর কাছে আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু ছোটলাট এর উপর কোনো গুরুত্বই আরোপ করলেন না; আবেদনে উল্লিখিত অভিযোগগুলির অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হলো না। বরং বছর তিনেক পরে তিনি বহু নীলকরকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিশেষ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। এর ফলে জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি আর আস্থা রইলো না। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদেরই দেওয়া হলো অধিকতর ক্ষমতা। সুতরাং বিচারপ্রার্থী কৃষকরা মুখে মুখে গান করে ভগবানের কাছে নালিশ জানাল ঃ 'যে রক্ষক, সে ভক্ষক।' হ্যালিডের ধারণা ছিল বাঙলা দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ বণিকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। এই বিশ্বাসের এবং স্ব-জাতি প্রীতির জন্য তিনি সর্বদাই নীলকরদের সমর্থন করেছেন।

অবশ্য এমন কয়েকজন সরকারী কর্মচারীও ছিলেন যাঁদের ছিল রায়তদের প্রতি সহানুভূতি। এঁদের মধ্যে আব্দুল লতিফ, হেমচন্দ্র কর, ম্যাংগলস্, ইডেন প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। হ্যালিডের পর জন পিটার গ্র্যান্ট ছোটলাটের পদে নিযুক্ত হলেন ১৮৫৯ সালের ১লা মে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার, মানবিকতাবোধ ছিল গভীর। সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে নীল সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন তিনি। অধিকাংশ ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ কর্মচারী অন্ধভাবে নীলকরদের সমর্থন করতেন। গ্র্যান্ট দেখলেন রায়তদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার সবচেয়ে বড় বাধা মফঃস্বলের ইংরেজ রাজকর্মচারীরা। বিশেষ করে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর একই ব্যক্তি হবার ফলে সরকারের বিচার বিভাগ অপেক্ষা প্রশাসন বিভাগটা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কঠোর হস্তে ম্যাজিস্ট্রেটের শাসন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে হয়ত কার্যকর হতে পারে। গ্র্যান্টের অভিমত ছিল যে,—'In Bengal, as in all other wealthy and highly civilized countries·· the people look to the Judge.'

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কয়েক দশক যাবৎ চলে আসবার প্রধান কারণ সরকারের

সমর্থন। ক্ষুব্ধ হয়েও তাই রায়তরা ছোটোখাটো প্রতিবাদ ছাড়া সংঘবদ্ধ হয়ে অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। কারণ তারা ভালো করেই জানত যে বিদ্রোহ শুধু নীলকরদের বিরুদ্ধে নয়, সরকারের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে। কিন্তু যখন ছোটলাট গ্র্যান্টের মনোভাব রায়তরা জানতে পারল তখন নীলকুঠির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ভরসা পেল। গভর্নমেন্ট নীলকরদের পেছনে নেই, এই বিশ্বাসে রায়তরা বলীয়ান হয়ে উঠল।

জমিতে নীল চাষ হবে কি-না তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে রায়তের ইচ্ছার উপরে। নীলকুঠির সাহেব জোর করে নীল চাষ করাতে চাইলে বাধা দেবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হল রায়তরা। প্রথম বিদ্রোহ দেখা দিল বারাসতে, তারপর ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ল বাঙলা দেশের সর্বত্র। কি ভাবে রায়তরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায় ছোটলাটের তদন্তকারী অফিসার উডের রিপোর্ট থেকে: 'A regular league was now formed against indigo cultivation, oaths were subscribed to by both Hindoos and Musulmans, Ryots of one village were called upon, by beat of drum, to assist those of another, if molested by the planter's servants, etc., and if pressed to cultivate indigo by such servants they were to resist; signals were made and given, subscriptions raised; villagers turned out by the beat of drum and proceeded in large bodies armed to any alleged threatened spot; in fact they had it all their own way, the police were afraid and had been bought over by the Ryots.'

গ্র্যান্ট যখন সরজমিনে তদন্ত করবার জন্য নদীপথে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ যাত্রা করলেন তখন নদীর দুই তীরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার নরনারী তাঁর কাছে নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করেছিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ, শান্তিপূর্ণ জনতার আন্তরিক আবেদনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এমন চমৎকার সংঘবদ্ধ আন্দোলন ভারতে এর পূর্বে হয়নি। নিরস্ত্র কৃষকরা তাদের দাবীর নৈতিক ভিত্তি থেকেই শক্তি পেয়েছিল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছিলেন: 'Bengal might well be proud of its peasantry......Wanting power, wealth, political knowledge and even leadership, the peasantry of Bengal have brought about a revolution inferior in magnitude and importance to none that has happened in the social history of any other country...With the Government against them, law against them, the tribunals against them, the Press against them, they have achieved a success ··And all this they have done by sheer force of virtue, by patience, perseverance and fortitude, without committing a single crime,—almost a single act of violence.'

ছোটলাটও বলেছেন যে, বাঙলা দেশের ইতিহাসে এমন একতাবোধ পূর্বে দেখা যায়নি। হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে সংগ্রাম করেছে। রায়তদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কেউ নীলকুঠির চাকরি করলে তাকে একঘরে করা হত। নীল কমিশনের রিপোর্ট বের হল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। এই রিপোর্ট থেকে রায়তদের অভিযোগেরই সমর্থন পাওয়া গেল। এদেশে এবং ব্রিটেনে সত্য উদ্ঘাটনের ফলে নীলকরদের একাধিপত্য আর রইলো না। তাছাড়া সকল ব্যবসায়েই একটা সাধারণ নিয়ম আছে যে অংশীদাররা সকলেই লাভের কমবেশি ভাগ পাবে। কিন্তু একমাত্র নীলের ব্যবসায়ে চাষীর ভাগে শুধুই শূন্য। নীতিবিরুদ্ধ এই ব্যবসা স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন বাঙলা থেকে লুপ্ত হয়ে গেল।

নীলবিদ্রোহ যে শুধু রায়তদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছে তা-ই নয়। পল্লী অঞ্চলের রায়ত এবং শহরের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও যোগসূত্র স্থাপন করেছে। শিক্ষিত বাঙালী এর পূর্বে গ্রামের চাষীদের সমস্যা নিয়ে এমন করে ভাবেনি। "হিন্দু পেট্রিয়ট", "ইণ্ডিয়ান ফীল্ড", "সোমপ্রকাশ" প্রভৃতি কাগজে সেদিনকার বুদ্ধিজীবী বাঙালী তাঁদের ভাবনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। স্থায়ী নিদর্শন অবশ্য "নীলদর্পণ"। "নীলদর্পণে"র সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এর একটি বিশেষ দানকে এখনও যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়নি। "নীলদর্পণ" প্রকাশের পর একে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তা থেকেই বাঙালী সর্বপ্রথম তার সাহিত্যের ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিল। রাজদরবারে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভাষার মর্যাদা ছিল না সেই ভাষায় লেখা একটি বই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকেও ভাবিয়ে তুলতে পেরেছিল।

"নীলদর্পণে"র প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রেভারেন্ড লঙ্। এই নাটকের বিষয়বস্তু ইংরেজ কর্মচারীদের ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক মনে করে ছোটলাট "নীলদর্পণ" ইংরেজীতে অনুবাদ করতে বলেন। শোনা যায় লঙ্ মধুসূদনকে দিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন। তারপর গভর্নমেন্টের খরচে পাঁচশ' কপি অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। গ্র্যান্টের অজ্ঞাতে সেটন-কার কতকগুলি কপি বিতরণ করেন। এই নিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়; "ইংলিশম্যান" ছোটলাট এবং তাঁর দপ্তরকে তীব্র ভাষায় দিনের পর দিন আক্রমণ করে লিখতে লাগল। যে বই ইংরেজ জাতির মুখে কালি মাখিয়েছে সে বই গভর্নমেন্ট নিজের পয়সায় ছাপিয়ে বিতরণ করছে,—এ কী নির্বুদ্ধিতা? আত্মরক্ষার জন্য বাঙলা সরকারকে লঙের বিরুদ্ধে মামলা আনতে হল; সেই মামলার ফলাফল সকলেরই জানা আছে। এই মামলায় সরকারের কাপুরুষতার যে পরিচয় পাওয়া গেল তার তুলনা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। সরকারই যে অনুবাদ করিয়ে ছাপার ব্যবস্থা করেছেন এবং লঙ্ যে শুধু সহযোগিতা করেছেন—আদালতে এ কথা স্বীকার করবার সাহস তাঁদের হয়নি। লঙ্ স্বেচ্ছায় নিজে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে কাপুরুষ কর্মচারীদের রক্ষা করলেন।

লণ্ডের বিচার করেছিলেন স্যার মোরডন্ট ওয়েলস্। তাঁকে এদেশ থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কলকাতার নাগরিকরা গোপনে একটি আবেদনপত্র ছাপিয়ে এক মাসে কুড়ি হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিল। "ইংলিশম্যান" ও "হরকারু" খবর পেয়ে আবেদনপত্রের একটি কপির জন্য পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত দেবার লোভ দেখায়। কিন্তু তখন বাঙালীদের মধ্যে এমনই একতা ছিল যে একটি কপিও তারা সংগ্রহ করতে পারেনি।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ডঃ ক্লিঙ নীলবিদ্রোহের যে প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য ইতিহাস (The Blue Mutiny) লিখেছেন তা সকলের নিকট বিশেষ করে বাঙালী পাঠকের নিকট সমাদৃত হবে। ইতিহাসে এই একটি ঘটনাই পাওয়া যায় যখন বাঙালী ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে সংঘবদ্ধ হতে পেরেছিল, প্রমাণ করতে পেরেছিল তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা। জয়লাভ করেছিল বাঙালী। পুরানো ইতিহাস যদি আমাদের নতুন কোনো প্রেরণা দিতে পারে তাহলে আলোচ্য বইটি তার সহায়ক হবে। লেখক বহু অপ্রকাশিত দলিলপত্র ব্যবহার করলেও তাঁর রচনা কোথাও ভারাক্রান্ত হয়নি। বইটি সুখপাঠ্য এবং তথ্যভিত্তিক।

মানুষ যেদিন থেকে চিন্তার শক্তি লাভ করেছে, সেদিন থেকেই সে সচেতন হয়েছে ভালো-মন্দ; মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ এই দ্বন্দ্বকে রূপ দিয়েছে পাথরে খোদাই বিচিত্র মূর্তির মধ্যে। আদিম মানব-সমাজে এখনো বহু উপকথা প্রচলিত আছে যা থেকে অমঙ্গলের ভয়ংকর রূপটা উপলব্ধি করা যায়। সকল ধর্মেরই প্রথম প্রার্থনা অমঙ্গল হতে মঙ্গলের পথে যাবার, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে জীবনকে শুভকর করবার। কিন্তু অশুভকে জয় করব কি করে? তাকে চোখে দেখা যায় না, তার গতিবিধির হদিস নেই। সে আছে আমাদের অন্তরে, অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে। অন্তরবাসী বলেই সে সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু। আদিম মানুষও একথা বুঝতে পেরেছিল। তাই হিংস্র পশুর সঙ্গে বনে বাস করেও অমঙ্গলের পাপমূর্তি ভুলতে পারেনি; ভয় করেছে।

অন্তরে যার প্রভাব অনুভব করি তার নিরাকার অস্তিত্ব কল্পনা করে সন্তুষ্ট হতে পারি না। দেবতাকে রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য করি; তেমনি পাপকেও রূপ দেবার চেষ্টা মানুষ করে এসেছে। পাপ ও অমঙ্গলের সবচেয়ে সফল রূপ-কল্পনা শয়তান। অথচ এই শয়তান কথাটি কত আলগাভাবে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি। ঘোরতর দুষ্কৃতিকারীকে এবং যে ছেলে দুষ্টুমি করে তাকেও, সমানভাবেই শয়তান আখ্যা দিই। হিব্রু ভাষায় শয়তান (Satan) শব্দের অর্থ প্রতিপক্ষ। ইহুদি, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মে শয়তানকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। ঈশ্বর সকল মঙ্গলের আধার, তেমনি শয়তানের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে পৃথিবীর সকল পাপ ও অমঙ্গল। শয়তান দেবদূত; একদিন সে ঈশ্বরের সকল শুভ প্রচেষ্টায় প্রধান সাহায্যকারী ছিল; কিন্তু নিজের শক্তি সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে ক্রমশঃ সে গর্বিত হলো; বিদ্রোহ করল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। শাস্তিস্বরূপ সে স্বর্গচ্যুত হলো। এর পর থেকে শয়তানের কর্মক্ষেত্র হলো পৃথিবী। তার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে ঐহিক সুখের লোভ দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে আত্মার ধ্বংসসাধন করা। এতে ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে, আর তার অনুচরের সংখ্যা বাড়বে। শয়তানের পতন হলেও সে অমর, ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী। এই শক্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ না করে যা-কিছু ভালো তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। শয়তানকে এত ভয় তার অতিমানবীয় শক্তির জন্য।

শয়তান যদিও ইহুদি, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের শাস্ত্রকারদের সৃষ্টি, তবু পৃথিবীর সর্বত্র সে স্থায়ী আসন পেয়েছে। কারণ পাপের এমন সুন্দর রূপকল্পনা আর নেই। আমাদের শাস্ত্রে শয়তানের প্রতিরূপ পাওয়া যাবে না। যম, কল্কি, ভূত, প্রেত, অসুর কেউ শয়তানের মতো ভয়ঙ্কর নয়। ব্রহ্মা তপস্যামগ্ন মহাদেবকে মোহিত করবার জন্য কামদেবকে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু আবার ভাবনা হল, একা কাম পারবে তো?

চিন্তিত ব্রহ্মার নিঃশ্বাস বায়ু থেকে জন্ম নিল মহাবলশালী ভীষণাকৃতি জীব। এদের কারো মুখ হাতীর মতো, কারো সিংহের মতো, কারো গাধার মতো; আকারও নানা প্রকার,—অতি দীর্ঘ, অতি খর্ব, অতি স্থূল, অতি কৃশ। কারো এক চোখ; কারো বা তিন। কারো এক রঙ, কারো বহু রঙ। প্রত্যেকে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; মুখে কেবল 'মার কাট' শব্দ। তাই থেকে এদের নাম হলো 'মার'। এরা ব্রহ্মার আদেশে কামদেবের অনুচর হলো। বৌদ্ধশাস্ত্রে 'মার' স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। মার হচ্ছে কাম, অর্থাৎ আকাংক্ষা; আকাঙ্ক্ষাই নতুন জন্ম গ্রহণের মূল কারণ; সুতরাং নির্বাণের পরিপন্থী এবং বৌদ্ধ ধর্মের শত্রু। বুদ্ধদেব যখন বোধিতরুমূলে যোগমগ্ন ছিলেন তখন মার তাঁকে ছলনা করতে এসে ব্যর্থ হয়। 'ললিতবিস্তরে' বুদ্ধের উপরে মারের আক্রমণের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা জীবন্ত ও ভীতিপ্রদ; শয়তানের এমন ভয়ঙ্কর রূপের তুলনা বেশি নেই। এই বর্ণনার চিত্ররূপ দেখা যায় মধ্য এশিয়ার তুং-হুয়াং গুহার প্রাচীরগাত্রে। মার বৌদ্ধ জগতের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছে। জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত প্রাচীন পারসিক ধর্মমত অনুসারে অহ্রিমণ হলো শয়তান। মঙ্গলময় দেবতা অহুরমজদ বারো হাজার বছর ক্রমাগত যুদ্ধ করে অহ্রিমণকে পরাজিত করেছেন।

কিন্তু শয়তান অজেয়। তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে সাহিত্যিকরাও সহায়তা করেছেন। বহু শতাব্দী ধরে শয়তানের চরিত্র সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছে। দান্তে, মিলটন, ব্লেক হতে আরম্ভ করে বারট্রান্ড রাসেলের গল্প 'স্যাটান ইন দ্য সুবার্বস'-এ শয়তানের বিচিত্র রূপ দেখা যায়। ফাউস্ট শয়তানের কাছে ঐহিক সুখের বিনিময়ে আত্মাকে বন্ধক রেখেছিল; এই একটি কাহিনী নিয়ে কত সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে! মার্লো, গ্যেটে, টমাস মান ফাউস্টকে অমর করেছেন। ম্যাতুরিন এবং বালজাকের মেলমথরূপী শয়তান অভিনব সৃষ্টি; তার কল্পনাপ্রবণ মন অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সাধারণ মানুষের মতো সে প্যারিসের নাগরিক হয়ে জেঁকে বসেছে। ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে শয়তান প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। ফরাসী এবং রাশিয়ান সাহিত্যেই শয়তানের আধিপত্য বেশি দেখা যায়। সাহিত্য ছাড়া শিল্পেও শয়তানের প্রভাব কম নয়। বৌদ্ধশিল্পে মার-এর একটি বড় স্থান আছে—বিশেষ করে তিব্বত ও চীনে। সকল দেশের সকল যুগের শিল্পীই পাপের বেদনাবোধ থেকে শয়তান বা তার অন্য কোনো প্রতিরূপকে আঁকতে চেষ্টা করেছেন। আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে পিকাসো শয়তান সম্বন্ধীয় কয়েকটি ছবি এঁকেছেন। বর্তমান জীবন থেকে সাম্য, ঐক্য, আদর্শনিষ্ঠা দূর হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীতে যে দানবীয় সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে শিল্পী তাকেই রূপ দিয়েছেন।

সংসারে যদি শয়তানের রাজত্ব, তাহলে ঈশ্বর কোথায় গেলেন? তাঁর দেখা পাওয়া যায় না কেন? যে কথাটা কেউ কেউ চুপি চুপি বলেছিলেন সে কথা হেগেল সর্বপ্রথম স্পষ্ট করে বললেন, ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে; তাই শয়তানের রাজত্বের অর্থ বোঝা যায়।

হেগেল ঈশ্বরের মৃত্যুর কথা বললেও তাঁর ছিল রিসারেকশানের আশা। কিন্তু নীটশের মধ্যে সে আশা নেই। তিনি বলেন, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় ভগবানের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, আমাদেরও আর প্রয়োজন নেই তাঁকে। ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রেত-ছায়ার প্রভাব এখনও রয়েছে আমাদের মনে, হয়তো আরো কিছুকাল থাকবে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্ক না তুলেও বলা যায় যে, শয়তানের সঙ্গে আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। সংসারে যে পাপ, অন্যায় ও অমঙ্গল দেখতে পাই তার জন্ম আমাদেরই মনে। এই জন্যই তার সঙ্গে সংগ্রামটা বড় মর্মন্তুদ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের এই ভীষণতম শত্রুর স্বরূপ কি? Satan নামক সংকলন গ্রন্থ থেকে তা অনেকটা জানা যাবে। বিভিন্ন লেখক শয়তানের বিভিন্ন দিক নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। যদিও এখানে আলোচনা হয়েছে প্রধানতঃ খৃীষ্টধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে, তথাপি শয়তান সম্বন্ধে সকলের কৌতূহলই বহুল পরিমাণে তৃপ্ত হবে।

গান্ধীজীর জীবনে নারী

গান্ধী-সাহিত্যের পরিধি ও বৈচিত্র্য দুই-ই বৃহৎ। প্রতি বৎসর গান্ধীজীর জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে নতুন নতুন বই বের হয়। কিছুকাল পূর্বে দেশপাণ্ডে কর্তৃক সংকলিত Gandhiana-র (গান্ধী-সাহিত্যের নির্ঘণ্ট) নতুন সংস্করণ প্রকাশ করলে তার আকার আজ দ্বিগুণ হবে। এই বিপুল সংখ্যক বইয়ের মধ্যেও Eleanor Morton প্রণীত The Women in Gandhi's Life যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সত্যি বলতে কি, জীবনী রচনায় এরূপ অভিনব টেক্‌নিকের প্রয়োগ বিরল। সহকর্মিণী, ভক্ত ও শিষ্যাদের সাহায্যে গান্ধীজীর জীবনকে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে। মা ও স্ত্রী অবশ্যই এখানে একটি বড় অংশ অধিকার করেছেন। জওহরলাল প্রমুখ পুরুষ চরিত্রগুলি এই জীবনী থেকে বাদ পড়েছে। কিন্তু তাতে পাঠকের মন ক্ষুণ্ন হয় না; পুরুষদের না আনাতেই মেয়েরা উজ্জ্বল হতে পেরেছেন। লেখিকার এই রচনাকৌশলটি শুধু চাতুর্যে পরিণত হয়নি, আশ্চর্যরূপে সাফল্য লাভ করেছে। উপন্যাসের আকর্ষণ নিয়ে বইটি শেষ পর্যন্ত পড়া যায়; অথচ অবাস্তব ঘটনার আশ্রয় কোথাও নেওয়া হয়নি। লেখিকার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয় প্রতি পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শ্রীমতী মর্টন প্রথম গান্ধীজীর নাম শুনতে পান। তার পর থেকে তিনি গান্ধীজীর জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন; তাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। এমন অনেক কথা আছে যা আমাদের দেশের বহু শিক্ষিত লোকেরও জানা নেই। গান্ধীজীর জীবন যে এক মহৎ মহাকাব্যের উপাদান, এবং এদেশের সাহিত্যিকরা যে তা থেকে নব-সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করতে পারেন, তার সফল ইঙ্গিত পাওয়া যাবে শ্রীমতী মর্টনের রচনায়।

লেখিকা পাঠকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন কস্তুরবাই নাকনজীর। কস্তুরবাই-এর তখনো বিয়ে হয়নি, বয়স সাত বছর, বাপের বাড়িতে ছুটোছুটি করে দিন কাটায়। মোহনদাসের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, সে কিছুই জানতে পারল না। একদিন পুরুত ও জ্যোতিষীরা এসে কথা পাকা করে গেল, দেখে গেল কস্তুরবাইকে। কিন্তু বর-কনে কারো কানেই কথাটা উঠল না। এটা ১৮৭৬ সালের কথা। এর আগে আরো দু' জায়গায় মোহনদাসের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু পর পর দু'টি কনেরই অকাল মৃত্যু হওয়ায় কস্তুরবাইকে বিয়ে করবার সুযোগ এলো। বালক স্বামী ও বালিকা বধূর দাম্পত্য জীবনের যে ছবি গান্ধীজী তাঁর আত্ম-জীবনীতে এঁকেছেন তার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। গান্ধীজী তাঁর মা পুতলিবাই-এর কাছ থেকে যে ছেলেবেলাতেই অহিংসা ও সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা লাভ করেছিলেন সে কথা তিনি নিজেই

বলে গিয়েছেন। বিশেষ করে কাঁকড়া বিছা গা বেয়ে ওঠা সত্ত্বেও পুতলিবাই তাকে না মেরে সযত্নে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, এই দৃষ্টান্তটি বালক মোহনদাসের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

আইন পড়বার জন্য লণ্ডন গিয়ে মোহনদাস মেয়েদের সম্বন্ধে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। দেখলেন তারা স্কুলে, আপিসে, দোকানে কাজ করছে; যোগ্য মেয়েদের নেতৃত্ব পুরুষরাও মেনে নিয়েছে। ১৮৮৭ সালে মোহনদাস অ্যানি বেশান্তকে প্রথম দেখেন এবং তার পর থেকে মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। চার্লস ব্র্যাডল'র সমাধিক্ষেত্রে ভারতীয় ছাত্ররা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য মিলিত হয়েছিল; সেখানেই অ্যানি বেশান্তের সঙ্গে দেখা হয়। শ্রীমতী বেশান্ত তখন তাঁর প্রিয় সহকর্মীর জন্য কাঁদছিলেন।

বয়স চল্লিশ পার হলেও তাঁর সৌন্দর্য রয়েছে অটুট। রূপের সঙ্গে মিশেছে বুদ্ধির দীপ্তি এবং নির্ভীকতা। পনেরো বছর বয়সে শ্রীমতী বেশান্ত ওভিদ, প্লেটো ও ইলিয়াড পড়ে শেষ করেন। বিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হলো এক পাদ্রীর সঙ্গে। দুটি সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিরোধ ঘটায় তিনি পথে বেরিয়ে এলেন; দীর্ঘকাল পাদ্রী ভদ্রলোক তাঁর পেছনে ঘুরে অনুনয় করে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারেননি। দেখা হলো চার্লস ব্র্যাডল'র সঙ্গে। ব্র্যাডল' সাংবাদিক, নাস্তিক, পার্লামেন্টের সদস্য এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মূর্তিমান বিরোধ। যীশু ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর তুলনামূলক বক্তৃতা লন্ডনের ভারতীয় মহলে বিশেষ ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল। বেশান্ত ব্র্যাডল'র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নারী ও শ্রমিকের অধিকার থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা,—এই সবই ছিল তাঁদের আন্দোলনের বিষয়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বই লিখে জনসাধারণের নৈতিক অবনতি ঘটাবার অপরাধে একবার তাঁদের আদালতে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। যে ব্র্যাডল' ছিলেন আগুনের শিখার মতো, যাঁর গতি কেউ রোধ করতে পারত না, তিনিও বেশান্তের ভক্ত হয়ে উঠলেন। বার্নার্ড শ' এবং আরো অনেকে বেশান্তের সৌন্দর্য ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। শ'র মতো লোকও তাঁকে ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য করতে সক্ষম হননি। কিন্তু জীবন-দেবতার এমনই বিচিত্র রহস্য যে অনেকের প্রেম প্রত্যাখ্যান করবার পর বেশান্ত যাঁকে ভালোবাসলেন সেই আভ্‌লিং গ্রহণ করল কার্ল মার্কসের মেয়েকে। প্রত্যাখ্যানের বেদনা তাঁকে হাজারো আন্দোলনের মধ্যে ঠেলে দিল। ভারতীয় ছাত্রদের মুখে মুখে বেশান্তের নাম ঘুরে বেড়াত; কারণ, তিনি ছিলেন ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। গান্ধীজীও তাঁকে প্রায়ই দেখতেন, বক্তৃতা শুনতেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কির মৃত্যুর পর ১৮৯১ সালে শ্রীমতী বেশান্ত থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির নেতৃত্ব লাভ করায় গান্ধীজী ও অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রের নিকট তিনি হলেন আরো প্রিয়। কারণ, থিয়োসফির সঙ্গে হিন্দুধর্মের যোগসূত্র আছে। মোহনদাস থিয়োসফিস্টদের সভায় যেতেন এবং বেশান্তের বক্তৃতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই

গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেন তখন তাঁর আপিস ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকত শ্রীমতী বেশান্তের ছবি।

ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে গান্ধীজী মাকে আর দেখতে পেলেন না। বিদেশে থাকতেই পুতলিবাই পরলোক গমন করেছেন। কস্তুরবাই আর ছোট্ট বালিকা-বধূ নন; তিনি সন্তানের জননী। গান্ধীজী তাঁদের দাম্পত্য-জীবনের চিত্তাকর্ষক ছবি নিজেই এঁকেছেন, তার পুনরুক্তি দরকার হবে না। জীবিকার্জনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে গান্ধীজী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একাজে তিনি যে বিদেশিনীর সমর্থন লাভ করলেন তাঁর নাম শ্রীমতী অলিভার শ্রাইনার। আফ্রিকার এক মিশনারী পরিবারের মেয়ে তিনি। ইহুদি, স্কচ, ইংরেজ প্রভৃতি নানা জাতির সংমিশ্রণ ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে; তাই তাঁর গায়ের রং ছিল এক ডিগ্রি কম ফরসা। লেখিকা হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং একবার লন্ডনে এই সূত্রে আলাপ হলো বিখ্যাত যৌনবিজ্ঞানী হ্যাভ্লক এলিসের সঙ্গে। এলিস মুগ্ধ হলেন, ভালোবাসলেন তাঁকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে হলো না। আফ্রিকায় ফিরে আসবার পথে শ্রাইনার জাহাজের যাত্রী সেসিল রোড্সের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হলেন। আফ্রিকায় এসে এক সন্ধ্যায় তাঁরা ডিনার খেতে বসলেন পাশাপাশি; রোড্স শ্রীমতী শ্রাইনারের রঙ্ সামান্য একটু কম ফরসা বলে পার্শ্ববর্তিনী হিসাবে তাঁকে পছন্দ করল না; স্পষ্ট করেই বলল, "I prefer men to niggers." বড় আঘাত পেলেন শ্রীমতী শ্রাইনার; এর পর থেকে পক্ষ নিলেন কালো মানুষের; সুতরাং সহজেই গান্ধীজীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পোলকের স্ত্রী মিলি পোলক ও শ্রীমতী ওয়েস্ট নামে আর এক ভদ্রমহিলা গান্ধীজীর বাড়িতে কিছুকাল থেকেছেন। নতুন উপনিবেশ স্থাপিত হবার পর সেখানেও তাঁরা এসেছিলেন বাসিন্দা হয়ে। সেখানে মেয়েদের ছিল পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ও সমান দায়িত্ব। এখানেই গান্ধীজী আশ্রমবাসিনী হিসেবে সঙ্গী পেলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালালের মুসলমান পত্নী গুলাবকে। গান্ধীজীর কাজ ইতিমধ্যে এত বেড়ে গেছে যে, একজন সাহায্যকারী ছাড়া আর চলে না। প্রথমে এলেন মিস্ ডিক। তারপরে সোনিয়া শ্লেসিন। এদের বর্ণ-বিদ্বেষ ছিল না বলে গান্ধীজীর কাজ করতে রাজী হয়েছিল। সোনিয়া মাত্র সতেরো বছরের ইহুদি তরুণী, কিন্তু দক্ষ স্টেনোগ্রাফার। চেহারায়, পোশাকে, একটা পুরুষালি ভাব;—গায়ে অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নেই। তার উদ্দীপনা ছিল, ছিল কাজ সম্পন্ন করবার সুষ্ঠু পরিকল্পনা; কিন্তু ছিল না রোমান্সের বাষ্প। একবার কাজে ডুবে গেলে তার খেয়াল থাকত না ক' ঘণ্টা কেটে গেল, রাত কত গভীর হলো। গান্ধীজী যখন মাইনে বাড়িয়ে দিতে চাইলেন তখন তাঁর মুখের উপর সোনিয়া জবাব ছুঁড়ে মারল, 'আমি কি টাকার জন্য কাজ করি? আপনার আদর্শ আমার ভালো লাগে বলেই আছি।' ক্রমে গান্ধীজী একান্ত-রূপে নির্ভরশীল হলেন সোনিয়ার উপর। চিঠিপত্র লেখা, সভার ব্যবস্থা করা, টাকার

হিসেব রাখা, সবই সোনিয়া করত। প্রয়োজন হলে জোহান্স্‌বার্গের বিপদ্‌সংকুল পথে গভীর রাত্রিতে সে বের হতো। সঙ্গে রক্ষী দেবার প্রস্তাব সে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছে। গান্ধীজীর উপর বিদ্রূপ বা আঘাত এলে সোনিয়া স্বেচ্ছায় তার অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসত।

একবার এক সভায় স্বদেশবাসীরাই যখন ভুল বুঝে,গান্ধীজীকে আক্রমণ করল, তখন আহত গান্ধীজীকে সোনিয়া সযত্নে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার মূলে সোনিয়ার অকুণ্ঠ নিঃস্বার্থ সহযোগিতা যে বিশেষ প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নেই। গান্ধীজী বলেছেনঃ "Sonya Schlesin is one of the noblest beings I have known." দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ অন্দোলনে যখন গান্ধীজী, কস্তুরবাই এবং অন্যান্য নেতারা জেলে, তখন আন্দোলন পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়েছিল সোনিয়ার উপর। ভারতীয়দের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সে পরবর্তী পন্থা আলোচনা করত। কংগ্রেসের অর্থভাণ্ডার ছিল একা তার হাতে। সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল তার চরিত্র। সাহসী সৈনিকের মতো, আত্মবিলোপকারী জৈন সন্ন্যাসীর মতো, জীবন বিপন্ন করে সেই কাজ করে গেছে, যার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না।

সত্যাগ্রহে জয়লাভ করে গান্ধীজী লন্ডনে এসেছেন। উঠেছেন এক দরিদ্র পল্লীতে। বহুমূল্য শাড়ি ও অলংকারে ভূষিতা এক মহিলা এলেন তাঁর খোঁজে। গান্ধীজী তখন মেঝের উপর মোটা কম্বল পেতে খেতে বসেছেন। লন্ডন শহরে এই অদ্ভুত জীবন-যাত্রার চমকপ্রদ ছবি ভদ্রমহিলাকে বিস্মিত করল। গোখেল বলেছিলেন, গান্ধী কাদার তাল থেকে কঠিন বীর গড়তে পারেন। একি সেই লোক? চেহারা ও পরিবেশ দেখে আগন্তুক মহিলা হাসি চাপতে পারলেন না। ইনি সরোজিনী নাইডু। পরে ইনি গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, লবণ-সত্যাগ্রহ এবং আরও কত আন্দোলনে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছেন।

গোখেলের মৃত্যুর পর ভারতের রাজনীতিতে দেখা দিল শ্রীমতী বেশান্তের প্রভাব। তাঁর হোম রুল আন্দোলনের কথা তখন ঘরে ঘরে। গান্ধীজীর কথা কেউ শুনতে চায় না। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উৎসবে গান্ধীজী যখন উপস্থিত রাজা-মহারাজাদের দরিদ্রদের উপেক্ষা করে দেশের সম্পদ একা ভোগ করবার জন্য মৃদু সমালোচনা করেছিলেন, তখন শ্রীমতী বেশান্ত তাঁকে আর বলতে না দিয়ে বসিয়ে দিলেন। পরে বেশান্ত তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিলেন গান্ধীজীর বিরোধিতা করতে গিয়ে। বিশেষ করে অমৃতসরের ঘটনার পর ও'ডায়ারের পক্ষে কথা বলে তাঁর রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটল।

গান্ধীজীর আদর্শে মুগ্ধ হয়ে একে একে কত মেয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর কর্মপ্রচেষ্টায় সাহায্য করতে। এলেন বিলাসে লালিতা বিজয়লক্ষ্মী, কোটিপতি সারাভাই পরিবারের অনসূয়া, রাজকুমারী অমৃত কাউর, সুশীলা নায়ার এবং গঙ্গাবেন। গঙ্গাবেনের কাছ থেকেই গান্ধীজী হাতে-কলমে চরকার ব্যবহার শিখেছিলেন। তাছাড়া, দীর্ঘকালের

আন্দোলনে ভারতের কত অসংখ্য নারী গান্ধীজীর সান্নিধ্য লাভ না করেও তাঁর আহ্বানে মৃত্যু ও কারাবরণ করেছে। শুধু এদেশের নয়; বিদেশিনীরাও আকৃষ্ট হয়েছে। গান্ধীজীর কাছে একবার অনুরোধ এলো মিস স্লেড-এর কাছ থেকে,—তাঁকে আশ্রমের স্থায়ী সভ্য করে নেবার জন্য। গান্ধীজী লিখলেন, আশ্রমের জীবন বড় কঠোর। মিস স্লেড তাতে ভয় পেলেন না। গান্ধীজী তখন আশ্রমের জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লিখলেন, এক বছর এই নিয়ম অনুসারে চলে দেখ। যদি পার; তখন এসো।

মিস স্লেড ব্রিটিশ অভিজাত পরিবারের মেয়ে। তাঁর পিতা স্যার এডমান্ড স্লেড ছিলেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল। মিস স্লেড লম্বায় ছ' ফুট, মাথাভরা কালো চুল, সুন্দর চোখ, ভালোবাসে সঙ্গীত ও খেলাধুলো। এক ধরনের পার্টি ও শিকার অভিযানে যোগ দিয়ে দিয়ে; এবং ছক বাঁধা সভ্যসমাজের কায়দা মাফিক চলতে গিয়ে মিস স্লেডের কুমারী জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। যে মহত্ব ও ঔদার্য তিনি খুঁজতেন ব্রিটিশ অভিজাত সমাজে তার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯২৩ সালে মিস স্লেড প্যারিস বেড়াতে এসে অকস্মাৎ হাতে পেলেন রোলাঁর লেখা গান্ধী-চরিত। এতদিন অবচেতন মনে যাঁর সন্ধান করছিলেন হঠাৎ এই বইয়ের মধ্যে তাঁর দেখা পাওয়া গেল। সংকল্প স্থির করতে দেরি হলো না। গান্ধীজীর নির্দেশ পেয়ে মিস স্লেড সবরমতী আশ্রমের যোগ্য হবার জন্য গেলেন সুইজারল্যান্ডের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। এখানে থেকে অভ্যাস করতে শুরু করলেন আশ্রমের কঠোর জীবনযাত্রা। অভিভাবকরা ভাবলেন এটা তাঁর হাজারো উদ্ভট খেয়ালের মতোই আর একটি নতুন খেয়াল। কিন্তু তাঁদের আশা ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে তিনি যাত্রা করলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। পেছনে পড়ে রইল আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও পাণিপ্রার্থী স্তাবকের দল। নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে যাত্রা করলেন নব-জীবনের পথে। জাহাজে থাকতে মিস স্লেড শৌখিন বহুমূল্য পোশাক পুড়িয়ে পরলেন মোটা খদ্দরের পোশাক। সবরমতী পৌঁছে গান্ধীজীর পায়ের উপর মাথা রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন মিস স্লেড। তিনি মেয়ের মতো গ্রহণ করলেন নতুন শিষ্যাকে। নতুন নাম দিলেন মীরা।

ভক্ত ও সহকর্মীদের কাছে গান্ধীজী যত বড়ই হোন না কেন, তিনিই সব ছিলেন না। তিনি ছাড়াও ছিল দেশ, ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। কিন্তু মীরার কাছে শুধু ছিলেন গান্ধী। একমাত্র তাঁরই আকর্ষণে ছ'টি ভাষায় অভিজ্ঞা, বীঠোফেনের সঙ্গীতে পারদর্শিনী, অভিজাত ধনাঢ্য পরিবারের কন্যা এক অপরিচিত কঠোর জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। কয়েক বছর পরে মীরা যখন আমেরিকা গিয়েছিলেন তখন সবাইকে বলতেন, তোমাদের আছেন যীশু, আমার গান্ধীজী। গান্ধীজীর সেবা করবার সুযোগ পেলে মীরার আনন্দের সীমা থাকত না; যখন তিনি আশ্রম ছেড়ে দূরে যেতেন অসহ্য বেদনায় মীরার বুক ভরে উঠত। সেই বেদনা লাঘব করবার জন্য প্রতিদিন তিনি গান্ধীজীর কাছে চিঠি লিখতেন; উত্তর না পেলে করতেন টেলিগ্রাম। কখনো কখনো গান্ধীর কাছে গিয়ে পৌঁছত ফুলের তোড়া, যে তোড়া কয়েক দিনের পথ

অতিক্রম করে শুকিয়ে গেছে। তাঁর প্রতি আকর্ষণের এই মোহ থেকে মীরাকে মুক্ত করবার জন্য গান্ধীজী উপদেশ দিতেন ; কখনো কাছে রাখতেন, কখনো শাস্তি দিতে দূরে পাঠাতেন। বলতেন, আমাকে ভুলে যাও, গ্রহণ করো আমার আদর্শকে। তাঁর কঠোর ব্যবস্থায় কতবার মীরার দু' চোখ জলে ভরে গেছে, কিন্তু গান্ধীজীর আদেশের তাতে বিন্দুমাত্র নড়চড় হয়নি। মীরার দুর্বলতার জন্য ঘৃণায় তাকে দূরে তাড়িয়ে দেননি ; সহানুভূতির সংগে চেষ্টা করেছেন তাঁর মন বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ করতে।

মীরার নাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সংগে চিরদিন গাঁথা হয়ে থাকবে। গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর সংগে তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন। সেখানে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব ছিল তাঁর। ১৯৪২ সালে মীরাবেনের প্রতি আদেশ হলো দূরে গিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবার। গান্ধীজীর নিকট বিদায় নিতে এসেছেন। গান্ধীজী তাঁর হাতে সদ্যসমাপ্ত একটি রচনা দিয়ে বললেন, পড়ে দেখ। তোমার ভালো লাগলে নিজে গিয়ে নেহরুকে দিয়ে আসবে। মীরাবেন দেখলেন রচনার শিরোনামা "ভারত ছাড়"। সমগ্র ভারতে এ বাণী ছড়িয়ে পড়বার আগেই বন্দী হলেন নেতারা। সুশীলা ও কস্তুরবা এক সংগে গ্রেপ্তার হলেন। জেলের পথে কস্তুরবা বললেন, এবার আমরা প্রাণ নিয়ে জেল থেকে বেরুতে পারব না। কয়েক দিন পরে এঁদের আগা খাঁর প্রাসাদে গান্ধীজীর কাছে স্থানান্তরিত করবার জন্য রেল স্টেশনে আনা হলো। কস্তুরবা চেয়ে দেখলেন, জীবন ঠিক আগের মতোই চলছে ; ফেরিওয়ালার চিৎকার, যাত্রীদের হৈ-চৈ, গাড়ির হুইসল্। বড় ক্ষোভের সংগে কস্তুরবা বললেন, দ্যাখ্, সুশীলা, চেয়ে দ্যাখ্। সব নেতারা জেলে, অথচ দেশের জীবনে তার ছায়া নেই ; এদের নিয়ে বাপুজী দেশের স্বাধীনতা আনবেন কেমন করে ?

একে একে সরোজিনী নাইডু, মহাদেব দেশাই, মীরাবেন, কস্তুরবা ও সুশীলা আগা খাঁর প্রাসাদে গান্ধীজীর সংগে মিলিত হলেন। গ্রন্থের এই অধ্যায়টি ঘটনাবহুল এবং চিত্তাকর্ষক। মহাদেব দেশাই-এর মৃত্যু এবং মহাত্মার অনশন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সময় কাটাবার জন্য মীরা ক্যারম খেলা আরম্ভ করলেন, সংগী হিসেবে টেনে আনলেন কস্তুরবাকে। কস্তুরবার খেলায় নেশা ধরে গেল ; কিন্তু হেরে গেলে এই সরল-হৃদয়া বৃদ্ধার রাত্রিতে ঘুম হতো না। সুতরাং মীরাবেন এমন ব্যবস্থা করলেন, যাতে তাঁর কখনো হার না হয়।

কস্তুরবার দিন ফুরিয়ে এসেছে। মরতে ভয় নেই, শুধু সেই বাউন্ডুলে, দুশ্চরিত্র, সকলের ঘৃণার পাত্র হীরালালকে শেষবারের মতো দেখবার বড় আকাঙ্ক্ষা। মীরাবেনের ঘরে কৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল। কস্তুরবা চুপি চুপি সেখানে এসে প্রার্থনা করতেন, ঠাকুর, একবার হীরালালকে এনে দাও। গান্ধীজী জানতে পেরে সরকারের অনুমতি আনালেন। হীরালাল মুমূর্ষু মাকে দেখতে এল। তখনও তার মুখে মদের গন্ধ লেগে আছে। কস্তুরবা কেঁদে বললেন, বাপুজী মহাত্মা, তিনি পৃথিবীর দুঃখ দূরে করবেন ; কিন্তু দেবদাস, তোরা ওর পরিবারের ভার না নিলে, আমি তো শান্তিতে

মরতে পারব না। ছেলেরা আশ্বাস দিল; কস্তুরবা গান্ধীজীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মীরাবেন ছোট্ট শীর্ণ দেহটি সাজিয়ে দিলেন নতুন খদ্দরের শাড়ি দিয়ে, ফুল দিয়ে। আগা খাঁর প্রাসাদের এক কোণে শবদাহের আয়োজন করা হলো। সব শেষ হয়ে গেলে মীরাবেন গান্ধীজীকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন; গান্ধীজীর পাশে চলতে চলতে দেখা গেল তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল নামছে। গান্ধীজী মীরাকে বললেন, কস্তুরবা আমার আগে যাবেন, তাঁর মঙ্গলের জন্য আমি তাই চেয়েছি। কিন্তু আঘাতটা যে এতবড় হয়ে বাজবে, তা কখনো ভাবিনি।

তারপর একদিন আগা খাঁর প্রাসাদের দ্বার খুলে গেল, বন্দীরা বেরিয়ে এলেন। দেশ স্বাধীন হলো; সব নেতারা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ক্ষমতা অধিকারের জন্য। গান্ধীজী একা ঘুরতে লাগলেন বাঙলা, বিহার ও দিল্লী,—সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা শান্ত করতে। দিল্লীতে আমরণ অনশন শুরু করেও ফাঁড়া কেটে গেল, কিন্তু ঠেকানো গেল না আততায়ীর গুলিকে। ছেলেবেলায় বৃদ্ধা দাইয়ের মুখে যে শব্দ সর্বদা শুনতেন, সেই রাম নাম উচ্চারণ করতে করতে গান্ধীজী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

মীরা গান্ধীজীর সমর্থন পেয়ে হৃষীকেশ অঞ্চলে হিমালয়ের পাদদেশে নিজে আশ্রম খুলে গো-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। রেডিও খবর দিল গান্ধী হত্যার। মীরা বাইরে এসে হিমালয়ের ছায়াঘন মৌন শিখরগুলির দিকে চেয়ে আপন মনে বললেন, এতদিন আমার শুধু দু'জন ছিলেন,—ঈশ্বর ও বাপু। সেই দু'জন আজ একজন হয়ে গেলেন।

রাজধানীতে শবযাত্রার আয়োজন চলছে। অহিংসার বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তলব করা হলো সামরিক বাহিনীর। লোকের দৃষ্টি হয়তো তারাই বেশি করে আকৃষ্ট করল। কিন্তু সেই বিপুল জনসমুদ্রে একটি দ্রষ্টব্য ছিল; সে ভ্রষ্ট-চরিত্র হীরালাল। কেউ তার খোঁজ রাখত না; হঠাৎ তাকে দেখা গেল গান্ধীজীর জন্য সাজানো চিতার পাশে। আত্মীয়স্বজনরা তার দিকে এগিয়ে যাবার উপক্রম করতেই সে জনতার মধ্যে মিশে গেল,—আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

গান্ধীজী তখন দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য অনশন শুরু করেছেন। একদিন সকালে সুশীলা নায়ার জিজ্ঞাসা করলেন, বাপুজী, কাল রাত্রিতে আপনি ঘুমের মধ্যে দু'হাত উপরে তুলে এমন ভঙ্গি করতে লাগলেন, যেন কিছু একটা বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে চাইছেন। এর মানে কী? গান্ধীজী বললেন, কাল সারা রাত ধরে স্বপ্ন দেখেছি, যেন একটা দেওয়াল পার হতে চাই, কিন্তু কিছুতেই দেওয়ালের উপরে উঠতে পারছি না।

ধ্যানের ভারতে পৌঁছবার পথে যে বাধার প্রাচীর আছে, তা গান্ধীজী সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীরা এখনো সেই প্রাচীর বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করছেন। আমাদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা তাঁদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। কারণ মনুষ্যত্বের উপরে আস্থা হারানো এঁদের ধর্ম নয়। বাপুজী বলেছেন: You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.

মানুষ সারাজীবন ধরে' কত কথা বলে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সে সব কথা হয়তো ভুলে যায়, কিন্তু মনে রাখে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেকার শেষ দু' একটি কথা। মৃত্যুর করুণ দৃশ্যের সঙ্গে শেষ কথাগুলি গাঁথা থাকে বলে প্রিয়জনরা তাদের মনে করে রাখে। কথাগুলির নিজস্ব মূল্য যাই হোক না কেন, মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকায় তারা স্মরণীয় হয়।

অনেক সময় সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথার মধ্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় থাকে। কখনো কখনো মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তের উক্তির মধ্যে মৃত ব্যক্তি তাঁর জীবনের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের মূলসূত্র কি ছিল তার ইঙ্গিত রেখে যান। বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনায় মৃত্যুকালীন উক্তির মূল্য কম নয়।

অবশ্য মৃত্যুকালীন উক্তির মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্যার টমাস ব্রাউনি বলেছেন যে, মৃত্যুর কিছু আগে থেকেই মানুষ পরলোকের দিকে পা বাড়ায়, সুতরাং মুমূর্ষু ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা ঐশ্বরিক শক্তি এসে যায় যার ফলে মূল্যবান কথা বলা সম্ভব হয়; সাধারণ অবস্থায় এমন উঁচু দরের কথা তাদের কাছে কেউ আশা করে না।

আবার কেউ কেউ এই মতের বিরোধী। তাঁরা বলেন, মৃত্যুর সময় মানুষের দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে, অনুভূতির ক্ষমতা স্তিমিত হয়ে আসে; সুতরাং এই অবস্থায় মানুষের পক্ষে এমন কোনো উক্তি করা সম্ভব নয় যা প্রকৃতই মনে রাখবার মতো। দেহে যখন স্বাস্থ্য ও প্রাণের প্রাচুর্য থাকে তখনই মূল্যবান কথা বলা সম্ভব।

এই দুটি পরস্পর-বিরোধী মতের একটিও পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ দেখা গেছে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞ ব্যক্তিও মৃত্যুর সময় একান্ত সাধারণ মানুষের মতো দু'চারটা কথা বলেন। এসব কথার মধ্যে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। আবার সাধারণ লোকের মুখে মনে করে রাখবার মতো কথা শোনা গেছে।

মৃত্যুকালীন উক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কেউ জীবন ও সংসার, কেউ ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। কেউ কোনো বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান; কেউ বা নিজের রোগযন্ত্রণা নিয়ে হা-হুতাশ করেন। মৃত্যুর আকস্মিক আগমন কাউকে ভীত করে, অর্ধসমাপ্ত কাজ ও পরিজন ফেলে যেতে হচ্ছে বলে অনেকে আক্ষেপ করেন। দয়িতার নাম উচ্চারণ করতে করতে কারো মৃত্যু হয়; কেউ শেষ-কথা রেখে যান দু' এক লাইন কাব্যে। বায়রন গ্রীক ভাষায় কবিতা রচনা করেছিলেন। এই প্রথা যে একেবারে পুরানো হয়ে গেছে তা-ও নয়।

১৯৪৮ সালে জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দু'চরণ কবিতা রচনা করেন; এর ভাবার্থ এই: 'চেয়ে দেখো; চেরি পুষ্পস্তবক কেমন নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে!' অর্থাৎ, আমার জীবনটাও চেরি

ফুলের মতো ঝরে পড়ুক, তোমরা দুঃখ করো না। অবশ্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই চীন ও জাপানের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে কবিতা রচনার রীতি চলে এসেছে।

মৃত্যু আসছে, একথা বুঝতে পারলেই আমাদের দেশের বৃদ্ধরা তুলসীতলা কিংবা গঙ্গার ঘাটে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। আত্মীয়-পরিজনরা হরিনাম শুনিয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির পথটা স্বর্গাভিমুখী করতে চেষ্টা করত। যদি সম্পত্তিশালী হতেন তা'হলে কে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে সে কথাটা শোনবার জন্য কখনো কখনো মৃত্যুপথযাত্রীকে উত্যক্ত করা হতো। কোনো মহাপুরুষের মৃত্যুর সময় তাঁর শিষ্যেরা এসে দাঁড়াত শয্যার চারপাশে। গুরুর মৃত্যুকালীন বাণী প্রচার করা হতো দেশে-বিদেশে। শিষ্যরা শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করত সেই বাণী। কখনো কখনো নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপস্থিত শিষ্য গুরুর নামে মিথ্যা বাণীও প্রচার করত। য়ুরোপেও মৃত্যুর পূর্বে বিছানা, ঘর ইত্যাদি যথোচিতরূপে সাজাবার রীতি ছিল। গেটের মা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পান। তিনি উত্তরে জানালেন, আমি মৃত্যুর আয়োজন করতে বড় ব্যস্ত আছি, তাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলাম না।

শেষ কথার বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে।

বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন এইঃ 'জন্ম ও মৃত্যুর কারণ এক ও অভিন্ন। যার জন্ম তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; একমাত্র সত্য চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। সুতরাং তোমরা সত্যের সাধনা করে সত্যের পথে এগিয়ে চলো।'

যীশু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর মুহূর্তে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন আমাকে ত্যাগ করেছ?'

মহাত্মা গান্ধী শুধু বলতে পেরেছিলেন, 'হা রাম'—এই একটি কথার মধ্যে হয়তো কত ক্ষোভ ও বেদনা লুকিয়ে আছে।

সক্রেটিস মৃত্যুর পূর্বে পার্শ্ববর্তী শিষ্যকে বলেছিলেন, 'অমুকের কাছ থেকে একটা মোরগ ধার করেছিলাম, মনে করে সেই ঋণটা শোধ করে দিও।'

মৃত্যুর পূর্বে আলেকজান্ডারকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাঁর পরে সিংহাসনে আরোহণ করবার অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিই সিংহাসন লাভের অধিকারী।

ঔরঙ্গজেব পুত্রের নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে সর্বশেষ চিঠিতে লিখেছিলেনঃ আমি জীবনে অনেক পাপ করেছি, জানিনা তার জন্য কি শাস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

গ্যারিবল্ডির ঘরের জানালার উপর দু'টি ফিঙে পাখি কোথা থেকে এসে খেলা করত। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলে গেলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা এই পাখি দুটিকে খেতে দিও। এতবড় বিপ্লবী দুটি পাখির মায়ায় পড়েছিলেন।

চতুর্দশ লুই তাঁর ভৃত্যদের লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ তোরা কাঁদিস কেন? তোরা কি ভেবেছিলি যে আমি অমর?

প্রিভি কাউন্সিলরা কাগজপত্র সই করাবার জন্য অপেক্ষা করছে দেখে পঞ্চম জর্জ বলেছিলেন, আপনাদের এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি বলে আমি লজ্জিত, কিন্তু কি করব, মন স্থির করতে পারছি না।

মেরি আঁতোয়ানেৎকে জল্লাদ বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর পা জল্লাদের পায়ের উপরে পড়ল। অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী ভূতপূর্ব রানী জল্লাদকে বল্লেন : মহাশয়; আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। এরূপ সংক্ষিপ্ত কিন্তু মর্মস্পর্শী উক্তি কমই আছে।

এবার সাহিত্যিকদের মৃত্যুকালীন উক্তির কথা দেখা যাক্। বালজাক আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমি আর লিখতে অথবা পড়তে পারি না। লেখকের পক্ষে এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি আছে ? সারাজীবন ঘূর্ণিবাতের মতো কাটিয়ে মৃত্যুশয্যায় বায়রন বললেন : এবার আমি ঘুমুব।

ডুমার মৃত্যুর সময় নিজের রচনা সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছিল। ছেলেকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি তো মরতে বসেছি, কিন্তু সত্যি করে বলো ত আমার রচনাগুলি কি বাঁচবে ?

গ্যেটে চীৎকার করে উঠেছিলেন : আলো ! আরো আলো !

জেমস্ জয়েস্ ইউলিসিস-এর জন্য অনেক লাঞ্ছনা সয়েছেন, কেউ তাঁর রচনা বহুদিন পর্যন্ত যথার্থরূপে বুঝতে পারেনি। তাই মৃত্যুর সময় তিনি প্রশ্ন রেখে গেছেন : কেউ কি বুঝতে পারে না ?

কীট্‌স তাঁর বন্ধুকে বললেন, 'সেভার্ন', আমাকে তুলে ধরো, আমি মরব—আমি সহজভাবে মরব, ভয় পেয়ো না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এলো'।

ডি. এচ্. লরেন্স যখন বুঝতে পারলেন মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন : এবার আমি একটু ভালো বোধ করছি। রসিক রাবেলের শেষ-কথা ছিল এই : জীবনের ফার্স শেষ হলো, এবার পর্দা ফেল।

মৃত্যুর সময়ও বার্নার্ড শ' তাঁর স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা ত্যাগ করতে পারেননি। নার্সকে বললেন, আমাকে তোমরা ওল্ড কিউরিয়সিটি হিসাবে বাঁচিয়ে রাখতে চাও, কিন্তু পারবে না।

মাইকেল এঞ্জেলো মৃত্যুর সময় তাঁর বন্ধুদের বলে গেছেন, 'জীবনের পথে চলতে গিয়ে দুঃখ পেলে যীশুর বেদনার কথা মনে ক'রো।'

ভ্যান গগ্ বলেছিলেন, এখন আমি বাড়ি যেতে চাই।

শর্টহ্যান্ডের আবিষ্কর্তা সার আইজাক পিটম্যান পার্শ্ববর্তী আত্মীয়-পরিজনদের বললেন, 'কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আমার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তাহলে বলো, আমি যেন নতুন কাজের সন্ধানে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে গিয়েছি মাত্র।'

এসব দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে, অনেকের শেষ কথাই জ্ঞানগর্ভ ও স্মরণযোগ্য। তাই বহু বৎসর পরেও আমরা তাঁদের মনে করে রেখেছি।

Edward S. Le Comte সঙ্কলিত Dictionary of Last Words থেকে উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হলো। বলা বাহুল্য, এই সংকলনে ভারতের স্থান নগণ্য।